মাদ্রাসা শিক্ষা

জামেয়া আল-আজহার

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

মাদ্রাসা শিক্ষা

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
সাবেক সচিব
ও
চেয়ারম্যান, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম-ঢাকা

মাদ্রাসা শিক্ষা

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

প্রকাশক
মোহাম্মদ নূর উল্লাহ্
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দ্বিতীয় সংস্করণঃ মে/২০০২

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি (প্রিন্টিং প্রেস) লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ রফিকুল ইসলাম

মূল্য ঃ ১১০.০০

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
৭২, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
১৫০-১৫১, গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

Madrasa Education : Written by A.Z.M. Shamsul Alam, Published by : Muhammad Nur Ullah, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Price : Tk.110·00 US $ 4.

ISBN-984-493-059-6

প্রকাশকের কথা

মুসলিম উম্মার বুনিয়াদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো মাদ্রাসা। এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্থাপত্য, রাষ্ট্রনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, পররাষ্ট্রীয় বিষয় অর্থনীতি, সমর বিজ্ঞান – মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের নেতৃত্বে মুসলিম জাতি বিশ্বে ছিলো অপরাজেয়।

সেকালে বৈষয়িক ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে মসজিদ কেন্দ্রীক মাদ্রাসা ছিল শিক্ষার মূল ভিত্তি। আল-আজহার মসজিদে প্রথম দিকে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতি শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তা আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে মাদ্রাসা আছে, কিন্তু নানা কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা শুধু মাত্র ধর্মীয় শিক্ষায় পরিণত হয়েছে। এর ফলে মুসলিমগণ হারিয়েছে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ, সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাষ্ট্রিয় নেতৃত্ব।

এক সময় মুসলিমগণ ছিল পৃথিবীতে জনসংখ্যায় নাসারাদের দ্বিগুণ। আজ নাসারাগণ মুসলিমদের দ্বিগুণ। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হিসেবে। মূলতঃ দ্বীন প্রচারক হিসেবে।

তাবলীগ এবং দাওয়াহ্ অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেও মুসলিম সমাজ আজ খ্রীষ্টানদের অনেক পিছনে পড়ে আছে। নাসারা মিশনারীদের ন্যায় অমুসলিমদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার মতো কর্মক্ষম, যোগ্যতাসম্পন্ন, জ্ঞানী, ধর্ম প্রচারক আজকের মাদ্রাসাগুলো সৃষ্টি করতে পারছে না।

নিজস্ব ঈমান-আক্বিদা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, মারুফ-মুনকার, আদেশ-নিষেধ, ত্যাগ-কুরবানী, ওয়াজিব, সুন্নাহ এবং সার্বিক গুণগত মানে আমরা আমাদের নিজেদের দৃষ্টিতেও সেরা বা শীর্ষস্থানীয় নই। ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় কোনো পর্যায়েই নয়। এ সর্বগ্রাসী অধঃপতনের অন্যতম কারণ হলো আমাদের মাদ্রাসা বা মানুষ তৈরীর কারখানাগুলোর ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষানীতি ত্রুটিপূর্ণ এবং তুলনামূলকভাবে অপূর্ণাঙ্গ। এ কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা মুসলিম জনগণের কাছে আস্থাহীন হয়ে পড়েছে।

এ সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাবিদ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এমনকি সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। কেন আমাদের হযরতুল আল্লামা, বাহরুল উলুম হুজুর কেবলা, পীরানে পীর দাস্তগীর অথবা গরীব নেওয়াজের আওলাদগণও মাদ্রাসা শিক্ষা পরিত্যাগ করে ইয়াহুদী, নাসারা প্রবর্তিত এবং পরিচালিত, নৈতিক শিক্ষা বিবর্জিত সেকুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ সন্তানদেরকে প্রেরণ করছেন – এর জবাব বা কারণ খুঁজে পাওয়া এবং তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা আমাদের উচিত।

বাংলাদেশে ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে সাবেক ধর্ম সচিব এ. জেড. এম. শামসুল আলম অনেকের মতে মৌলিক চিন্তার অধিকারী। আধুনিক এবং ধর্মীয় শিক্ষিতদের কাছ

থেকে যা সচরাচর শুনা যায় না – এমন ধরনের ধর্ম সংক্রান্ত কিছু কথা শুনা যায় তাঁর কণ্ঠে এবং দেখা যায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখায়। সমকালীন সমস্যা সমাধানে তিনি যে সব যুক্তি, দর্শন, তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনায় ও লেখার উপস্থাপন করছেন তা চিন্তার উদ্রেক করে। অনেকের মতে তাঁর অনেক কথা ও চিন্তাধারায় যুগ-সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও জবাব পাওয়া যায়।

কৃষি মাদ্রাসা, প্রকৌশল মাদ্রাসা, কারিগরী মাদ্রাসা, পেশা মাদ্রাসা – এ শব্দগুলো আমাদের কাছে নতুন। ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা, মেডিক্যাল মাদ্রাসা, হোমিওপ্যাথিক মাদ্রাসা – ইত্যাদির ধারণা অনেকের চিন্তাকে ঝাঁকুনি দেয়। সঙ্গত কারণেই ইসলামী চিন্তাবিদ শামসুল আলম কী বলতে চান, তা ধর্মপ্রাণ চিন্তাশীল মানুষের জানতে ইচ্ছে করে।

প্রতিটি ইউনিয়নে হাফিজিয়া মাদ্রাসা আছে। হাফিজিয়া মাদ্রাসার উপর আমরা ইতোপূর্বে এমন গঠনমূলক ও জ্ঞানগর্ভ কানো প্রবন্ধ-নিবন্ধ, পুস্তক-পুস্তিকায় দেখিনি। সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা হাফিজিয়া মাদ্রাসার উপর প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধসমূহ সুধী মহলে ব্যাপক আলোচিত ও সমাদৃত হয়েছে।

মহিলা মাদ্রাসার উপর সাবেক সি.এস.পি. জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলমের দু'যুগ আগে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো এক সময় মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছিল।

ফোরকানীয়া মাক্তাব সম্পর্কে তাঁর বেশ কিছু লেখা সত্তর এবং আশির দশকে প্রকাশিত হলে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মসজিদ কেন্দ্রিক গণশিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণে মসজিদ এবং মাক্তাবের ভূমিকা, মসজিদ পাঠাগার, ইমাম প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি চিন্তাধারা বাংলাদেশ সরকারকেও প্রভাবিত করেছিল।

ইসলামী ফাউন্ডেশনের মহা-পরিচালক হিসেবে তাঁর ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করে লন্ডনস্থ আন্তর্জাতিক মানের "The Economist" পত্রিকার Correspondent - Godfray Jansen "Towards Islamic Society" শীর্ষক নিবন্ধে (০৪-০৯-১৯৮২) জনাব শামসুল আলম কালক্রমে "Mr. Islam of Bangladesh" হতে পারবেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্টদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। এর ইঙ্গিত ইসলাম পন্থীরা বুঝতে না পারলেও ইসলাম বিরোধীরা ঠিকই বুঝেছিলেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলমের ইতোপূর্বে বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত লেখাগুলো সঙ্কলন করে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা, সমালোচনা ও উচ্চতর চিন্তার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "মাদ্রাসা শিক্ষা" শীর্ষক পুস্তকটি প্রকাশ করা হলো। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের এ ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও মেহনত কবুল করুন এবং এক্ষেত্রে অন্যদের দ্বারা উন্নততর অবদানের এবং আমাদের সকলের মাকসুদ হাসেলের তওফিক দিন। আমীন!

মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

ভূমিকা
মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ নতুন প্রেক্ষাপটে

বৃটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিং কর্তৃক অক্টোবর ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা মাদ্রাসায় পর পর ২৬ জন অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজ নাসারা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইংরেজদের সঙ্গে আলীয়া মাদ্রাসার সংযোগ ছিল নিবিড়। ক্যালকাটা আলীয়া মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ড. এ. স্প্রেঙ্গার (১৮৫০-৫৭)। সর্বশেষ ইংরেজ অধ্যক্ষ ছিলেন আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লি (১৯১১-২৩ এবং ১৯২৫-২৭)। ১৮৫০ সালে প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োগের পূর্বে (১৭৮০-১৮৫০) ক্যালকাটা মাদ্রাসার প্রধান নির্বাহীর পদবী ছিল সেক্রেটারী। সেক্রেটারীও হতেন ইংরেজ। ক্যাপটেন আয়রন (Capt. Iron) ছিলেন প্রথম সেক্রেটারী।

ক্যালকাটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ১৪৭ বছর পর ১৯২৭ সনে শামসুল 'উলামা কামালুদ্দিন আহমদকে (আই.ই.এস.) প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ (১৯২৭-২৮) নিয়োগের পর থেকে ক্যালকাটা 'আলীয়া মাদ্রাসায় ইংরেজীর প্রভাব কিছুটা কমতে থাকে এবং আরবী ও উর্দুর প্রভাব বাড়তে থাকে। 'আলীয়া মাদ্রাসাকে শুধু ধর্মীয় কাজ সমাধা এবং সাধারণ শিক্ষায় পাশ্চাত্য সভ্যতামুখী করার প্রচেষ্টা বিভিন্ন কৌশলে ও বিভিন্ন সময়ে হতে থাকে। ইংরেজদের স্বার্থে ইসলামের প্রকৃত চেতনাকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে এ দেশে দু'ধরনের শিক্ষা চালু করা হয়।

দেওবন্দী সিলেবাস

আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ৮৬ বছর পর প্রকৃত ইসলামী চেতনার আলোকে ১৮৬৬ সনে যুক্ত প্রদেশের দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলুম দেওবন্দ। এর প্রভাবে বার্মা, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে দেওবন্দী মাদ্রাসার অনুরূপ বহু কওমী মাদ্রাসা গড়ে উঠে। উপমহাদেশের বাইরেও বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বহু দেওবন্দী মাদ্রাসা তাবলীগের প্রভাবে গড়ে উঠে। এর একটা কারণ হলো, দেওবন্দ মাদ্রাসার সু-চিন্তিত সিলেবাস, শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ। অপর কারণটি হলো দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে তাদের নিজস্ব কর্মস্থলে বা জেলায় মাদ্রাসা স্থাপনের প্রবনতা সৃষ্টি।

দেওবন্দ মাদ্রাসায় নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের ফজিলত এবং মাদ্রাসা পরিচালনা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য বড় একটি প্রয়োজন হলো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সাংগঠনিক জ্ঞান, তৎপরতা এবং মাদ্রাসার শিক্ষক হওয়ার দক্ষতা।

শিক্ষক ও সংগঠক প্রশিক্ষণ

বিত্ত, অর্থ, জমি, গৃহ, ইমারত হলেই হয় না, মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য প্রতিভাবান অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন অনেক বেশি। শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসার পুকুরে গোসল করতে, সুন্দর হোষ্টেলে থাকতে, পরিষ্কার টয়লেট ব্যবহার করার জন্য মাদ্রাসা খোঁজ করে না। ঐ মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী যেতে চায়, যেখানে শিক্ষার ভালো পরিবেশ এবং প্রতিভাবান শিক্ষকের সন্ধান পায়।

সকল মাদ্রাসা শিক্ষিতদের পক্ষে সফল ও দক্ষ শিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা দানের প্রবনতা ও প্রতিভা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ দান। যাদের মধ্যে এ ক্ষমতা আছে তারা নিজেরাও সে সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই অবহিত বা সচেতন নয়। কার মধ্যে শিক্ষকতার প্রবনতা ও শিক্ষকসুলভ গুণাবলী আছে তা বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রমানিত হয়।

মাদ্রাসার উপরের ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরকে নীচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পড়াবার দায়িত্ব দেয়া যায়। এতে তাঁদের শিক্ষকসুলভ গুণাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীগণ সচেতন হবেন এবং তাঁরা নিজেরা যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তার ভিত্তি ও শক্তি সম্পর্কেও প্রত্যয়শীল হবেন। তার পক্ষেই সফল শিক্ষক হওয়া সম্ভব যিনি শিক্ষা প্রদানে প্রকৃতিগতভাবে সক্ষম এবং যার শিক্ষকতার গুণ আছে।

দুনিয়াবিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা

সুচতুর ইংরেজদের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির ফলে সৃষ্ট অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানধারী মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমগণ কওমী মাদ্রাসাসমূহে একসময় ইংরেজী চর্চা হারাম মনে করতেন। সঙ্গত কারণও ছিলো। ভারতীয় মুসলমানগণ রাজ্যহারা হয়ে বিজয়ী শক্তি ইংরেজদের রুদ্ররোষের শিকার হয়। জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের হস্তচ্যুৎ হয়। মুসলমানদেরকে ক্ষমতা ও প্রশাসনিক কাজ হতে দূরে রাখার অসৎ উদ্দেশ্যে রাজকার্য ফার্সী ভাষা থেকে ইংরেজী ভাষা চালু করে। এ প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেওলিয়া, হতাশাগ্রস্থ মুসলমানেরা ভাবেন – দুনিয়ার তো সব কিছুই হারিয়েছি, অন্তত: আখিরাতটা যেন হাতছাড়া না হয়।

তারা ইংরেজের রাজ-দরবার, চাকুরী-বাকুরী, সামরিক বাহিনী, শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু আখিরাত চর্চায় নিরত হন। দ্বীনি শিক্ষিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের সবকিছু থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেন। এ প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠে দেওবন্দ মাদ্রাসার সিলেবাস অনুসরণ করে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এ সমস্ত মাদ্রাসায় অনুসৃত বর্তমান সিলেবাস পাঠ করে কারো পক্ষে তাজমহলের স্থপতি ঈসা আফেন্দী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ইবনে সিনা, আল-রাজী, বৈজ্ঞানিক ফারাবি, সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন, পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, আল-বিরুনী, ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক, দার্শনিক আলকিন্দী, ভাষাবিদ শহীদুল্লাহ্, কবি ফেরদৌসী, হাফিজ প্রমুখের মতো হওয়া সম্ভব ছিল না – যারা দুনিয়াদারী সাফল্যের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসেবে বিবেচিত ছিলেন।

নতুন প্রেক্ষাপট

মুসলিম বিশ্ব এখন পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দাসত্ব-মুক্ত। নতুন প্রেক্ষাপটে স্বাধীন, সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে ধারা এখনো শুরু হয়নি।

যে প্রেক্ষাপটে ইংরেজীকে তৎকালীন আলেম-উলামা হারাম ঘোষণা করেছিলেন এর পরিবর্তন হয়েছে। বৃটিশ রাজত্বকালে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে কারো কারো মুসলমানিত্ব ছেড়ে খ্রীষ্টান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সে ধারা এখন আর নেই। অর্থনীতি, প্রযুক্তি বিদ্যায় অনগ্রসর হলেও মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবল, কিন্তু ধর্ম পরিবর্তনের আগ্রহ দুর্বল।

হীনমন্যতা হ্রাস

বৃটিশ আমলে কোন সঙ্গতিপূর্ণ ঘরের সন্তান ব্যারিষ্টারি পড়া বা উচ্চ শিক্ষার জন্যে ইংল্যান্ডে যাওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার ইচ্ছায় বিয়ে করে যেতেন। পাছে আদরের দুলাল হীনমন্যতা বশতঃ বিদেশে বিয়ে করে মেম সাহেব নিয়ে দেশে না ফিরেন। কেউ কেউ বিয়ের পর পিতার নির্দেশে বা শ্বশুরের অর্থে স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হতেন।

এখনকার মুসলিম যুবকদের কেউ কেউ বিদেশে গিয়ে হয়তো আনন্দ উপভোগ করেন, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বৌ নিয়ে দেশে ফিরেন খুবই কম। ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতি ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেনা। প্রাত্যহিক জীবনে বিদেশী সংস্কৃতি অনুসরণ করলেও তারা পুরোপুরি সাহেব হয়ে যান না।

সুদমুক্ত অর্থনীতি

অর্থনীতিতেও পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং চালু হচ্ছে। সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীসগুলোর চর্চা হওয়া অতীতের চেয়ে বর্তমানে আরো অধিক প্রয়োজন। অতীতে মুসলিম ব্যবসায়ীদের পক্ষে সুদমুক্ত জীবনযাপন কঠিন ছিল।

আমার জানা মতে ঢাকা নগরীর বারিধারা, গুলশান, বনানী, ধানমন্ডিতে দু'জনের বেশি মাদ্রাসা শিক্ষিত বা হুজুর কেবলাদের বাড়ী নেই। এ বাড়ীগুলোর অধিকাংশই হয়তো গড়ে উঠেছে যৎসামান্য হালাল টাকার সঙ্গে সুদভিত্তিক ঋণের টাকায় অথবা অবৈধ উপার্জনের অর্থে। সুদকে অর্থনৈতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল। এখন সে অবস্থা নেই। সুদ ও সুদী ব্যাংকিং ছাড়াও অর্থনীতি চলতে পারে। তাই সুদ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর অধিকতর চর্চা প্রয়োজন।

খেলাপী ঋণ সংস্কৃতি

আমাদের দেশে ব্যাংক সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো খেলাপী ঋণ সংস্কৃতি। অতীতে মহাজনেরা ছিলেন শক্তিশালী, আর ঋণ গ্রহীতারা ছিলেন দুর্বল। এই অবস্থায় সুদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত যে হাদীসগুলো ছিল, তা বারবার উচ্চারণ ও উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি।

বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরে ঋণ দিয়ে চড়া হারে সুদ আদায় করা দূরের কথা, আসলই পাওয়া যায়না। শতকরা ৪০ ভাগ ঋণ খেলাপী। হুক্কুল এবাদ বা বান্দার হক এর চেতনা হুক্কুল্যাহ এর চেতনার ন্যায়ই দুর্বল। এ প্রেক্ষাপটে ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত হাদীসগুলো অধিকতর গুরুত্বের দাবীদার। এ সংক্রান্ত নতুন কোন হাদীস গবেষণা করে আবিষ্কারের প্রয়োজন হবে না। তবে, যে হাদীসগুলো যুগের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয়, সেগুলোর চর্চা বেশি করতে হবে।

তেজারতি বিমুখ শিক্ষা

অতীতে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা ছিলেন ব্যবসা বিমুখ। ব্যবসা করতে হলে ব্যাংক ঋণ প্রয়োজন। সুদী ঋণ ছাড়া ব্যবসা করা ছিল অনেকটা অসম্ভব। উলামায়ে-কিরাম সুদ দিয়ে মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করা অপেক্ষা স্বল্প আয়ে দীন হীন সরল জীবন-যাপন করা এবং মাদ্রাসা পরিচালনার জন্যে দান, সাদাকাহ, অনুদান ও ফেতরার উপরই নির্ভর করতেন।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জন্যে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ) বলেছেন যে, সৎ ব্যবসায়ীদের হাশর হবে সিদ্দিক, সৎ কর্মশীল, নবী এবং শহীদদের সাথে।

মুনাফার ভিত্তিতে শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংক থেকে টাকা ধার করে 'উলামা-উল-কিরামের উচিত ব্যাপক হারে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করা। ব্যবসা-বাণিজ্য না করতে পারলে, বিত্তশালী না হলে হৃদয়ে কুফরী আছর পড়ে ও হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়।

মক্কা ছিল আরবের সবচেয়ে বড় ব্যবসা কেন্দ্র। মক্কী সাহাবীদের অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী। মদীনার ন্যায় মক্কায় কৃষির সুযোগ ছিল না। দুনিয়াতেই বেহেস্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত নয়জনই ছিলেন তৎকালীন মাপকাঠিতে ধনী।

হযরত উমর (রাঃ) এক তরকারীর বেশি খেতেন না। চৌদ্দ তালিওয়ালা জুব্বা পরতেন। তার সর্বশেষ স্ত্রী ছিলেন হযরত আলী (রাঃ) এবং বিবি ফাতিমার (রাঃ) কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ)। এ বিয়েতে তিনি মোহরানা দিয়েছিলেন ৪০,০০০ দেরহাম। তৎকালীন ৪০,০০০ দেরহাম বর্তমান দ্রব্য দামে কোটি টাকার উপর। (আল্লামা শিবলী নোমানী (রঃ) কৃত আল-ফারুক, (উর্দু) ইংরেজী অনুবাদঃ মুহাম্মদ সেলিম)।

হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) ভিন্ন অন্য সাহাবা-উল-কিরাম সম্পদকে তত ঘৃণা করতেন না। তারা সম্পদ উপার্জন করতেন। ধনী হতেন। ধন ব্যয় করতেন ভোগে নয়; দ্বীনের তাবলীগে এবং প্রচারে।

ফকির, মিশকিন এবং চাকুরীজীবীরা সাধারণত ঝুঁকি নিয়ে বড় কোন কাজ করতে পারে না। তারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে স্বনির্ভর হতে পারেন না। তাদের অনেকে আল্লাহ্‌র এবং নিজেদের মাঝখানে রাজ্জাক বা রিযকদাতা হিসেবে অন্য মানুষকে গ্রহণ

করে। যা কুফরীর নামান্তর। এছাড়া চাকুরী হলো চাকরের কাজ, যত বড় চাকুরীজীবীই তিনি হন না কেন?

দু'শত বছরের বৃটিশ গোলামী আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষিতদেরকে গোলাম এবং মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে সাদাকা নির্ভর মিসকিনের মানসিকতা সম্পন্ন করে তুলেছে। মিসকিনদের দারিদ্র মুক্তি সাংস্কৃতিক গোলামদের গোলামী শৃঙ্খল হতে মুক্তি অপেক্ষা সহজতর সাধনা। আমার মতে এ সাধনার একটি হলো দ্বীনি চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিল্প বাণিজ্যে অংশগ্রহণ।

ইসলামী ব্যবসা বাণিজ্যের ধরন হলো মুদারাবা, মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জেল, বাই-সালাম, ইজারা, হায়ার পারচেজ, ইত্যাদি। যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষিত আল-উলামা উল-কিরাম ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যবসা করতেন না, তাই ইসলামী ব্যবসার ধরনগুলো সম্বন্ধে তারা ততটুকু উৎসাহী ছিলেন না।

ব্যবসা সংক্রান্ত উপরোক্ত শব্দগুলোর অর্থ বহু উলামা উল-কিরাম কিছুটা অনুমান করতে পারেন কিন্তু সঠিক অর্থে দেখা যায় অনেকেই জানেন না। ইসলামী ব্যাংক স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যবসা পদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

যুগোপযোগিতা

কুরআনের তাফসীর এবং হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন আছে। কিন্তু মর্মার্থ চিরন্তন, শাশ্বত ও কালজয়ী। কুরআন এবং হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞানচর্চায় মুক্তবুদ্ধির অবকাশ নেই।

আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রিয়নবী (সাঃ) যা বলে গেছেন, তা আমাদেরকে অন্ধের মতো গ্রহণ করতে হয়। এর কোনো উন্নয়ন বা সংস্কারের প্রশ্ন উঠে না। যুগের পরিবর্তনের সাথে অতীত প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহের কিছু কিছু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে।
কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মর্মার্থের কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু তুলনামূলক প্রয়োজন ও গুরুত্বের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে।

যানবাহন

মধ্য যুগের যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত উট, গাধা, হাতী, ঘোড়ার ব্যবহার ও গুরুত্ব বর্তমানে কমে গেছে। বাস, ট্রাক, কার ইত্যাদি প্রবর্তিত হয়েছে।
আধুনিক প্রযুক্তিগত যানবাহন বিপ্লবের পূর্বে যানবাহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনার হার ছিল কম। পথিমধ্যে রাহাজানি এবং সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি ভিন্ন অন্য কোন দুর্ঘটনা ছিলো না। এ যুগে পেশাগত ডাকাতদের হাতে এক বছরে যত লোক মারা যায়, এর চেয়ে বেশি লোক মারা যায় দায়িত্বহীন, মদ্যপায়ী, অসতর্ক ড্রাইভার এবং সারেঙদের হাতে।

সন্ত্রাসী হাইজ্যাকারগণ আমার মতে পেশাগত ডাকাত নয়। এরা হলো রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের পোষ্যপুত্র। প্রশাসন নিরপেক্ষ, সৎ, দক্ষ ও কঠোর হলে সৌখিন পেশাদার সন্ত্রাসীরা দমে যাবে।

আধুনিক যুগের-চাহিদা পূরণ করতে হলে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত হাদীসগুলো মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করতঃ শিক্ষার্থীদের দুর্ঘটনা রোধে প্রশিক্ষণ এবং বিবেক সংশোধন

অপরিহার্য্য। শুধুমাত্র আইন করে বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ভাবে কাউকে শাস্তি দিয়ে অপরাধ প্রবনতাসহ বর্তমান যানবাহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ও মৃত্যু হার হ্রাস করা যাবে না।

বর্তমানে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে হলে প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়। এর ফলে এদেশে তৈরী হবে দক্ষ, সৎ ও ঈমানদার প্রকৌশলী, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, বিচারক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী এবং আমলাসহ বিভিন্ন পেশাজীবি।

যোগাযোগ বিপ্লব

প্রত্যেক বছরই প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নয়ন ও পরিবর্তন হচ্ছে। কম্পিউটার জ্ঞান, ই-মেইল, ই-কমার্স, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি প্রতি বছরই উন্নত হচ্ছে। কম্পিউটার এবং কম্পিউটেশন টেক্‌নলজি প্রত্যেক বছরেই পরিবর্তন হচ্ছে। তাই এ সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম দু'তিন বছরের মধ্যেই পরিবর্তন প্রয়োজন।

দেওবন্দ মাদ্রাসার সিলেবাস ও কারিকুলামে গত একশ' বছরেও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিবর্ধন লক্ষ্য করা যায় না।

আত্ম-সমালোচনা বনাম আত্ম প্রবঞ্চনা

জীব-বিজ্ঞান, মৃৎ-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান, ইংরেজী ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করে যদি কেউ সন্তোষজনক অথবা সম্মানজনক জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ করতে পারেন – তবে কুরআন ও হাদীস আয়ত্বকারীরা কেন তা পারবেন না ?

মাদ্রাসা শিক্ষার বর্তমান সিলেবাস ও পাঠদান পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে এ শিক্ষাব্যবস্থা বহু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সেবাদাসদের ঘৃণা, উপহাস ও বিদ্রুপের উদ্রেক করে। এজন্যে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের দায়িত্ব কম নয়। আমরা অনেকেই কোনো একটি ভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে, পড়তে এবং বলতে পারি না। এ অজ্ঞতা, অক্ষমতার জন্যে ইসলাম বিরোধীদেরকে একতরফাভাবে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়।

শিক্ষার মাধ্যম, পঠনীয় বিষয়, পাঠ্যপুস্তক প্রনয়ন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষিতগণ পাশ্চাত্য শিক্ষিতের ভালো দৃষ্টান্তগুলো থেকে কিছু কিছু অনুসরণ করতে পারেন।

অন্যের উপর নিজের দোষ চাপিয়ে কিছুটা আত্মতৃপ্ত হতে কেউ কেউ পারি। নিজের অক্ষমতা, দুর্বলতার কারণ দূরীভূত না করে অন্ততঃ অনুধাবনের প্রচেষ্টাহীনতা অতি উঁচু স্তরের আত্ম-প্রবঞ্চনা। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগ জিজ্ঞাসা ও যুগের প্রয়োজনের তাগিদে ঢেলে সাজাতে হবে।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
ফোন ঃ ৮৩১২৪৮০ (বাসা)

সূচীপত্র

।। প্রথম অধ্যায় ।।

১। মাদ্রাসা শিক্ষা ১
২। দ্বীনি মাদ্রাসা ৩
৩। বৃটিশ সৃষ্ট দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা ৭
৪। অরিয়েন্টেশন (আধুনিকিকরণ) মাদ্রাসা ১০

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

৫। পেশা শিক্ষা মাদ্রাসা ১২
৬। প্রকৌশল ও মেডিক্যাল মাদ্রাসা ১৪
৭। কৃষি মাদ্রাসা ১৭
৮। হোমিওপ্যাথি, হেকিমী, কবিরাজী মাদ্রাসা ১৯
৯। কারিগরী (ভোকেশনাল) মাদ্রাসা ২২
১০। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ একটি প্রয়োজনীয়তা ২৭

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

১১। মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ভাষাচর্চা ২৯
১২। অশুদ্ধ ভাষা প্রীতি ও ভীতি ৩৩
১৩। মাখরাজ (আরবী উচ্চারণ) ৩৬
১৪। আরবী অক্ষরের মাখরাজ ৪০
১৫। ভাষা চর্চায় মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ৪৯

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

১৬। আল-আরাফাহ্ (ইংলিশ মিডিয়াম) মাদ্রাসা ৫৪
১৭। আল-আরাফাহ্ (ইংলিশ মিডিয়াম) মাদ্রাসায় ইসলামী পরিবেশ .. ৬০
১৮। কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা ৬৪
১৯। কিন্ডারগার্টেন উৎকর্ষতা ৬৬
২০। মসজিদ কেন্দ্রিক ইসলামী কিন্ডারগার্টেন ৭০
২১। কিন্ডারগার্টেন পরিচালনা সচেতনতা ৭৩
২২। কিন্ডারগার্টেন পরিচালনা কারা করবেন ? ৭৬

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

২৩। ফোরকানিয়া মাক্তাব ৭৯
২৪। ফোরকানিয়া ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি ৮৩
২৫। ফোরকানিয়া মাক্তাবের অবদান ৮৬
২৬। ফোরকানীয়া মাক্তাব শিক্ষকের অবদান ৯০

২৭। ফোরকানিয়া মাক্তাবের পাঠ্যসূচি ৯৩
২৮। শিশুদের অক্ষর পরিচয় ৯৭
২৯। মাক্তাবে বয়স্ক শিক্ষা ১০২

।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

৩০। হাফিজিয়া মাদ্রাসা ১০৭
৩১। হিফ্জ-এর মেয়াদ ১১০
৩২। হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতি ১১৩
৩৩। হাফিজিয়া মাদ্রাসার সমস্যা ১১৮
৩৪। হাফিজিয়া মাদ্রাসার আর্থিক সমস্যা ১২১
৩৫। বালিকা হাফিজিয়া মাদ্রাসা ১২৪
৩৬। মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা(শাহাতলী চাঁদপুর) ১২৬

।। সপ্তম অধ্যায় ।।

৩৭। মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন ১৩৯
৩৮। নারীদের দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ ১৪২
৩৯। মহিলা মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা ১৪৫
৪০। মহিলা মাদ্রাসার গুরুত্ব ১৪৭
৪১। মহিলা মাদ্রাসার উপকারিতা ১৫০
৪২। মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষার সুফল ১৫৫
৪৩। মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষামান ১৫৭
৪৪। মহিলা মাদ্রাসা সিলেবাস ১৫৯
৪৫। মহিলা মাদ্রাসার স্থান ১৬১
৪৬। মহিলা মাদ্রাসা সংগঠন ১৬৩
৪৭। মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্যোগ ১৬৫
৪৮। নারীর শ্রেষ্ঠত্ব ১৬৭
৪৯। পরিশিষ্ট-ক ঃ বাংলাদেশে দাওয়ায়ে হাদীস স্তরে মাদরাসার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা ১৭১
৪৯। পরিশিষ্ট-খ ঃ Names of Principals of Calcutta/Dhaka Alia Madrasa ১৭৭
৫০। তথ্যপঞ্জি ১৭৯

প্রথম অধ্যায়

মাদ্রাসা শিক্ষা

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে ভারতে শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্যাগোডা, ভিক্ষুশালা, মনাসটারি, ব্রাহ্মনদের আশ্রম, মঠ এবং টোল। পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল গির্জা কেন্দ্রিক। এখনো পাশ্চাত্যে প্রাইমারী শিক্ষা পরিচালনা করেন মূলতঃ পাদ্রীগণ। শুধুমাত্র প্রাইমারী শিক্ষা নয়; বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাও পাদ্রীগণ পরিচালনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ইন্ডিয়ানা ষ্টেটের নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বহু ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও দুনিয়াদারী শিক্ষার পাশাপাশি সম মর্যাদায় পরিচালিত হয়। ঢাকা শহরের নটরডেম কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল এবং অন্যান্য পাদ্রীচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্ম বিবর্জিত প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

বিশ্ববিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হতেন মসজিদের ইমাম। সারফুদ্দিন আবু তাওয়ামা-এর (মৃঃ ১৩০০ খৃঃ) স্মৃতিধন্য সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক এবং মসজিদ সংলগ্ন। মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ফারকানীয়া মাক্তাব এখনো চালু আছে।

মুসলীমগণ ভারতে মাদ্রাসা ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। মুসলিম রাজত্বকালে এশিয়ায় এবং উপমহাদেশে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। মাদ্রাসাসমূহ পরবর্তীতে মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

পর্যাপ্ত সামাজিক এবং রাষ্ট্রিয় পৃষ্টপোষকতার অভাবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অজ্ঞতার কারণে মাদ্রাসাসমূহ সমাজের প্রত্যাশিত মানে পরিচালিত হতে পারছে না।

গৌরবময় মুসলিম শাসনামলে মাদ্রাসার সিলেবাস এবং পাঠক্রমের দু'টি প্রধান ভাগ ছিল। একটি হলো **আল-উলুমুন নাকলিয়া** এবং অপরটি **আল-উলুমুল আকলিয়া**। আল উলুমন নাকলিয়া হলো নকল, অনুসরণ, অনুকরণগত জ্ঞান। আল-উলুমুল আকলিয়া হলো আকল প্রসূত জ্ঞান।

আল-উলুমুন নাকলিয়া

কুরআন, হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞান হলো নকল বা **নাকলিয়া** সংক্রান্ত জ্ঞান। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি হলো **আকল** সংক্রান্ত জ্ঞান। প্রতি রাকাআত নামাজে আছে একটি রুকু এবং দু'টি করে সিজদা। রুকু যখন একটা করি, সিজদাহও প্রতি রাকাআতে একটা করবো অথবা সিজদাহ যখন দু'টা করি রুকুও প্রতি রাকাআতে দু'টা করবো – এমন আকল বা যুক্তি খাটালে চলবে না।

আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যাতু ও দরুদ পাঠের পর প্রথম সালাম ডান দিকে এবং দ্বিতীয় সালাম বাম দিকে ফিরাতেন। আজকাল বহু মুসলিম দেশেই ইয়াহুদী নাছারাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে অনেক কাজই আমরা বাম হতে শুরু করি। কুচকাওয়াজের লেফ্‌ট রাইট, বাম-ডান তো আছেই, পথে হাঁটা, যানবাহন এবং অন্যান্য অনেক কিছুই চলছে বাম হতে।

বামপন্থীদের প্রভাবে যদি আমরা নামাজের শেষে সালামও বাম দিকে প্রথমে ফিরাই এবং ডান দিকে দ্বিতীয় সালাম ফিরাই, তা হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে ভাবে নামাজ পড়েছেন তা অনুসরণ করতে হবে। প্রিয় নবীর (দঃ) যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে সে বিষয়ে মুক্তবুদ্ধি বা যুক্তির কোনো প্রশ্নই এখানে উঠে না।

কৃষি, শিল্প তথা দুনিয়ার জীবন সংক্রান্ত বস্তুতান্ত্রিক ইলমকে বলা হয় আল-উলুমুল আকলিয়া বা আকল ভিত্তিক বিজ্ঞান। বর্তমানে মাদ্রাসাসমূহে পাঠ্য বিষয় হলো আল-উলুমুন নাকলিয়া। কুরআন হাদীসে আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ) যা বলেছেন আমাদের কর্তব্য হলো সেটা জেনে এবং বুঝে হুবহু নকল করা এবং অনুসরণ করা।

আল্লাহ্ যা বলেছেন তা সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য আকল দরকার হয়। আকল দিয়ে অনুধাবন করার পরেই আমাদের কর্তব্য হলো অন্ধের মতো তা অনুকরণ করা। অনুকরণ, অনুসরণে মুক্তবুদ্ধি বা নিজস্ব চিন্তাধারা বা দর্শনের কোন স্থানই নেই।

কুরআন হাদিসে যা বলা হয়েছে এর কোন সমালোচনামূলক পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ হতে পারে না। কোন নতুন আবিস্কার, সংযোগ এবং বিদ্‌আতের স্কোপ এ ক্ষেত্রে নেই।

আল-উলুমুল আকলিয়া

অন্য দিকে রাষ্ট্র সাধনা, যুদ্ধ পরিচালনা, গৃহ নির্মাণ, চাষাবাদ, ঔষধ আবিষ্কার, উন্নততর গরু-ছাগল, মাছ, ফল, তরি-তরকারি, যানবাহন, নৌ-পরিবহণ, আকাশ-যান, সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদন, সমুদ্র যাত্রা, সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ, খনিজ সম্পদ উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে আল-কুরআন ও সুন্নাহর সীমা রেখার মধ্য থেকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা নতুন নতুন আবিষ্কারের ভিত্তিতে নতুন কিছু বা বিদআত প্রবর্তনের সুযোগ রয়েছে।

অতীতকালের মুসলমানগণ জাগতিক বিষয়ে লেখা পড়া ও গবেষণা করতেন। যুদ্ধ বিদ্যার নব নব প্রকরণ ও উপকরণ উদ্ভাবন করতেন। অমুসলিমদেরকে জিহাদে পরাজিত করে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিতে দ্বীনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। তৎকালীন মাদ্রাসাসমূহ সিলেবাস এবং পাঠক্রমের দিক থেকে বর্তমান মাদ্রাসা থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল।

তাজমহলের নির্মাতা ঈছা আফেন্দী, দার্শনিক আবু হামেদ গাজালী (রঃ), সমাজতত্ত্ববিদ ইবনে খালদুন, চিকিৎসক ইবনে সিনা, গাজী সালাহউদ্দীন আইউবী, গাজী নূরুদ্দীন জঙ্গী মাদ্রাসার ছাত্রই ছিলেন। কুরআন এবং সুন্নাহর চৌহদ্দির মধ্যে থেকে তারা জাগতিক উন্নয়নমূলক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতেন। আকল খাটিয়ে নব নব সূত্র আবিষ্কার করতেন।

বর্তমানে ইসলামী মাদ্রাসাসমূহে আল-উলুমুন নাকলিয়া আগের মতই চলছে। কিন্তু আল-উলুমুল আকলিয়া মাদ্রাসা বিচ্যুত হয়ে কলেজ ইউনিভারর্সিটিতে স্থান করে নিয়েছে।

দ্বীনি মাদ্রাসা

বাংলাদেশ ছিল মধ্য এশিয়া হতে বহু দূরে। বিজেতা রাজা বাদশাহদের পদভারে সমরখন্দ, বুখারা, বাগদাদ, বসরা প্রভৃতি শহর যুগে যুগে প্রকম্পিত হয়েছিল। দেশ বিজেতা সেনাবাহিনী তাদের খাদ্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও লোক-লস্কর সংগ্রহে বেসরকারি নাগরিকদের গৃহে হানা দিত। মাদ্রাসাও বাদ পড়তো না।

বাংলাদেশ শুধু মধ্য এশিয়া নয়, সুদূর ভারত উপমহাদেশেরও শেষ প্রান্তে অবস্থিত শিক্ষা কৃষ্টি সমৃদ্ধ একটি দেশ। এদেশে জুলুম, অত্যাচার, হত্যা, লুটপাট ছিল কম। শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল বেশি। ফলে সুফী, দরবেশ ও জ্ঞান সন্ধানীদের জন্য এদেশ ছিল নিরাপদ এবং আকর্ষণীয় স্থান।

সুবা-বাংলায় সবুজের সমারোহ, বৃক্ষ-ছায়া, নদী-নালা, আলেম 'উলামাদের মনে জান্নাতের বর্ণনার স্মৃতি জাগিয়ে দিত। তারা এদেশটি জিকির-আজকার এবং 'ইলম চর্চার জন্য অপেক্ষাকৃত শান্তির ধাম হিসেবে বিবেচনা করতেন। জ্ঞান পিপাসুরা আসতেন ইরান, তুরান, তুর্ক, সমরখন্দ, বুখারা, হেজাজ, নজদ, সিরিয়া, মিশর থেকে।

বখতিয়ার খিলজীর বাংলা জয়ের পর থেকে প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত সুবা-বাংলা ছিল জ্ঞান চর্চার একটি কেন্দ্র। মুসলিম সুবাদার, সুলতান, নায়েব, নাজিমগণ মাদ্রাসা খানকার জন্য উদার হস্তে দান করতেন। নগদ অর্থ যা দিতেন, লাখেরাজ সম্পদ দিতেন তার চেয়ে অনেক বেশি।

পলাশী যুদ্ধ, উদয়নালা-বক্সারের পরাজয়ের পর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর নামেহ্ মাত্র মোঘল বাদশা শাহ আলম সুবা-বাংলার দেওয়ানী বা রাজস্ব ব্যবস্থার দায়িত্ব বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার নজরানার বিনিময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। ১৭৬৫ ৩০শে সেপ্টেম্বর সম্পাদিত নবাব মিরজাফর ও বরার্ট ক্লাইভ চুক্তি মূলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নবাব মিরজাফরকে আদায়কৃত রাজস্ব হতে প্রদান করতো ৫৩,৮৬,১৩১ টাকা। এ সামান্য টাকার বিনিময়ে বাংলার জনগণের ভাগ্য বিক্রয় হয়ে গেলো ইংরেজদের হাতে।

ইংরেজরা সুবা-বাংলার খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে লক্ষ্য করে যে, ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় আশি হাজার মাক্তাব-মাদ্রাসা ছিল। এই আশি হাজার মাক্তাব মাদ্রাসার এবং খানকার জন্য বাংলার চারভাগের এক ভাগ জমি লাখেরাজ ভাবে বরাদ্দ ছিল।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্রমশঃ এই লাখেরাজ সম্পত্তি আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং জোর-জবরদস্তি করে দেশের হিন্দু জমিদার ও প্রজাদেরকে ইজারা দিতে থাকে। এ সংক্রান্ত তিনটি বিধান হলো – (১) ১৭৯৩ সনের রেগুলেশন–১৯, (২) ১৮১৯ সনের রেগুলেশন–২, (৩) রিজামসান ল অব ১৮২৮ (লাখেরাজ ভূমি পুনগ্রহণ আইন)। ফলে মাদ্রাসার আয় কমতে থাকে। বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়। গুটি কয়েক মাদ্রাসা কোনো প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

১৭৬৫ সনে বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল আশি হাজার। ২০০ বছর পর ১৯৬৫ সনে এ সংখ্যা ২ হাজারের নিচে নেমে আসে।

ক্যালকাটা আলীয়া মাদ্রাসা

বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ১৭৮০ সনে ক্যালকাটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যালকাটা মাদ্রাসার প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ ছিলেন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ১৪৭ বছর পর ১৯২৭ সনে নিযুক্ত শামসুল উলামা কামালুদ্দিন আহমদ। তৎপূর্বে প্রথম অধ্যক্ষ ডঃ এ স্প্রেঙ্গার হতে আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লি পর্যন্ত ২৫ জন অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজ নাছারা।

১৭৮০ সনে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার পর ১৭৯০ পর্যন্ত ১০ বছর ক্যালকাটা আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় দারসে নেজামিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল। অতঃপর মাদ্রাসা সিলেবাস হতে হাদীস, তাফসীর বাদ দেয়া হয়। ১১৮ বছর পর ১৯০৮ সনে ক্যালকাটা আলীয়া মাদ্রাসায় হাদীস, তাফসীর শিক্ষা চালু করা হয় এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রীকে নাম দেয়া হয় টাইটেল।

ক্যালকাটা (আলীয়া) মাদ্রাসাকে অনেকে বাগদাদের জামেয়া নিজামিয়ার অনুরূপ বা আদর্শিক মনে করেন। এ ধারণা ঠিক নয়। বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নিজামুল মুলক তূসী। উপ-মহাদেশের দারস-ই-নিজামিয়া প্রণয়ন করেন দিল্লীর নিজামুদ্দিন ফিরিঙ্গি মহল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর হতে পলাশীর বিপর্যয় পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস ছিলো অন্ধকার যুগ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী ছিলেন এ অন্ধকার ইতিহাসের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র (১৭০৭-১৭৬৩)।

দিল্লীর মোঘল সম্রাটগণ ছিলেন মারাঠা, জাট, রোহিঙ্গাদের হাতের ক্রীড়নক। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্'র আহ্বানে আহমাদ শাহ আবদালী আফগানিস্তান হতে এসে পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১খ্রীঃ) সম্মিলিত মারাঠা শক্তির দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেন। এতে দিল্লীতে বৃটিশদের আধিপত্য স্থাপন সহজ হয়।

দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক বৃটিশ কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। অন্যান্য প্রদেশেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে শাসন ক্ষমতাও ক্রমশঃ বৃটিশ সরকারের হাতে চলে আসে। কিন্তু আদালতি বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকে নাম মাত্র মুঘল সম্রাটের উপর। সম্রাট কাজী নিয়োগ করে আদালত বা দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। এ জন্যে কাজী বা বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন ছিল। ইসলামী ফিকাহ অনুসারে দেশ শাসিত হতো। ক্রমান্বয়ে বৃটিশ আইন জারী হতে থাকে।

কাজী নিয়োগের জন্যে মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমের দরকার হয়। এ অবস্থায় দিল্লীর মোল্লা নিজামুদ্দিন ফিরিঙ্গীমহল সাহালভি ইবনে কুতুবুদ্দিন (১০৮৯-১১৬১ হিঃ/মৃতুঃ ১৭৪৮খৃঃ) আট বছর মেয়াদী মাদ্রাসা শিক্ষার এক সংক্ষিপ্ত সিলেবাস প্রণয়ন করেন। নিজামুদ্দিন ফিরিঙ্গী মহল অত্যন্ত বিচক্ষণ আলিম ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত সিলেবাস সংশোধিত হয়ে দারস-ই নিজামিয়া নামে এখনো আমাদের দেশে চলছে। মোল্লা নিজামুদ্দিন ফিরিঙ্গি মহলের পুত্র আবদুল আলীও একজন বড়ো আলিম ছিলেন। তার উপাধি ছিল বাহারুল উলুম বা বিদ্যাসাগর। পিতার মৃত্যুর পর আবদুল আলী বুহারের জমিদারের অর্থানুকূল্যে বুহারে নিজামিয়া সিলেবাসকে ভিত্তি করে একটি বড় মাদ্রাসা

স্থাপন করেন ১৭৬১ সনে। এ ধরণের মাদ্রাসা শিক্ষিতদের তাড়াতাড়ি কাজী হিসেবে চাকুরী হয়ে যেতো। ফলে দারসে নিজামিয়া অনুসারে মাদ্রাসা স্থাপিত হতে থাকে।

বৃটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস বুহার থেকে মোল্লা মাজদুদ্দিনকে ক্যালকাটা মাদ্রাসা স্থাপনের জন্যে আমন্ত্রণ করে আনেন। মোল্লা মাজদুদ্দিন ১৭৮১-৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত কেলকাটা মাদ্রাসার হেড মাওলানা ছিলেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ অর্থনীতি, জেহাদ ইত্যাদি বাদ দিয়ে দারসে নিজামিয়াকে সংস্কৃতকরণ করা হয়। প্রাক ইসলামিক কবি ইমরুল কায়েসের যৌন কবিতা, যৌন সঙ্গীত ক্যালকাটা (আলীয়া) মাদ্রাসার সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এগুলো বেশ জনপ্রিয়ও ছিল।

দারসে নিজামিয়ার উপাদান ছিল - (১) কুরআন তিলাওয়াত, (২) কুরআনের কয়েকটি সূরাহ এবং কিছু অংশ মুখস্থকরণ, (৩) আরবী ভাষা ও (৪) হাদীস মুখস্থকরণ, (৫) ইসলামী ফিকাহ, মাসআলা মাসায়েল ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষণে মাসআলা মাসায়েল ও ফতোয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজন আলীয়া নেসাবের 'উলামায়ে কেরাম আজও পূরণ করছেন।

কাজী হিসেবে মামলা-মুকাদ্দমা, বিচার-আচারের কাজ এখন আর তাদের নেই। হারাম হালাল, জায়েজ নাজায়েজ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ভাগ বাটোয়ারা, কাফির, মুশরেক, ফাসেক নির্ণয়, ফেরকা, ফতোয়া, ইমামতি, দু'য়া দুরুদ পাঠ, জানাজা, কুলখানী, মিলাদ ইত্যাদি কাজে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তারা অনেকটা জায়েজ নাজায়েজ, হারাম-হালালের ফতোয়া দানের উস্তাদ এবং ইসলামী সমাজ বিষয়ে আইনজ্ঞের ভূমিকা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন।

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের দর্শন ইংরেজ সৃষ্ট মাদ্রাসা সিলেবাসে ছিলোনা। এর ফলে মাদ্রাসায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা শুধুমাত্র ধর্মীয় কাজগুলো সমাধা করা ছাড়া উল্লিখিত কাজগুলো সম্পর্কে ছিলো একেবারেই অনভিজ্ঞ। এতে তাদের ক্ষতি যা হয়েছে ইসলামী শিক্ষিতদের নেতৃত্ব হারিয়ে সমাজের ক্ষতি হয়েছে এর চেয়ে অনেক বেশি।

সাইয়েদুল মুরসালীন রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সাহাবা-ই-কিরাম এর মধ্যে কে কে পীরানে-পীর, অলী-দরবেশ, হুজুর কেবলা, তাবিজ-তুমার, পানি-পড়া দাতা, ফতোয়া-দাতা, অজিফা-দাতা, সিলসিলা ও তরিকাহ প্রবর্ত্তকের ভূমিকার জন্যে ইতিহাসে বিখ্যাত ছিলেন তা নির্ণয় করা পন্ডিত-গবেষকদের পক্ষে কঠিন ছিলো।

বাংলাদেশে আলীয়া মাদ্রাসা

১৯৭৮ সনে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কামিল মাদ্রাসা ছিল ৪৮টি, ফাজিল মাদ্রাসা ৩৯৯টি, আলিম মাদ্রাসা ৪৩৪টি এবং দাখিল মাদ্রাসা ৭৪১টি। সর্বসাকুল্যে ১৬২২ টি মাদ্রাসা ছিল।

১৯৭৮ সনে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ১৬২২টি মাদ্রাসার শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৭,৬২৪ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ। মাদ্রাসা শিক্ষিতের সংখ্যা ধরা হয় আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ।

সরকারি হিসাব মতে ১৯৭৮ সনে বাংলাদেশে ফোরকানীয়া মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৪,৮৯৬টি। শিক্ষক সংখ্যা ৯,৫৩২ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ৪,৭২,০২৮ জন। ফোরকানীয়া মাদ্রাসা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রায় মসজিদে ফোরকানীয়া মাকতাব আছে।

দেশে মসজিদের সংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ। ফোরকানীয়ার উক্ত সংখ্যা সরকারের নিকট থেকে কোনো প্রকার অনুদানপ্রাপ্ত মাক্তাবের তালিকা থেকে নেয়া।

১৯৯৮ সনে কামিল মাদ্রাসা হয়েছে ১২৬, ফাজিল মাদ্রাসা ৯৫৯, আলিম মাদ্রাসা ৯৬৯। দাখিল মাদ্রাসা ৪,৭৯৫। সর্বমোট ৬,৮৪৯। এ ছাড়া আছে– বহু এবতেদায়ী মাদ্রাসা। সংখ্যা ২৩,০৬৬। সর্বসাকুল্যে ২৯,৯১৫। (তথ্য ঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৩-০৭-১৯৯৯)।

সরকার স্বীকৃত আলিয়া মাদ্রাসা ছাড়াও বাংলাদেশে আছে কয়েকশত বা কয়েক হাজার কওমী মাদ্রাসা। যা তাদের নিজস্ব সিলেবাস ও পাঠক্রম অনুসরণ করে।

বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসা

সরকারী উদ্যোগে ১৭৮০ সনে কলিকাতা (আলীয়া) মাদ্রাসা স্থাপনের ৮৬ বছর পর জনগণের আর্থিক সহায়তায় ১৮৬৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় উপ-মহাদেশের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র দেওবন্দ দারুল উলূম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণে একই সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুযায়ী সর্বপ্রথম বড় মাদ্রাসা হলো মইনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (১৯০১ খৃঃ)। অন্যান্য বড় মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরী মাদ্রাসা চট্টগ্রাম (১৯২০ খৃঃ), ঢাকা ইসলামিয়া মাদ্রাসা (১৯২৫ খৃঃ), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাদ্রাসা (১৯২৫ খৃঃ), আশরাফুল উলুম বড় কাটরা মাদ্রাসা (১৯৩৬ খৃঃ), কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, চকরিয়া, চট্টগ্রাম (১৯৪৪ খৃ), জামিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম (১৯৪৬ খৃঃ)।

পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় হুসাইনিয়া আরাবিয়া রানাপিং মাদ্রাসা, সিলেট (১৯৪৮), দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা, গওহরডাঙ্গা, ফরিদপুর (১৯৪৯ খৃঃ), দারুল উলুম মাদ্রাসা, বরুড়া, কুমিল্লা (১৯৪৯ খৃঃ), আজিজুল উলুম, বাবুনগর, চট্টগ্রাম (১৯৫০), জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া, লালবাগ, ঢাকা (১৯৫০ খৃঃ), আশরাফুল উলুম বালিয়া মাদ্রাসা, মোমেনশাহী (১৯৫৪ খৃঃ), দারুল উলুম কানাইঘাট মাদ্রাসা (১৯৫৪ খৃঃ), জামেয়া এমদাদিয়া মাদ্রাসা, কিশোরগঞ্জ (১৯৫৫ খৃঃ), হুসাইনিয়া দারুল উলুম, উলামা বাজার মাদ্রাসা, নোয়াখালী (১৯৫৮ খৃঃ), দারুস সালাম সোহাগী মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ (১৯৬২ খৃঃ); জামেয়া রাহমানীয়া আরবিয়া, সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, জামেয়া সরইয়াহ্, মালিবাগ, ঢাকা; জামেয়া আরবিয়া ইমদাদুল উলুম, ফরিদাবাদ, ঢাকা; শামসুল উলুম মাদ্রাসা, চৌধুরী পাড়া, ঢাকা; জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম, খুলনা; মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, আমানতগঞ্জ, বরিশাল; কাশেমুল উলুম জামিল মাদ্রাসা, বগুড়া; জামেয়া কাশেফুল উলুম, শাহজালাল দরগাহ্, সিলেট; জামেয়া মাদানীয়া ইসলামিয়া, কাজির বাজার, সিলেট; জামেয়া ইসলামিয়া হুসাইনিয়া, গহরপুর, সিলেট।

১৯৬৬ সনে ৪৪৩টি দেওবন্দী মাদ্রাসার মধ্যে ৫১টি ছিল দাওরা হাদীস স্তরের। কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা বোধ হয় এখন চার হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

এ হিসাব থেকে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের মাদ্রাসা, শিক্ষক ও ছাত্র সংখ্যা কিছুটা অনুমান করা যায়।

বৃটিশ সৃষ্ট দ্বৈত শিক্ষা-ব্যবস্থা

বিজ্ঞান ও পেশাগত শিক্ষা মুসলিম শাসনামলে মাদ্রাসা বহির্ভূত ছিল না। মাদ্রাসার প্রতি বৃটিশের বৈরী নীতির ফলে দু'ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। এটা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইসলাম বিদ্বেষী নীতির বহিঃপ্রকাশ।

আল-উলুমুল আকলিয়া তথা চিকিৎসা, প্রকৌশল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সামরিক শিক্ষাগত জ্ঞান ইসলাম বিরোধী নয়। ইসলাম বিরোধী হয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষার পরিবেশ। বাম, কাম, বামপন্থী পরিবেশ হলে নরশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী আকীদা আখলাক থাকে না।

বৃটিশ সৃষ্ট দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতে বৃটিশদের আগমনের পর শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে দ্বৈততা। বৃটিশেরা মাদ্রাসায় আল-উলুমুল-আকলিয়ায় অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়। শুধু অর্থ বরাদ্দ নয়; ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেশন ১৯ এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেশন ২ এবং পরবর্তীতে লাখেরাজ ভূমি পুণঃ গ্রহণ আইন (রিজামসান ল অব ১৮২৮ খৃঃ) পাশ করে ইংরেজরা মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দকৃত লাখেরাজ সম্পত্তি দখল করে নেয়। ফলে মাদ্রাসাসমূহ শুধুমাত্র আল-উলুমুন নাকলিয়াতেই তাদের কার্যক্রম সীমিত রাখে। মাদ্রাসায় আল-উলুমুল-আকলিয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। ইংরেজরা এদেশে ইলমুল আকলিয়া শিক্ষার জন্য পৃথক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইয়াহুদী নাসারাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠলে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং শিক্ষিতদের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতা দূরকরণার্থে মাদ্রাসাগুলোতে প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান প্রবর্তনের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বীনি বিষয় শিক্ষা দান এবং ইসলামী আমল আখলাক প্রবর্তন করে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের কথা বলা হয় না।

ধর্মীয় মাদ্রাসায় যে ধরনের এবং মানের জ্ঞান দান করা হয়, অনুরূপ 'ইল্ম এবং আখলাক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা হলে এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বীনদারী পরিবেশ থাকলে দ্বীনি শিক্ষা যারা চান তারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সন্তানদের পাঠাবেন।

দ্বৈত শিক্ষা ব্যবস্থা সমন্বয় প্রচেষ্টা

আলীয়া মাদ্রাসাগুলোকেও পাশ্চাত্য করণের অপচেষ্টা বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। আল-উলুমুল আকলিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে মাদ্রাসাসমূহ আল-উলুমুন নাকলিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এখন আমাদের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার দু'টি ধারা সমন্বয় করা। অতীতে এ সমন্বয়ের একটি উদ্যোগ ছিল নিউ স্কীম মাদ্রাসা বা হাই মাদ্রাসা স্কিম প্রবর্তন।

হাই মাদ্রাসা সিলেবাস

নিউ স্কিম বা হাই মাদ্রাসা পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত মাদ্রাসাসমূহে ইংরেজী, বাংলা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল নিউ স্কিম মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে আল্লাহ্, রাসূল (সাঃ) এবং আখিরাতমূখী শিক্ষা থেকে রাষ্ট্র, সরকার এবং দুনিয়ামুখী শিক্ষার আগ্রহ প্রবণতাই বেশি। স্বল্পকালের মধ্যেই নিউ স্কিম মাদ্রাসাসমূহে দ্বীনি সিলেবাস সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যায়।

ভালো এবং মন্দের সহ অবস্থানে মন্দের প্রভাব বেশি হয়। ভালো দ্বারা মন্দ যতটুকু প্রভাবিত হয়, ভালো প্রভাবিত হয় মন্দ দ্বারা তার চেয়ে বেশি। দুই বালক বন্ধু বা দুই বালিকা বান্ধবীর মধ্যে একজন ভালো আরেক জন মন্দ। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব থাকলে ভালো বন্ধু বা বান্ধবীর চারিত্রিক শক্তি মন্দ বন্ধু-বান্ধবীর চরিত্রহীনতার নিকট পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আল্লাহ্ মানব চরিত্র সম্বন্ধে মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশি অবহিত। মানুষতো আল্লাহ্রই সৃষ্টি। আল-কুরআনে আল্লাহ্র নির্দেশ হলো "লা তাকরাবাঃ অর্থাৎ নিকটবর্তী হইওনা কোনো মন্দের। কুরআনের নির্দেশ-মন্দ কাজ করোনা – এর মধ্যে সীমিত নয় বরং মন্দের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

হাইস্কুল এবং মাদ্রাসায় পঠনীয় বিষয়ে সমন্বয় করে যে হাই মাদ্রাসা সিলেবাস প্রণীত হলো এর সুযোগ মাদ্রাসায় শিক্ষিত অভিভাবকগণ গ্রহণ করলেন। কারণ, তারা তাদের সন্তানদেরকে জীবন সংগ্রামে জয়ী দেখতে চান। পাশ্চাত্য শিক্ষিত অভিভাবকরাও গ্রহণ করলেন। কারণ, তারা তাদের সন্তানদের মধ্যে কিছু হলেও দ্বীনি ইল্ম এবং ইসলামী আখলাক (চরিত্র) দেখতে চান।

বহু দ্বীনদার ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরকালের নাজাতের উছিলায় মাদ্রাসার জন্য জমি, অর্থ, শ্রম দিয়েছিলেন। ইমারত তৈরী করে দিয়েছিলেন। এরূপ বহু মাদ্রাসা খালেছ মাদ্রাসা সিলেবাস পরিত্যাগ করে তথাকথিত হাই মাদ্রাসা সিলেবাস প্রবর্তন করে।

হাই মাদ্রাসায় দ্বীনি ইল্ম কিছু হাসিল হলো। কিন্তু এর পরিবেশ হয়ে গেল হাই স্কুলের মতো। শিক্ষকেরা কেউ হুজুর হওয়া পছন্দ করলেও ছাত্রদের পছন্দ ছিল সাহেব হওয়া বা স্যার হওয়া। হুজুর এবং সাহেবদের মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার, তমদ্দুন-সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য বর্তমানে যেমন আছে, অতীতেও ছিল। হাই মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা হুজুর না হয়ে স্যারই হয়ে গেলেন। এতেও বিষয়টির শেষ হলো না।

অভিভাবক এবং মাদ্রাসা পরিচালকেরা যখন দেখলেন যে, হাই মাদ্রাসার মধ্যে দ্বীনি আখলাক বিন্দুমাত্র নেই বা কমই আছে; তারা হাই মাদ্রাসা নামের মুখোশটিও রাখতে চাইলেন না। হাই মাদ্রাসাগুলোর নাম পরিবর্তন করে হাই স্কুলই করে দিলেন। যারা মাদ্রাসার জন্য জমি, অর্থ-বিত্ত, শ্রম-সাধনা বিনিয়োগ করেছিলেন তাদের দান অনুদান, শ্রম-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

বাংলাদেশ আমলেও মাদ্রাসাগুলোকে স্কুল-কলেজে রূপান্তর বা উত্তরণের ধারা বন্ধ থাকে নি। হাজী মুহাম্মাদ মহসিন ফান্ডের অর্থানুকুল্যে বহু মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল। এর

মধ্যে ঢাকা ইসলামী ইন্টারমিডিয়েট মাদ্রাসা/কলেজ একটি। এ মাদ্রাসাটিও দ্বীনি সিলেবাস পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য সিলেবাস প্রবর্তন করে। মাদ্রাসাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম হলো কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ। হাজী মুহাম্মাদ মহসিনের নামের স্মৃতিটুকুও মুছে গেল।

পাকিস্তান আমলে ঢাকার মালিবাগে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর প্রখ্যাত জলিলুল ক্বদর সাহাবী হযরত আবু জর গিফারীর (রাঃ) নামে আবুজর গিফারী সোসাইটির উদ্যোগে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্‌র নবীর (দঃ) কোনো সাহাবীর নামে এটাই ছিল এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ। এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ। এ কলেজটির লক্ষ্য ছিল তাওহীদী চেতনা ও সুন্নাতী জীবন ধারায় উদ্বুদ্ধ এমন মুসলিম তৈরী করা, যারা আবু জর গিফারীর (রাঃ) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলাম কায়েম করবেন এবং আবু জর গিফারীর (রাঃ) চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার করবেন। কিন্তু এ কলেজটিও স্বীয় লক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এ কলেজটি ধর্মনিরপেক্ষ কলেজে পরিণত হয়। আবু জর গিফারী (রাঃ) এর নামটি শুধু এখনো কলেজের মাস্তুলে শোভা পাচ্ছে।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বীনি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয় প্রবণতা সৃষ্টির কোনো উদ্যোগই নেয়া হয় না। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বীনি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত না করে মাদ্রাসা হতে ইসলাম বিতাড়িত করাই হলো শিক্ষা সমন্বয়কারীদের মাকসুদ এবং ষড়যন্ত্র।

উলুমুন নাকলিয়া এবং ইলমুল আকলিয়ার সমন্বয়ের প্রধান কার্যক্রম হলো সংশোধিত ও নবতর আলিয়া মাদ্রাসা সিস্টেম প্রবর্তন। এতেও মাদ্রাসার মধ্যে উলুমুল আকলিয়ার বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলো। কিন্তু ফল আশাব্যঞ্জক হয়নি। আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা শ্রেণীগতভাবে কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের মতো হলো না। তারা পাশ্চাত্য শিক্ষিত সাহেবও হলো না। তবে তারা হলো দ্বীনি শিক্ষিত মোল্লা অপেক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষিত স্যারদের নিকটবর্তী। আগামী দু'যুগের মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসাসমূহের পরিণতি হাই মাদ্রাসার মতোই হবে বলে আশংকা রয়েছে। এ আশংকা অমূলক নয়।

তত্ত্বাবধান ও পরিবেশ

মাদ্রাসার পরিবেশ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে না পারলে সমন্বয়ের যে স্কিমই গ্রহণ করা হোক না কেন তাতে মাদ্রাসায় দ্বীনি শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দ্বীনি শিক্ষিত হাক্কানী 'আলেম-'উলামা উল-কিরামের কঠোর তত্ত্বাবধানে এবং সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে ইলমুল আকলিয়া বিশেষ করে পেশাগত শিক্ষা মাদ্রাসা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হলে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে ঈমান-আক্বিদা, আমল-আখলাক এবং দ্বীনি চেতনা সংরক্ষণ হতে পারে। যেমন হয়েছে শর্ষিনা আলীয়া মাদ্রাসা, চরমোনাই আলীয়া মাদ্রাসা, ধামতি আলীয়া মাদ্রাসা ইত্যাদিতে।

সিলেবাস ও শিক্ষাক্রমের মধ্যে দ্বীনি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হলে এবং দ্বীনি চেতনা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে পৃথক মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তনের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়।

মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে ইমাম হিসেবে পুরোহিত নিয়োগ করলে মসজিদে নামাজ হবে না। পূজা অর্চনা হতে পারে। ইসলামের চেতনা বিরোধী ভাইস চ্যান্সেলর এবং শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে কোনো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে সেখানে কখনোই ইসলামী দর্শন অধ্যয়ন হবেনা। সেখানে হবে ইসলামের ব্যানারে পাশ্চাত্যের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী স্যাকুলারিজম শিক্ষা।

অরিয়েন্টেশন বা আধুনিকীকরণ মাদ্রাসা

কোনো পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তির ইংরেজী ভাষা, গ্রীক ইতিহাস বা পদার্থবিদ্যায় ডিগ্রী থাকলে তিনি যে কোন মন্ত্রণালয়ের সচিব বা একটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হতে পারেন। তবে চাকুরীর জন্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় তার সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, স্ব-প্রতিভা, ধী-শক্তির পরিচয় দিতে হবে। এরপর তিনি নিয়োগপত্র পেয়ে চাকুরীতে যোগ দিতে পারেন। অন্যদিকে কেউ আরবী সাহিত্য বা ভাষায় মহা-পন্ডিত, কুরআন হাদীস এবং ফিকাহ্-এ মহাজ্ঞানী হলেও তার মসজিদের ইমাম বা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা চাকুরী ছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা সরকারী প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকুরী পাওয়া কঠিন। এটা হয়তো মাদ্রাসা শিক্ষিতদের প্রতি উপেক্ষা বা বিদ্বেষপ্রসূত হতে পারে। তবে অন্যান্য কারণও থাকতে পারে।

ইংরেজী শুধু ইংরেজদের ভাষা নয়। এটা এখন আন্তর্জাতিক ভাষা। এ ভাষা না জানলে বিদেশীদের সাথে মত বিনিময়, বিদেশী বই পড়া, বিদেশী ঔষধ ব্যবহার, বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ে অসুবিধা হয়। আমরা প্রতিদিন যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করি, এর খুব কমই আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়। শুধু আমাদের নয় এশিয়ার সবচেয়ে উন্নত দেশ জাপানের নাগরিকদেরকেও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মত বিনিময়ের জন্য বিদেশী ভাষা শিখতে হয়।

আরবদের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ আরবী ভাষায় নয়; ইংরেজী ভাষায়। আমাদের দেশের মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা আন্তর্জাতিক ভাষায় দুর্বল। এ দুর্বলতার কারণে তারা বহির্বিশ্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। পত্রিকা কম পড়েন বলে দেশের খবরও তারা কম রাখেন।

তারা শুধু ইংরেজী ভাষায়ই দুর্বল নন; বাংলা ভাষায়ও অধিকাংশ মাদ্রাসা শিক্ষিত দুর্বল। শুদ্ধ অশুদ্ধ বাংলা মিলিয়ে তারা কথা বলেন। সবকিছু মিলিয়ে তাদেরকে এ যুগের অনুপযুক্ত মনে হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন কঠিন নয়। কিন্তু যাদেরকে নিয়ে সমস্যা তারা যদি এটাকে সমস্যা মনে না করেন তবে অবস্থার উন্নয়ন বা পরিবর্তন কখনো হবে না। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। পথ খুঁজে নিতে হবে এবং মাকসুদ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে হবে।

মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলার দক্ষতা অর্জন মোটেই কঠিন কাজ নয়। নিজের মনোভাব দৃঢ়ভাবে প্রকাশ এবং আলাপ আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় স্তরের ইংরেজী জ্ঞান অর্জন করতে দু'বছরের বেশি লাগার কথা নয় যদি নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে আধুনিক জ্ঞান, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করণের জন্য অরিয়েন্টেশন মাদ্রাসা বা আধুনিকীকরণ মাদ্রাসার প্রয়োজন। এ মাদ্রাসাগুলোর লক্ষ্য হবে মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে ভাব প্রকাশে, চলনে-বলনে,

আচার-আচরণে, ভদ্রতা, শিষ্টাচার পারস্পরিক যোগাযোগ ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের সমস্তরে নিয়ে আসা। এ জন্যে দু'বছরের চেয়ে বেশি লম্বা কোর্সের দরকার হয় না।

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের নিজস্ব মেধা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োগ এবং নিজেদের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্যেও আধুনিকতার সাথে পরিচিতি প্রয়োজন। আধুনিকীকরণ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এ নয় যে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছাপ সুদৃঢ়ভাবে লাগিয়ে দেয়া। বরং উদ্দেশ্য হলো আধুনিক সমাজ-সংস্কৃতিকে জানা, তাদের দুর্বলতা অনুধাবন করা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং ইসলামী নীতি ও সংস্কৃতির প্রতি মুসলিম ও গায়রে মুসলিম সকলকে আকৃষ্ট করা।

এমন এক সময় ছিল যখন অমুসলিমরা দ্বীন (আল ইসলাম) গ্রহণ না করলেও ইসলামী সংস্কৃতি অনেকটুকুই গ্রহণ করতো। বর্তমান অবস্থা এ দাঁড়িয়েছে যে আমরা ঈমান ছেড়ে কাফির হইনি, কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করে মুশরিকে পরিণত হয়েছি। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা গাফুরুর রাহীম। তিনি বান্দার সকল গুনাহ্ মাফ করতে পারেন। তবে দু'টি গুনাহ্ মাফ করবেন না। প্রথমটি হলো শিরকের গুনাহ্, দ্বিতীয়টি হলো বান্দার হক নষ্ট করার গুনাহ্।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পেশা শিক্ষা মাদ্রাসা

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের পেশা

মাদ্রাসায় যে অর্ধকোটিরও বেশি ছাত্র লেখাপড়া করছে তারা শিক্ষা জীবন শেষে বেশির ভাগ ছাত্র মসজিদের ইমামতি ছাড়া কি অন্য কোন পেশা অবলম্বন করে ? পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা শিক্ষার্থীদের প্রধান পেশা হলো বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী। মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা অতি অল্প সংখ্যকই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্বায়ত্ত্ব শাসিত বিভিন্ন দপ্তর, পরিদপ্তর, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য সংস্থায় চাকুরী পেয়ে থাকেন।

যারা ছোটখাট চাকুরী পেয়ে থাকেন তাও মাদ্রাসা লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় বরং ধর্মনিরপেক্ষ অতিরিক্ত বিদ্যা অর্জনের পর। চাকুরী করতে চাইলে তারা চাকুরী পান মাদ্রাসায় শিক্ষক, মসজিদের ইমাম এবং ম্যারিজ রেজিষ্টার পদে।

যারা কিছুটা উচ্চ শিক্ষিত তারা চাকুরী পান প্রাইমারী উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে সহকারী পদে। অল্প সংখ্যক ব্যবসা-বাণিজ্য পেশা বেছে নেয়।

পল্লী অঞ্চলে ইমামের বেতন খুবই কম। এই স্বল্প বেতনের সঙ্গে অতিরিক্ত উপার্জন হিসাবে সংযুক্ত হয় মিলাদ পাঠ, কবর জিয়ারত, ফাতেহা খানি, কুরআন খতম, রোগীর জন্য দু'য়া, সাদকাহ্, জাকাত, ফিতরা, খয়রাত ইত্যাদি।

বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষিতদের একটি দুর্বলতা হলো – তারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের ন্যায় পেশাগত জ্ঞান অর্জন এবং জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রুজি-রোজগারে তেমন অবদান রাখতে পারছেননা। ফলে তাদেরকে পরনির্ভরশীল হয়ে অন্যের দান খয়রাত গ্রহণ করতে হয়। তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্যে মন-মানসিকতাও থাকে দুর্বল। তারা জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নেতৃত্ব দেয়া তো দূরের কথা, অংশগ্রহণও তেমন করতে পারছেন না।

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের দ্বীনি জ্ঞান ভিন্ন পেশাগত জ্ঞান না থাকলে অন্য অবলম্বন করা কষ্টকর। ক্যামেষ্টিতে এম.এস.সি. পাশ করে কেউ ডাক্তার হতে পারেন না। ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারেন না। মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে একজন আলেম কিভাবে ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার পেশা অবলম্বন করবেন ? দুনিয়াদারীর পেশা অবলম্বন করতে হলে পেশাগত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা নটরডেম কলেজে অধ্যাপনা করতে পারেন। কারণ তারা খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্ব জ্ঞান অর্জন করার পর পদার্থ বিদ্যা, জীব বিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে লেখাপড়া করে ডিগ্রী নেন।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে হলে বৃটিশ প্রণীত মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার করতে হবে। নৈতিক শিক্ষার সাথে বৈষয়িক শিক্ষার সংযোগ ঘটাতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে ট্যাকনিক্যাল মাদ্রাসা, ইঞ্জিনিয়ারিং মাদ্রাসা, মেডিকেল মাদ্রাসা, হোমিওপ্যাথিক মাদ্রাসা, ইউনানী-আয়ুর্বেদীক মাদ্রাসা, কৃষি মাদ্রাসা, বৈজ্ঞানিক মাদ্রাসা, কম্পিউটার শিক্ষা মাদ্রাসা, বাণিজ্য শিক্ষা মাদ্রাসা ইত্যাদি।

এ সমস্ত পেশা শিক্ষা মাদ্রাসায় উদ্যোক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আল-উলুমুল আকলিয়া এবং আল-উলুমুন নাকলিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সিলেবাস তৈরী করতে হবে। দৈনিক সময়ের ভিত্তিতে দুই ধরনের জ্ঞানের জন্য অর্ধেক অর্ধেক সময় বিভাজন হতে পারে। আলিয়া মাদ্রাসায় সে ধরনের সমন্বয়ের একটা চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা সফল হচ্ছে না।

এর একটি কারণ যারা শুধুমাত্র পেশাগত শিক্ষাগ্রহণ করে তাদের সঙ্গে আলিয়া মাদ্রাসায় পাশ করা ছাত্ররা প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারে না। যদিও তাত্ত্বিকভাবে ফাজিল স্তরের পর ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ কিছুটা আছে, মাদ্রাসার ছাত্রদের পক্ষে বিবিধ প্রতিকূলতার ফলে ভর্তি হওয়া কষ্টকর।

এ সমস্যার সমাধান হলো– যে যে পেশায় যাবে, তাকে সে পেশায় অন্তত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ন্যায় অথবা তার চেয়ে বেশি দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কিছু মাদ্রাসায় এবতেদীয়া স্তর থেকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, এরা ভবিষ্যতে হোমিওপ্যাথিক ইউনানী-আয়ুর্ব্বেদীক, এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার হবে। যদিও তাদের সার্বিক জ্ঞান হবে কম, কিন্তু পেশাগত জ্ঞান হবে পর্যাপ্ত।

পেশা শিক্ষা কোর্সের মেয়াদ

ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল স্নাতক ডিগ্রী নিতে ৫ বছর লেগে যায়। পলিটেকনিকে ডিগ্রী প্রাপ্তি ৩–৪ বছরেই হয়। সার্টিফিকেট কোর্স ৩–৬ মাসে হয়ে থাকে। পেশাগত বিষয়ে দক্ষ হতে হলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু, ৩–৬ মাসের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের পর অনেক ক্ষেত্রেই apprentice হিসেবে কাজ শুরু করা যায়। কলা ও মানবিক বিভাগে পড়তে গিয়ে যারা ফেল করে বা drop out হয় তাঁদের চাকুরী সুবিধা কম। কিন্তু পেশা শিক্ষা প্রশিক্ষণে drop out-দের অধিকতর চাহিদা রয়েছে।

জীবিকা ও অর্থ উপার্জনের সুবিধার জন্য উৎপাদনশীল শিক্ষাকে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় করা প্রয়োজন। সমাজের অর্থনৈতিক চাহিদা যে শিক্ষা মিটায় সে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদন সম্ভব নয়, সে শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য থাকে না। সে শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছা অনেকের হয় না।

পেশা শিক্ষা শুরু হয় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের পর। এবতেদায়ী (প্রাইমারী) এবং দাখিল (মাধ্যমিক) শিক্ষার পর বর্তমানে আমাদের দেশে পেশাগত শিক্ষার সুযোগ মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য সীমিত। মাদ্রাসার ছাত্রদের পেশা শিক্ষার জন্যে বিবিধ ধরনের পেশা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সিলেবাস ও কারিকুলাম গ্রহণ করা যেতে পারে।

বর্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো প্রতিযোগিতামূলক। কেউ দয়া করে কাউকে কিছু দেয় না। দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত বলে কিছুটা সুযোগ দিতে পারেন। কিন্তু, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে দেবে না। মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের প্রতিযোগিতামূলক পেশা শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হতে হবে।

প্রকৌশল ও মেডিক্যাল মাদ্রাসা

ফাজিল এবং কামিল পাশ মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য প্রকৌশল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্সে বা পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির নীতিগত অনুমোদন আছে। কিন্তু পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের স্তর মাদ্রাসাতে খুব বেশি উঁচু নয়। ফলে আলিম, ফাজিল, কামিল পাশ ছাত্রদের পক্ষে কলেজ থেকে এইচ.এস.সি., বি.এস.সি পাশ ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতা করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ বা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হওয়া কঠিন।

স্কুল কলেজে সরকার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যে মানের যন্ত্রপাতি অনুদান দিয়ে থাকেন, মাদ্রাসাগুলো বিজ্ঞান গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির জন্যে তত বেশি অনুদান পায় না। কারণ, মাদ্রাসাকে বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র ধরা হয় না। মাদ্রাসায় চাকুরীরত শিক্ষকগণও বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় অত্যন্ত অনভিজ্ঞ।

রাজধানী বা জেলা শহরের স্কুল, কলেজের শিক্ষার মান এবং থানা হেড কোয়ার্টার বা পল্লী অঞ্চলের শিক্ষার গুণগত মান সমস্তরের নয়। পল্লী অঞ্চলের স্কুল কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রদের জন্যে বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশদ্বার ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শহরের ছাত্রদের অভিভাবকেরা যে পরিমাণ অর্থ তাদের সন্তানদের প্রাইভেট টিউশনির জন্যে ব্যয় করে থাকেন, পল্লী অঞ্চলের অভিভাবকগণ তা পারেন না।

তার ফলে পল্লী অঞ্চলের স্কুল কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রদের পক্ষেও গন্ডায় গন্ডায় লেটার পেয়ে বুয়েট বা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার চিন্তা করা অলীক স্বপ্ন। এ অবস্থায় মাদ্রাসা হতে পাশ করা ফাজিল, কামিল ডিগ্রীধারীদের পক্ষে প্রকৌশল ও মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার কল্পনা করা অধিকতর স্বপ্নবিলাস। ব্যতিক্রম কিছু কিছু হতে পারে।

মাদ্রাসা হতে পাশ করা ছাত্রদের জন্যে প্রকৌশল, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে আসন সংরক্ষণ করা হলেও ভর্তি হওয়া ছাত্ররা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। ড্রপ-আউটের সম্ভাবনাও থাকবে বেশি।

মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য পৃথক ইঞ্জিনিয়ারিং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের পক্ষে ভর্তি হওয়া সহজ হবে। গুণগত মান সংরক্ষণের জন্য চার বছরের কোর্সের অতিরিক্ত প্রথম দিকে দু'বছরের কোর্স রাখতে হবে। এতে বাংলা, ইংরেজী ও বিজ্ঞানের intensive (নিবিড়) কোর্স সিলেবাসে থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান এবং শিক্ষার্থীদের গুণগত স্তরভেদে এ কোর্স এক বছরেরও হতে পারে। প্রি-ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রকৌশল পূর্ব সিলেবাস নিয়ে অতিরিক্ত দু'বছরের কোর্স প্রবর্তন করা হলে মাদ্রাসা পাশ ছাত্রদের অনেকেই ঢাকা কলেজ, চট্রগ্রাম কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের সমপর্যায়ে এসে যাবে।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে সেশন জটের কারণে ৪(চার) বছর সময় নষ্ট হয়, সে প্রেক্ষাপটে এক-দু'বছরের অতিরিক্ত কোর্সের জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় অপচয় হিসেবে গণ্য হবে না।

মেডিক্যাল মাদ্রাসা

দেশে এবং বিদেশে চিকিৎসক ডাক্তারের অভাব রয়েছে প্রচুর। যদিও মেডিকেল শিক্ষার গুণগত মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে আমাদের এমবিবিএস ডাক্তারদের মেডিক্যাল পেশাগত সুযোগ নেই। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে, মুসলিম দেশসমূহ ও আফ্রিকায় বাংলাদেশী ডাক্তার, ফার্মাসিস্টদের বেশ চাহিদা এবং কদর আছে। এ চাহিদা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে।

মাদ্রাসা ছাত্ররা এমবিবিএস ডাক্তার হতে পারলে আরব দেশসমূহে তাদের চাহিদা অন্যদের থেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ, তাদের আরবী জ্ঞান অপেক্ষাকৃত বেশি। রোগীদের কথা তারা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবে। তরজমাকারীর অভাব কম হবে।

১৯৭২-৭৭ সনে কামিল ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রদের সংখ্যা বার্ষিক ৯৫১ হতে ২,০৭২ এ পৌঁছেছিল। তখন প্রায় ৩,০০০-এর বেশি ছাত্র প্রতি বছর ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতো। ২০০০ সনে কামিল এবং ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হবে।

বিদেশের চাহিদার কথা বাদ দিলেও দেশে ডাক্তারের রয়েছে বিরাট অভাব। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখনো এমবিবিএসদের গ্রামে গিয়ে প্রাকটিশ করতে বাধ্য করানো হয় না। থানা মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তারদের কতজন পরিবার নিয়ে থানা হেড কোয়ার্টারে বা কাছাকাছি থাকেন ? অদূরদর্শী শিক্ষা নীতির কারণে মেট্রিক পরীক্ষার পর ৪ বছরের যে এল.এম.এফ কোর্স ছিল তা বিলুপ্ত করে দেয়ায় দেশের কল্যাণ হয়নি।

মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে প্রাক-মেডিক্যাল মাদ্রাসায় এমবিবিএস কোর্স গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তাদের জন্য স্পেশাল দু'বছরের প্রি-মেডিক্যাল কোর্সে কেমেষ্ট্রি, বায়োলজি, জিওলজি, ইংরেজী, বাংলা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে গুণগত মান উন্নত করিয়ে নিতে হবে। এরপর তারা পাশ্চাত্য পদ্ধতির কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতদের সমপর্যায়ে আসবে।

মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্যে পৃথক মেডিক্যাল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিলে সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন হবে না। বেসরকারীভাবেও মেডিক্যাল মাদ্রাসা, মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি। মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করলে শুধু যে তাদের উপকার হবে তা নয়, দেশেরও কল্যাণ হবে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের জনগণের।

মাদ্রাসার সিলেবাস, সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশের কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশ হয় না। অধুনালুপ্ত নিউ স্কীম বা হাই মাদ্রাসার পাশ করা ছাত্রদের শিক্ষার গুণগত মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্রদের চেয়ে খুব নীচ স্তরে ছিলো না। এরা কোনো দিক দিয়ে তাদের সহকর্মীদের থেকে নিম্ন মানের ছিলেন না। মাদ্রাসায় প্রতিভাবান মেধাবী ছাত্রও ভর্তি হয়।

হাই মাদ্রাসার কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের নাম উল্লেখ করলেই অভিমতটির যথার্থতা প্রতীয়মান হবে।

হাই মাদ্রাসা বা নিউ স্কীম মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন – (১) ডঃ সাজ্জাদ হোসেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি), (২) ডঃ এম. এ. করিম, (ইতিহাস); চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, (৩) ডঃ এম. এ. বারী (আরবী), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, চেয়ারম্যান ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন, (৪) প্রফেসর আবুল ফজল (বাংলা), ভিসি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) বিচারপতি আবদুল জব্বার খান, (স্পীকার, পাকিস্তান জাতীয় সংসদ), (৬) বিচারপতি নূরুল ইসলাম, উপ-রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ, (৭) ডঃ মফিজুল্লাহ কবির (ইতিহাস), প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (৮) ডঃ সিরাজুল হক (ইসলামিক ষ্টাডিজ), প্রফেসর ইমেরিটাস্, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (৯) ডঃ এম. এ. সাত্তার (লোক প্রশাসন), সিএসপি এবং প্রাক্তন সচিব, (১০) ডঃ আয়ুব আলী, অধ্যক্ষ, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা, (১১) ডঃ আবদুর রহীম (ইতিহাস), অধ্যাপক, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, (১২) ডঃ হাবিবুল্লাহ্ (ইসলামের ইতিহাস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (১৩) ডঃ জিয়াউদ্দিন, পরিচালক, ইন্ষ্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ, করাচী, (১৪) ডঃ মইনুদ্দীন আহমাদ খান (ইসলামের ইতিহাস), প্রফেসর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, (১৫) ডঃ কাজী দীন মুহাম্মাদ (বাংলা), মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, (১৬) ডঃ এম. এ. আজীজ (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (১৭) ডঃ মোহর আলী (ইতিহাস) প্রফেসর, কিং আব্দুল আজিজ, ইউনিভার্সিটি, জেদ্দা, (১৮) অধ্যাপক আব্দুল হাই (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯) আব্দুল হক ফরিদী, ডিপিআই, সদস্য, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন, (২০) ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান (আরবী), প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (২১) প্রফেসর এ.টি.এম. মুসলেহউদ্দীন (আরবী), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (২২) ডঃ হারুনুর রশীদ (দর্শন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (২৩) ডঃ আব্দুস্ সাত্তার (ইসলামিক স্ট্যাটিজ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (২৪) ডঃ আলী আহম্মদ রুশদী (অর্থনীতি), (২৫) আবুল খায়ের মুসলেউদ্দীন, পুলিশ কর্মকর্তা, কথাশিল্পী, (২৬) মাওলানা আহম্মাদ হোসাইন, পরিচালক, ইসলামীক ফাউন্ডেশন, (২৭) অধ্যাপক আব্দুল গফুর, সমাজতত্ত্ববিধ সাংবাদিক, (২৮) ডঃ বাকী বিল্লাহ্ খান (আরবী), চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, (২৯) প্রকৌশলী নূরুল্লাহ্, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, (৩০) অধ্যক্ষ শেখ সরফুদ্দীন (আব্দুল্লাহ্-আল-মুতীর পিতা), (৩১) আবু বাকার, ডাইরেক্টর, নারকটিক্স্, (৩২) এনামূল হক, মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, (৩৩) ইব্রাহীম আকন্দ, পরিচালক, রেডিও, (৩৪) আব্দুর রশীদ, সচিব, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, (৩৫) এম. এম. শরীফ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, (৩৬) আব্দুস সোবাহান, চেয়ারম্যান, টেক্সটবুক বোর্ড, (৩৭) আবু সাইদ, চেয়ারম্যান, টেক্সটবুক বোর্ড, (পিতা খান বাহাদুর আবু নসর ওয়াহিদ), (৩৮) আবুল কাসেম, বিসিএস, (৩৯) আনোয়ার হোসেন, বিসিএস, (৪০) এডভোকেট এ. টি. সাদী, (৪১) ডঃ মুজিবর রহমান খান, মৎস্য বিজ্ঞান, এফ এ ও, উপদেষ্টা, জিয়াউর রহমান মন্ত্রীসভা, (৪২) মাসুদুল হক, এ্যাডিশনাল, আইজিপি, (৪৩) প্রফেসর গোলাম আযম, আরো অনেকে।

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, খান বাহাদুর আবু নসর ওয়াহীদ, খান বাহাদুর মুসা প্রমূখের চেষ্টায় নিউ স্কীম হাই মাদ্রাসা প্রবর্তিত হয়। শুনা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটির এককালীন ভাইস চ্যান্সেলর সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসাইন ও মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রমুখের পরামর্শে তা অকার্যকর হয়। আসাম ও পশ্চিম বাংলায় এখনো নিউ স্কীমের হাই মাদ্রাসা সিষ্টেম চালু আছে।

কৃষি মাদ্রাসা

বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ। খাদ্য শস্য উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বনির্ভর নই। চাল আমদানী প্রায় বছরই করতে হয়। পলি মাটির কারণে আমাদের মাটি কৃষি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। বাংলাদেশের শতকরা ৬০%– ৭০% লোক কৃষিকাজ করেও তাদের নিজেদের এবং শহরের চাকুরীজীবীদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না। ফকিরের মতো বিদেশীদের কাছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য বা রিলিফ হিসেবে খাদ্য ভিক্ষা করতে হয়। যত প্রকার ভিক্ষাবৃত্তি আছে, তার মধ্যে প্রাথমিক বা সর্বনিম্ন স্তরের ভিক্ষাবৃত্তি হলো খাদ্য ভিক্ষা করা।

যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৬ জন কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদক এবং কৃষি শ্রমিক। তারা নিজেদের ও দেশের অবশিষ্ট ৯৪% ভাগ লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করেন। শুধু নিজের দেশের জন্য নয়, আমাদের মতো গরীব, হাভাতে লোকদের জন্যও খাদ্য উৎপাদন করেন।

আমাদের জাতীয় খাদ্যের মান আমেরিকান পশু পাখীদের সমপর্যায়ের। আমরা ভাত বেশি খাওয়ার জন্য ডাল, তরকারী, মাছ, গোস্ত খাই। পাশ্চাত্যের মানুষ মাছ, গোস্ত, শাক সব্জীকে সু-স্বাদু করার জন্য কিছু ভাত, রুটি বা পটেটো খায়। আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, রুটি। আমেরিকানদের প্রধান খাদ্য মাছ, গোস্ত, তরকারী।

আমরা চাউল, গম নিজেরা খাই। উন্নত দেশের লোকেরা চাউল, গম তাদের পশু-পাখি তথা গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদিকে খাওয়ায়। ঐ মুরগী, ডিম, গরু ছাগলের গোস্ত, দুধ তারা খায়। অধ্যক্ষ যা ইউরোপীয় আমেরিকানদের হাঁস, মুরগী, পশু-পাখি ও গরু-ছাগলের খাদ্য, তা আমাদের প্রধান খাদ্য।

এক টুকরা মুরগীর গোস্ত এবং একটু ডাল দিয়ে আমরা আধ পোয়া, এক পোয়া চাউলের ভাত খাই। পাশ্চাত্যের মানুষ অর্ধেকটা মুরগী সিদ্ধ প্লেটে নিয়ে খেতে বসে। এটুকু খাবার জন্যে তারা আলু, চীপ, একটি দু'টি বন রুটি অথবা এক দু'চিলতা পাউরুটি খায়। উদ্ভিদজাত দ্রব্য নয় বরং প্রাণীজাত দ্রব্য যেমন ডিম, হাঁস, মুরগী, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির গোস্তই হলো তাদের প্রধান খাদ্য।

আমরা আমাদের জমিতে প্রতি একরে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করি কোরিয়ান এবং জাপানীরা তার তিনগুণ থেকে সাতগুণ বেশি উৎপাদন করে। জাপানের জমি গুণগত মানে অতি নিকৃষ্ট ছিল। বালি কংকরময়। ক্যামিকেল ফার্টিলাইজার দিতে দিতে তাদের জমির গুণগত মান আমাদের স্তরে আনার চেষ্টা চলছে।

কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমরা স্থাপন করেছি কৃষি কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষি বিদ্যালয় বা কৃষক ট্রেনিং স্কুল স্থাপনে আমাদের আগ্রহ তেমন নেই। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতম ডিগ্রীপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞরা সরকারী কৃষি খামারে যে পরিমাণ কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করে তা দেখে কৃষকেরা হাসাহাসি করে।

আমাদের দেশে উচ্চ স্তরের বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন যে মাঠে জমি চাষ করবে, কীট-নাশক ঔষধ ছড়াবে, সার দেবে – তার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ। কোটি কোটি কৃষকের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারাও প্রদান করা সম্ভব। কিন্তু সে আর্থিক সামর্থ আমাদের নেই। মসজিদের ইমামদেরকে কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষক শিক্ষকে পরিণত করা হলে কৃষকদের দক্ষতার মান বৃদ্ধি করা সহজতর হতে পারে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজ থেকে পাশ করা বিশেষজ্ঞগণ নিযুক্ত আছেন কৃষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে। বিশেষজ্ঞ এবং কৃষকদের মধ্যে কৃষি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিরাট পার্থক্য। বিশেষজ্ঞরা জীবাণুনাশক ঔষধ ও রাসায়নিক সার সম্পর্কে কৃষকদের থেকে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। কিন্তু হালের গরু, জমি, শস্যের অবস্থা, সার মিশ্রণ, শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষজ্ঞদের চেয়ে কৃষকেরা অভিজ্ঞ।

শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের সন্তানেরা এস.এস.সি., এইচ,এস,সি-তে ভালো রিজাল্টের কারণে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করে কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু কৃষির বাস্তব জ্ঞান সম্পর্কে তাদের প্রচন্ড অভাব। বিশেষজ্ঞদের প্রদর্শনী খামারে উৎপাদন হয় কম। অশিক্ষিত কৃষকেরা বিশেষজ্ঞদের প্রদর্শনী খামার থেকে অনেক বেশি উৎপাদন করে আনন্দ চিত্তে শস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

আমাদের দেশে গরীব পরিবারের সন্তানেরা সাধারণত মাদ্রাসায় যায়। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা দরিদ্র পিতা-মাতাকে জমি চাষে, আগাছা নিরাণিতে, শস্য পরিচর্যায়, গোবর, ছাই, ইত্যাদি কৃষি জমিতে ছড়ানো, শস্য কর্তনে, মাথায় করে কাটা ধান, সারের বোঝা বহনে সাহায্য করে। এ সমস্ত প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে তারা কৃষি কাজের অনেক কিছু শিখে যায়।

পল্লী অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে কৃষকের ছেলেরাই প্রকৌশল বা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুবিধা না পেলেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি কলেজ ও কৃষি বিদ্যালয়ে ভর্তির অধিকতর হকদার। মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে কৃষি স্কুল, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং জ্ঞান লাভের সুযোগ দেয়া হলে বর্তমানে কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং কৃষকদের মধ্যে যে পারস্পরিক আস্থাহীনতার সুদীর্ঘ শূন্যতা বিরাজ করছে, তা হয়তো পূরন হতে পারে।

যদি ফাজিল, কামিল এবং দাওয়াহ্ পাশ মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে কৃষি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং গতিশীলতা লাভ করবে। মাদ্রাসা শিক্ষিত ছাত্রদের জন্য পৃথক কৃষি মাদ্রাসা, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা মাদ্রাসা স্থাপন সময়ের দাবী। পল্লী উন্নয়ন মাদ্রাসা স্থাপন করে মাদ্রাসায় পাশ করা আলিমদেরকে পল্লী উন্নয়নের সমস্যা সমাধানের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে বহুমূখী সম্প্রসারণ কর্মীতে উন্নীত করা যায়।

হোমিওপ্যাথি, হেকিমী, কবিরাজী মাদ্রাসা

হোমিওপ্যাথিক মাদ্রাসা

শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এখানেও মাদ্রাসা ছাত্রদের সমস্যা হলো ভর্তি সমস্যা। কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা তো সরকারীভাবে স্বীকৃত বা অনুদানপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা সরকারী অফিসে চাকুরী পান না। মাদ্রাসা শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক হোমিওপ্যাথিক মাদ্রাসা স্থাপন করা যেতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ভিন্ন ধর্মীয় বুদ্ধিজীবী ও মহাকবিরা বিরোধিতা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এটাকে "মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়" বলে ব্যঙ্গ করা হতো। শেষ পর্যন্ত সরকারী অর্থানুকূল্যে বিশ্ববিদ্যালয় যখন চালু হয়েই যায় তখন ভর্তির সুযোগ মুসলিম ছেলেদের জন্য সংকুচিত করা হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বিবেচনা করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' না বলে বরং 'গয়া-কাশী বিশ্ববিদ্যালয়' বললেই অধিকতর সঙ্গত হতো।

মুসলিম ছেলেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হলো – এর অর্থ এ নয় যে তারা সবই ছিলো মেধাহীন। এর জন্য মূলতঃ দায়ী ছিলো তৎকালীন পরিবেশ, পরিস্থিতি, ধর্মবিদ্বেষ ও সংকীর্নতা।

নওয়াব সলিমুল্লাহ বা শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক আই.সি.এস. হওয়া দূরের কথা – প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে বি.সি.এস. হন নি। নমিনেশনে বি.সি.এস. হয়েছিলেন। জেনারেল আতাউল গনি উসমানী রেগুলার লং কোর্স করে সেনাবাহিনী কমিশনে যোগ দিতে পারেন নি। তিনি পেয়েছিলেন টেম্পোরারী সর্ট কোর্স কমিশনে নিয়োগের সুযোগ। তাও পদাতিক বাহিনীতে নয়, সাপ্লাই কোরে, যাদের কাজ যুদ্ধ ছিল না। টেম্পোরারী কমিশন প্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ হতো দেরাদুনে নয়, বাঙ্গালোরে। মেয়াদ ছিল মাত্র ছ'মাসের। পরবর্তীতে খুব সম্ভব ভারত বিভাগের পর আতাউল গনী উসমানী ইনফেন্ট্রিতে বদলীর দরখাস্ত দিয়ে পদাতিক বাহিনীতে প্রবেশ করেন এবং ১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টে নিযুক্ত হন।

নওয়াব সলিমুল্লাহ বাহাদুরও প্রথম জীবনে জুনিয়র কমিশন অফিসার হিসেবে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। পদবী ছিল জমাদার। অথচ মোহাম্মদ আয়ুব খান (ফিল্ড মার্শাল) রেগুলার কমিশনে যোগ দিয়ে স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারী কলেজে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন। এরূপ ছিল ভারত বিভাগ পূর্বকালে বাঙ্গালী মুসলিমদের হালত

ইজ্জত। ঢাকার নবাবজাদা জমাদার হয়েছেন দেখে বোধ হয় লজ্জিত হয়ে বৃটিশ সরকার তাকে বিসিএস চাকুরীতে নমিনেশনে নিযুক্ত করেন। বৃটিশ আমলে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের যা অবস্থা ছিল – পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের অবস্থা তা থেকে ভালো নয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ এমনকি হোমিওপ্যাথিক কলেজেও ভর্তির সুযোগ পায়না। এর অর্থ এ নয় যে তারা অপদার্থ, ভর্তির অযোগ্য। বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাদেরকে দাবিয়ে রেখেছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টিস্ সেক্টরের উৎপাদিত দ্রব্য ইউরোপ আমেরিকায় যেরূপ বিশেষ সুবিধা ও কোটার উপর নির্ভরশীল ঠিক সে ভাবে মাদ্রাসা ছাত্রদেরও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং কোটা দেয়া হলে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে।

পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের সি.এস.এস. চাকুরীতে পূর্ব-পাকিস্তানীদের জন্যে ৪০% ভাগ কোটা নির্ধারিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্যে নির্ধারিত ছিল ৪০% ভাগ ও বাকী ২০% ভাগ অফিসার নিয়োগ করা হতো মেরিট ভিত্তিতে। বিশেষ সুবিধা এবং কোটা অহেতুক সমালোচনার কারণ হতে পারে। তাই মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জন্য পৃথক হোমিওপ্যাথিক মাদ্রাসা স্থাপিত হতে পারে। যেখানে তাদেরকে হোমিওপ্যাথিক কোর্সের পূর্বে প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত বাংলা এবং ইংরেজী কোর্স শিক্ষা দেয়া যেতে পারে – যার মেয়াদ এক বা দু'বছর হতে পারে।

ঢাকা, চট্টগ্রামের মত বড় শহরে হোমিওপ্যাথিক মাদ্রাসার সুযোগ রয়েছে। পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসকের প্রয়োজন এতো বেশি যে ৮৫,০০০ গ্রামের মেডিক্যাল ডাক্তার দূরের কথা, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেও মনে হয় ১০০ বছর লেগে যাবে। বছরে ১০০০ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তৈরী হলেও মনে হয় না আমাদের চাহিদা পূরণ হবে।

মসজিদের ইমাম, মাওলানা, মৌলভী সাহেবগণ রোগ শোকে পানি পড়া, তাবিজ দিয়ে থাকেন। হুজুরদের পড়া পানি এবং দু'য়া অধিকতর কার্যকর হবে যদি দু'য়ার সাথে কিছু হোমিওপ্যাথিক দানা, এলোপ্যাথিক ট্যাবলেট বা প্যাটেন্ট ঔষুধ সংযুক্ত হয়।

ইসলামে দু'য়ার সাথে দাওয়া (চিকিৎসা), তাওয়াক্কুলের সাথে তদবীরের কথাও বলা হয়েছে। হোমিওপ্যাথিক মাদ্রাসায় শিক্ষা কওমী মাদ্রাসার ন্যায় অবৈতনিক এবং ফ্রি করা হলে ছাত্র পাওয়া খুবই সহজ হবে। আখিরাতে পূণ্যের আশায় জনগণের অর্থে কওমী মাদ্রাসা পরিচালিত হয়। দুনিয়াবী কল্যাণের স্বার্থে প্রয়োজন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা।

ইউনানী, আয়ুর্বেদী মাদ্রাসা

গ্রীক দেশের আরবী নাম ইউনান। প্রাচীন গ্রীস দেশ চিকিৎসা বিদ্যায় অত্যন্ত উন্নত ছিল। গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আরবীতে বলা হয় ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান। ডাক্তারকে বলা হতো হেকিম। সে সূত্রে ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপর নাম হয় হেকিমী চিকিৎসা বিদ্যা।

ইবনে সিনা ও অন্যান্য আরব চিকিৎসকগণ ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অনেক উন্নত করেছেন। আরবদের উন্নয়নকৃত ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান ভারতে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে। হাকিম আজমল খাঁন ছিলেন ভারতের এক সময় সর্বশ্রেষ্ঠ ইউনানী চিকিৎসক। উপমহাদেশে হামদর্দ দাওয়াখানা ইউনানী, তিব্বিয়া, হেকিমী ঔষধপদ্ধতির উপর গবেষণা করে এর ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটায়।

ভারতের প্রাচীন কবিরাজি চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নয়ন করেছিলেন "চারকঃ এবং আর্য চিকিৎসকগণ। এটা এখনো উপমহাদেশে আয়ুর্বেদী কবিরাজি চিকিৎসা পদ্ধতি নামে চালু আছে। কবিরাজি ঔষধ উপকরণগুলো সিদ্ধ করে, পঁচিয়ে নির্যাস বের করে তৈরী করা হয়। স্বাদে অনেকটা তিক্ত। ইউনানী, হেকিমী ঔষধ স্বাদে মিষ্টি। শিশুদের খাওয়াতে সুবিধা হয়। বিভিন্ন ধরনের হালুয়া, নির্যাস নিয়ে হেকিমী ঔষধ তৈরী করা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জন্য দেশে বহু সংখ্যক ইউনানী, হেকিমী, তিব্বিয়া, আইয়ুর্বেদী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

কারিগরি (ভোক্যাশনাল) মাদ্রাসা

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণ প্রকৌশল, মেডিক্যাল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করে অন্যান্য পেশার শিক্ষিতদের ন্যায় জাতি গঠনে মূল্যবান অবদান রাখবেন – এ আশা আমরা করবো। এ জন্যে সুচিন্তিত গঠনমূলক পরিকল্পনা এবং বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিগত তিন শতাব্দী পর্যন্ত তা নানা কারণে সম্ভব হয়নি।

যে পর্যন্ত তত বড়ো আশা বাস্তবায়িত না হয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষিতদের যারা বর্তমানে কায়ক্লেশে জীবন-যাপন করছেন এবং কোনো অফিসে ব্যাংকে পিয়ন/এম,এল,এস,এস এর চাকুরী পেলেও যারা কৃতার্থ হন, তাদের জন্যে ক্ষুদ্র পেশা অবলম্বনের সুযোগ করে দেয়ার চেষ্টা অন্ততঃ আমাদের করা উচিত।

ক্ষুদ্র পেশার একটি তালিকা এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত হলো। এর কিছু কিছু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিম্ন পর্যায়ের মাদ্রাসায় পরীক্ষামূলকভাবে এবং চাহিদা মাফিক প্রবর্তন করা যেতে পারে।

অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প অনেক ক্ষেত্রেই ভারসাম্যহীন এবং অসামঞ্জস্য। খুব দামী, জটিল এবং সফিষ্টিকেটেড যন্ত্রপাতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে আমদানী করা হয়। রপ্তানিকারক বিক্রেতা এ যন্ত্রপাতিগুলো টার্ন-কী নীতিমালায় কারখানায় স্থাপন করে এবং স্থানীয় জনগণকে এগুলো পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিয়ে যান। টার্ন-কী এজন্যে বলা হয় যে, চাবি ঘুরালেই কারখানা চলা শুরু করে অন্য কিছু করতে হয় না। যেমন খাদ্য মুখে তুলে দিলে খাদ্য উৎপাদন, রান্না করা বা হাত ধোয়ার কষ্ট করেও খেতে হয় না। বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ যতদিন থাকেন মেশিনগুলো ঠিকভাবেই থাকে। কিন্তু নব শিক্ষিত কারিগরদের হাতে পড়ে এ যন্ত্রগুলোর এখানে ত্রুটি, ওখানে সমস্যা দেখা দেয়। অতি সামান্য ত্রুটিও অনেক ক্ষেত্রে তারা যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান দিয়ে সংশোধন করতে পারেন না। বিদেশী সরবরাহকারী থেকে নিজস্ব কারিগর ডেকে পাঠাতে হয়।

আমাদের দেশে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে যন্ত্রপাতি মেরামত ও প্রতিস্থাপনের জ্ঞান বৃদ্ধির সুপরিকল্পিত এবং পর্যাপ্ত পরিকল্পনা নেই। উচ্চ স্তরের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়। বৃত্তি নিয়ে বড় বড় প্রকৌশলীরা বিদেশ থেকে ডিগ্রী অর্জন করে আসেন। নিম্নস্তরের টেকনিশিয়ান ও কারিগরদেরকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্যে প্রেরণ ব্যয় সাধ্য। নিম্ন পর্যায়ের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় না। পাওয়া যাওয়ার কথাও নয়। আমদানীকৃত যন্ত্রপাতিগুলো যত তাড়াতাড়ি নষ্ট, অকেজো এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠে, ততই সরবরাহকারী বিক্রেতাদের জন্যে ভালো।

বড় প্রকৌশলী দিয়ে মেকানিক বা ছোট কারিগরের কাজ হয়না। কৃষি বিষয়ে যারা পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন তাদেরকে সাধারণ কৃষকের দায়িত্ব পালন করতে দিলে ব্যর্থ

হবেন। অশ্ব বিশেষজ্ঞ ভাল ঘোরসওয়ার নাও হতে পারেন। কার উৎপাদনকারী ফার্মের ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার হাইওয়েতে গাড়ী চালাতে গেলে এক্সিডেন্টের সম্ভাবনাই বেশি। প্রধান প্রকৌশলীকে দিয়ে ড্রাইভারের কাজ চলে না। জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থেই আমাদের নিম্ন স্তরের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। দেশে শত শত কারিগরি মাদ্রাসা স্থাপন করা হলেও কারিগর, মেকানিক, টেকনিশিয়ানের অভাব পূরণ হবে না। জাতীয় অর্থনীতির এ অভাব পূরণে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণ মূল্যবান অবদান রাখতে পারেন।

বৃত্তি শিক্ষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র –

১। **কম্পিউটার**
  (ক) কম্পিউটার অপারেটর
  (খ) কম্পিউটার হার্ডওয়ার টেকনিশিয়ান

২। **মেডিকেল**
  (ক) মেডিকেল ইকুইপমেন্ট অপারেটর
  (খ) এক্সরে প্লান্ট মেকানিক

৩। **ইলেকট্রনিক্স**
  (ক) টেলিফোন-ইন্টারকম মেকানিক
  (খ) টেলিফোন লাইন টেকনিশিয়ান
  (গ) পিএবিএক্স অপারেটর ও মেকানিক
  (ঘ) ইন্টারকম অপারেটর এবং মেকানিক

৪। **ইলেকট্রিক্যাল**
  (ক) ইলেকট্রিশিয়ান
  (খ) লাইন টেকনিশিয়ান
  (গ) ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং
  (ঘ) রেফ্রিজারেটর মেকানিক
  (ঙ) এয়ারকুলার মেকানিক
  (চ) মটর রিওয়াইন্ডিং মেকানিক
  (ছ) হাউজহোল্ড ইকুইপমেন্ট মেকানিক (চার্জার, ইস্ত্রি, ওভেন, ব্লাইন্ডার, টোষ্টার)
  (জ) মটর (বৈদ্যুতিক) ওয়াইনডিং মেকানিক
  (ঝ) অ্যাডপটার/ছোট ট্রান্সফর্মার মেকানিক

৫। **টাইপ**
  (ক) টাইপ-রাইটার রিপেয়ারিং মেকানিক
  (খ) ষ্টেনো-গ্রাফার
  (গ) ষ্টেনো-টাইপিষ্ট
  (ঘ) ইলেকট্রিক টাইপ-রাইটার মেকানিক

৬। **মেকানিক্যাল**
  (ক) ড্রিলার

(খ) লেদম্যান

(গ) ভাইস ফিটার

(ঘ) গ্রাইন্ডার অপারেটর

(ঙ) গিয়ারকাটার

(চ) ফাউন্ড্রি টেকনিশিয়ান/ফাউন্ড্রিশপ মেকানিক

৭। মেশিন

(ক) মেশিন টুল্‌স মেকানিক

(খ) মেশিনশপ মেকানিক

(গ) শেফার মেশিন মেকানিক

(ঘ) কনক্রিট প্লান্ট অপারেটর/মেকানিক

৮। পাওয়ার

(ক) পাওয়ার প্লান্ট টেকনিশিয়ান

(খ) গ্রিড সিস্টেম অপারেটর

(গ) পাওয়ার সাপ্লাই অপারেটর

(ঘ) জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার টেকনিশিয়ান

(ঙ) মিটার রিপেয়ারার ও টেস্টার

৯। ওয়েল্ডিং

(ক) ওয়েল্ডার (স্টীল/মাইল্ড ষ্টীল/কপার/ব্রাস/ব্রোঞ্জ)

(খ) ইলেকট্রিক ওয়েল্ডার

(গ) গ্যাস ওয়েল্ডার

১০। পাম্প

(ক) পাম্প অপারেটর

(খ) ডিজেল পাম্প অপারেটর

(গ) ইলেকট্রিক পাম্প অপারেটর

১১। কাঠ শিল্প

(ক) কার্পেন্টার

(খ) উড ক্রাফ্‌টস্‌ম্যান

(গ) পলিশিং মিস্ত্রী

(ঘ) পেইন্টার

(ঙ) ফার্ণিচার সেটার

(চ) রুম ডিজাইনার

১২। ডিজাইনার

(ক) মেকানিক্যাল ডিজাইনার

(খ) গ্রাফিক ডিজাইনার

(গ) সার্ভেয়ার

(ঘ) রুম ডিজাইনার

(ঙ) কার্টুনিস্ট

(চ) আর্টিস্ট
(ছ) ডেকোরেটর
(জ) ক্যাটারার
(ঝ) এলুমিনিয়াম ফেব্রিক্যাটর

১৩। ড্রাফটিং
(ক) কনস্ট্রাক্শন ড্রাফ্টম্যান
(খ) মেকানিক্যাল ড্রাফ্টম্যান
(গ) ইলেকট্রিক্যাল ড্রাফ্টম্যান

১৪। গার্মেন্টস
(ক) গার্মেন্টস ওয়ার্কার
(খ) টেইলর (দর্জির কাজ)
(গ) এমব্রয়ডারী

১৫। ড্রাইভিং
(ক) ড্রাইভিং (লাইট ভেহিক্ল্)
(খ) ড্রাইভিং (হেভি ভেহিক্ল্)
(গ) ডেন্টিং মেকানিক
(ঘ) পেইন্টিং মেকানিক

১৬। অটোমোবাইল
(ক) ট্রান্সপোর্ট (হালকাযান ও ভারীযান) মেকানিক
(খ) অটোমোবাইল টেকনিশিয়ান
(গ) ইঞ্জিন (ডিজেল মেকানিক)
(ঘ) ব্যাটারী মেকানিক
(ঙ) অটো ইলেকট্রিশিয়ান
(চ) অটোগিয়ার ইঞ্জিন মেকানিক
(ছ) ইঞ্জিন (পেট্রোল) মেকানিক
(জ) ডেন্টিং মেকানিক
(ঝ) পেইন্টিং মেকানিক

১৭। সিভিল
(ক) ম্যাসন/রাজমিস্ত্রী/রড মিস্ত্রী/মোজাইক টাইল মিস্ত্রী
(খ) কনক্রিট প্লান্ট অপারেটর
(গ) প্লাম্বার
(ঘ) সার্ভেয়ার
(ঙ) ম্যাটরিয়েল টেষ্টার

১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালনা
(ক) প্রাথমিক চিকিৎসা
(খ) ধাত্রীবিদ্যা
(গ) মৎস্য চাষ

- (ঘ) পশুপালন
- (ঙ) পশু ডাক্তার
- (চ) বৃক্ষরোপণ
- (ছ) সি. এন্ড. এফ. এজেন্ট
- (জ) মেটালার্জিস্ট
- (ঝ) ফার্মাসিস্ট
- (ঞ) জুতা তৈরীর মিস্ত্রী
- (ট) সেলুন ব্যবসা
- (ঠ) লন্ড্রি ব্যবসা

১৯। সাধারণ ফিটার
- (ক) ব্লাকস্মিথ
- (খ) গোল্ডস্মিথ
- (গ) ফিটার
- (ঘ) ভলকানাইজিং
- (ঙ) আসফ্যাল্ট প্লান্ট অপারেটর/মেকানিক
- (চ) মাড টেকনিসিয়ান

২০। মেকানিক
- (ক) লিফ্‌ট মেকানিক
- (খ) কেমিক্যাল প্লান্ট মেকানিক
- (গ) কেমিক্যাল প্লান্ট অপারেটর
- (ঘ) রিসট ওয়াচ মেকার/রিপেয়ারার
- (ঙ) প্যাড লক/ লক রিপেয়ারার

২১। অডিও-ভিডিও
- (ক) ভিডিও ক্যামেরাম্যান
- (খ) স্টুডিও টেকনিশিয়ান
- (গ) অডিওভিজুয়্যাল টেকনিশিয়ান
- (ঘ) ফটোগ্রাফার
- (ঙ) ফটোকপি মেশিন চালক/মেকানিক
- (চ) টাইপরাইটার মেকার/রিপেয়ারিং

২২। রেডিও-টিভি
- (ক) সাদা কালো টিভি মেকানিক
- (খ) রঙিন টিভি মেকানিক
- (গ) রেডিও মেকানিক

২৩। প্রেস
- (ক) বুক বাইন্ডার
- (খ) প্রেস মেকানিক,
- (গ) প্রসেসিং অপারেটর
- (ঘ) প্রেস মেশিন অপারেটর।

২৬ # মাদ্রাসা শিক্ষা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ একটি প্রয়োজনীয়তা

মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের চিন্তাভাবনা বিগত ১০০ বছর ধরেই চলছে। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকেও প্রয়োজনীয় সবকিছু করার আশ্বাস দেয়া হয়। বিশেষ করে নির্বাচনের পূর্বে। শিক্ষা সংস্কারের জন্যে কমিশনের পর কমিশন গঠিত হয়। রিপোর্ট মুদ্রিত হয়। কিন্তু, বাস্তবে ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের সুপারিশ বা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে কোনো স্থায়ী সাংগঠনিক বা ইনস্টিটিউশন সেট-আপ নেই। স্বল্পকালীন কমিটি, কমিশন করে সুপারিশ আদায় করা যায়। কিন্তু সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্যে কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ না থাকলে সুপারিশ সুপারিশই থেকে যায়।

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জন্যে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং মাদ্রাসা, মেডিক্যাল মাদ্রাসা, কারিগরি মাদ্রাসা, পেশামুখী মাদ্রাসা স্থাপন করা হয় – এগুলো তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন হবে। ইসলামী সংস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়া হলে তা আর ইসলামী সংস্থা থাকবে না। কোনো দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে বিপরীতমুখীদের হাতে তুলে দিলে তা ইসলামের নামে ভন্ডামীতে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক।

মসজিদের ইমামের নেতৃত্বে নামাজ হয়। পূজার কাজ মসজিদে হয় না। পুরোহিত মন্দিরে পূজার আনজাম দেন। কিন্তু পুরোহিত নামাজের ইমামতি করতে পারেন না। আমাদের বিপরীতমুখী সমস্যার সমাধান ভিন্নমুখী নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্পাদন হয় না।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের গভীর অনুভূতি বিরাজমান। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার ও আধুনিকীকরণের স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়িত হবে না যদি কোনো মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সঠিক ও সুচিন্তিত এবং পর্যাপ্ত অর্থপ্রাপ্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেয়া না হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব এমন লোকের হাতে দিতে হবে যারা ইসলামী আদর্শে দৃঢ় প্রত্যয়শীল, পেশাগতভাবে দক্ষ ও কর্মক্ষম এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিতপ্রাণ।

বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি পেশা, ইত্যাদি ফ্যাকাল্টি অন্তর্ভূক্ত করে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বাংলাদেশে কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, পেশাগত শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো মুখ থুবড়ে পড়বে, যদি সরকারী অনুদান ও সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া পেশাগত টেকনিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। কিন্তু বেসরকারী মাদ্রাসা শিক্ষা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত চলছে। সরকারী সাহায্য দূরের কথা বৈরিতা এবং শত্রুতা সত্ত্বেও বেঁচে আছে। এটা মাদ্রাসা শিক্ষার অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তি প্রতিফলিত করে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বিলোপের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না – বরং বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা, কারিগরী শিক্ষা সংক্রান্ত

বিষয়গুলো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সিলেবাস সেভাবে পুনর্গঠন করতে হবে। একটি লক্ষ্য হবে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতিতে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের অবদান নিশ্চিত করা।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতি ও উন্নতির জন্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ফেলোশিপ ও বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগীতা আশাতীতভাবে প্রাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে আসছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়ন, আধুনিকীকরন ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্যে বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে পাওয়া যায় না।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের অর্থনীতির এমন কোনো একটি দিগন্ত নেই যেখানে উন্নত দেশসমূহের আর্থিক অনুদান ও অবকাঠামো তৈরীতে তাদের ব্যবস্থাপত্রের প্রভাব নেই। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহও বাংলাদেশের প্রতি আর্থিক সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে। মুসলিম বিশ্বের ধনী দেশসমূহ ইসলামী শিক্ষা বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, পুনর্গঠন ও আধুনিকীরণের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য সহযোগীতার হস্ত প্রসারিত করতে পারে। ধনী মুসলিম দেশসমূহ তাদের বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচীতে ইসলামী শিক্ষা আধুনিকীকরণ ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের কাজটি অগ্রাধিকার দেবেন – এটা আমাদের প্রত্যাশা।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুসলিম দেশসমূহকে প্রচুর সম্পদে অনুগৃহীত করেছেন। সবগুলো দেশেই রয়েছে শ্রমিকের অভাব। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত – এ তিনটি দেশেই রয়েছে বিরাট মুসলিম জনসংখ্যা। তাদের আর্থিক সম্পদ সীমিত। অনুন্নত মুসলিম দেশসমূহের উদ্বৃত জনসম্পদ বা জনশক্তি ঘাটতি দেশসমূহে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, শিল্প-কারখানায় উৎপাদন কর্মে এবং অফিস-আদালতে সুব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োগ করতে পারে।

মুসলিম দেশসমূহ তাদের ঈমান, আক্বিদা ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বিরাট সৌধ গড়ে তুলতে।

তৃতীয় অধ্যায়

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ভাষা চর্চা

মাদ্রাসা শিক্ষিতগণ সামাজিক ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের চেয়ে অনেক বেশি সম্মান ও ইজ্জত পেয়ে থাকেন। তবুও তারা পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের সাথে প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারেন না। আমাদের মতে এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃটিশ সৃষ্ট সেকালের মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস, পাঠ্যক্রম ও সীমিত জ্ঞান চর্চা।

সীমিত জ্ঞানচর্চা

ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে আরবী, ফার্সী, উর্দু ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা দুনিয়াদারীর বৈষয়িক উন্নতিতে অনেক পিছনে পড়ে আছেন। ইংরেজী শিক্ষিতরা বর্তমানে সামাজিক ও আর্থিক প্রেক্ষাপটে অধিকতর অগ্রসর। এ দু'ভাষায় শিক্ষিতদের জীবনযাত্রার মান উন্নত। তাদের তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জীবনযাত্রার মান অনেক নিম্নে। এ জন্যে পাশ্চাত্য শিক্ষিতরাই শুধু দায়ী নয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস এমনভাবে পুনর্বিন্যাস বা সংস্কার করা উচিত যাতে দুনিয়াদারী জীবন সংগ্রামে বৈষয়িক প্রতিযোগিতায় মাদ্রাসা শিক্ষিতরা অন্যদের থেকে পিছিয়ে না থাকেন।

ভাষাজ্ঞান

পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ শেষ হলেও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ জোরদার হয়েছে। অর্থনৈতিক সংঘাত ও সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে ভাষাজ্ঞান অতীত থেকে বর্তমানে অনেক বেশি প্রয়োজন। এ যুগে গুরুত্বের দিক দিয়ে ভাষাজ্ঞান অবহেলার বিষয় নয়।

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির অনতিক্রম্য দুর্বলতা নীচুস্তরের ভাষাজ্ঞান। ইংরেজী শিক্ষিতরা ঘরে বাইরে অফিস আদালতে ইংরেজীতে যোগাযোগ করেন, কথা বলেন। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষিতরা নিজেদের মধ্যে আরবীতে কথা বলতে পারেন না।

আরবী

আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ফলে দ্বীনের জ্ঞান আহরণ করা সহজতর হয়। আল-কুরআনের ভাষা এবং জান্নাতের ভাষা বলে আরবী চর্চায় রয়েছে বিরাট পুণ্য। আরবী সাহিত্যে অবদান তো 'আলেম-উলামাদের থাকার কথা ছিল। ইংরেজী ভাষা চর্চা করলে পুণ্যের কোনো সম্ভাবনা নেই যদি না তা একামতে দ্বীন এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়।

আরবীতে নিয়মিত অথবা অনর্গল কথা বলে যান এরূপ আলেম কমই দেখা যায়। এটা হয়ত তাঁদের অতি দুর্বল ভাষাজ্ঞানের পরিচায়ক। নিজেদের মধ্যে কেউ কেউ

হাসিঠাট্টার ছলে বলে থাকেন – আমরা অনেকেই কোনো ভাষাই শুদ্ধভাবে লিখতে, পড়তে বা বলতে পারি না।

ফার্সী ভাষা

অতীতে মাদ্রাসাগুলোতে ফার্সী ছিল শিক্ষার মাধ্যম। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী, ফার্সীতে শিক্ষার গুরুত্ব ছিল। এখনও ফার্সী ভাষা বহু মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলক।

এক সময় ফার্সী ভাষায় রচিত আরবী গ্রামার বাঙালী শিক্ষার্থীদেরকে উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো। এ শিক্ষা পদ্ধতির মান এ পর্যায়ের যে, মাদ্রাসা শিক্ষিতগণ ফার্সী ভাষায় রচিত কবিতা, শের বা ছড়ার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করতে পারেন। তারা আরবী, ফার্সী পুস্তক পাঠ করে উর্দু তরজমা করতে পারেন কিন্তু আরবী বা ফার্সী ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন না। দু'জন কওমী মাদ্রাসা আলেমকে কখনো নিজেদের মধ্যে ফার্সী ভাষায় কথা বলতে শুনা যায় না।

উর্দু ভাষা জ্ঞান

বাঙ্গালী উর্দু শিক্ষিত ব্যক্তিরা উর্দু পড়েন এবং পড়াতে পারেন। কিন্তু উর্দু গ্রামারে তারা এত দুর্বল যে, মুজাক্কার মুয়ান্নাস বা লিঙ্গ সংক্রান্ত ভুলত্রুটির কারণে উর্দু সাহিত্যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের থেকে বাঙালীদের অবদান অনেক কম। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে তাদের অনেকেরই কোনো অবদান নেই।

মাদ্রাসায় শিক্ষিত উর্দুভাষীগণ উর্দু সাহিত্যে যে অবদান রেখেছেন বাংলাভাষী মাদ্রাসায় শিক্ষিতগণ তা পারেননি। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ), (২) মাওলানা মুফতী শফি (রঃ), (৩) মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ), (৪) আবুল হাসান আলী নদভী (মা. জি. আ.), প্রমূখের উর্দু ভাষা জ্ঞান কোনো ধর্মনিরপেক্ষ উর্দু সাহিত্য সেবী হতে নিম্নমানের নয়।

অতীতে ভারতীয় মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও দেওবন্দের বিশেষ প্রভাব ও ভূমিকা ছিল। এখন তা ক্রমশ সীমিত হয়ে যাচ্ছে। এই অবক্ষয়ের জন্যে ভাষাজ্ঞানের অভাব অনেকাংশে দায়ী।

বিশ্বের সেরা বিশুদ্ধভাষী

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর সুন্নাত। তিনি জীবনে একটি অশুদ্ধ বাক্য, শব্দ বা অক্ষরও উচ্চারণ করেননি। আরবী ভাষায় জিম, জাল, জা এবং জোয়া উচ্চারণের পার্থক্য অত্যন্ত কম। কিন্তু একরূপ নয়। যারা আরবীতে কথা বলেন – তারা কথা বলার সময় কোন্ অক্ষরটি উচ্চারণ করেন, তা বুঝা যায়। এ ঐতিহ্য তারা পেয়েছেন নবী করিম (সঃ) থেকে।

তালু থেকে উচ্চারিত শ, দন্ত থেকে উচ্চারিত স, মুর্ধা থেকে উচ্চারিত ষ এর উচ্চারণ এক নয়। কিন্তু, বাংলায় আমরা তিনটি 'শ' 'স' 'ষ' ই প্রায় একইরূপ উচ্চারণ করি। আরবীতে একাধিক অক্ষরের উচ্চারণ কাছাকাছি। বাংলাদেশের আলেমগণ যখন আরবী তিলাওয়াত করেন, যে কোন্ আলেম তা ধরতে পারেন – সম শ্রেণীর কোন অক্ষরটি উচ্চারিত হচ্ছে। শুদ্ধ আরবী ভাষা আলেমদের অনেকেই জানেন। কিন্তু বলেন না।

মাখরাজ (উচ্চারণ) বিজ্ঞান আরবীতে যত উন্নত বাংলায় ততটুকু নয়। আরবী মাখরাজের উৎস হলেন আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)। তিনি নিজেই বলেছেন তিনি ছিলেন সবচেয়ে শুদ্ধভাষী আরব। এর স্বীকৃতি তিনি নিজেই দিয়েছেন।

বিশুদ্ধ নবীর অশুদ্ধ উম্মাত

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বহু সুন্নাহ আমরা পালন করি – যা কম গুরুত্বপূর্ন এবং আমাদের জন্য সুবিধাজনক। এগুলোকে আমি মিঠা সুন্নাত বলে থাকি। একটু সাবধানতা এবং পরিশ্রম বেশি এমন গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত আমরা ছেড়ে দেই। আমাদের অবস্থা অনেকটা ঐ অলসের মতো যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "কলা খাবি নাকি ?" অলস উত্তর দিয়েছিল – "চামড়া ছোলা কলা হলে খেতে পারি"। অর্থাৎ কলার চামড়া ছোলাতে যে কষ্ট, তাও সে করতে রাজী নয়।

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে ঠোঁটের বা জিহ্বার বেশি কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কলা ছোলাতে যতটুকু কষ্ট হয়, শুদ্ধ উচ্চারণ করতে ঠোঁট দু'টির ততটুকু কষ্ট হয় না। এ কষ্টটুকুও আমরা করতে রাজী নই। গলত বা অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্তদেরকে যদি একটি উপাধি দিতে হয়, সে উপাধিটি হতে পারে কওমে গলত অর্থাৎ অশুদ্ধভাষী কওম। এ কওম নিজেদের উচ্চারণে জিহ্বা এবং ঠোঁটের অপব্যবহার করে।

মাদ্রাসা ছাত্রদের পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে এ নিয়তে মাদ্রাসায় পাঠাননি যে তারা অশুদ্ধভাষী হয়ে মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষকগণ নবীর ওয়ারিস হতে পারেন এমন একটা শ্রেণীকে অশুদ্ধভাষী করে মাতাপিতার নিকট ফেরত পাঠান।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মাদ্রাসায় বাংলা ইংরেজী জ্ঞানের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। যিনি পেশাগত জীবন সাফল্যের জন্যে ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান আয়ত্ব করতে চান, তাকে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষিতদের ন্যায় ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে হবে। বাংলা ভাষা তাদের মূল বিষয় হলে তাদেরকে বাংলা ভাষায় বি. এ. অনার্স, এম, এ ডিগ্রীধারীদের মতো জ্ঞানী হতে হবে। সরকারী চাকুরী না পেলেও পত্রিকা, প্রেস বা পাবলিকেশন্ এ চাকুরী পেতে তা সহায়ক হতে পারে।

মাদ্রাসা শিক্ষিতরা সাধারণত টেলিভিশন দেখেন না, টেলিভিশনে কথা বলার সময় বক্তারা একটু সতর্ক থাকেন। নাটক, খবর, বিভিন্ন ফিচার দেখলে ভাষাজ্ঞান উন্নত হয়।

পুস্তক সাময়িকী ক্রয়ের অভ্যাসহীনতা

বহু আলিমের মধ্যে বই-পুস্তক ক্রয়ের প্রবণতা অত্যন্ত কম। ইংরেজী বাংলা শিক্ষিতরা বিভিন্ন অশ্লীল পত্র-পত্রিকা এবং রহস্য সিরিজের উপন্যাস ক্রয় করে। পাঠ্য-পুস্তক অপেক্ষা এ সমস্ত উপন্যাসের অখাদ্য গিলে। কারণ, এগুলোতে যৌন সুরসুরি থাকে। যৌন চেতনা উন্মেষের প্রাথমিক স্তরে এ নাটক, উপন্যাসগুলো বিশেষ করে রহস্য সিরিজ যুবকদের নিকট ফজলী আম, হিম সাগর, রসগোল্লা, রাজভোগ অপেক্ষা অনেক বেশি প্রিয়। এ সমস্ত বই পড়তে পড়তে তাদের ভাষাজ্ঞান উন্নত হয়। মাদ্রাসার হুজুর কেবলারা চারিত্রিক বদনাম ও পাপের ভয়ে এগুলো পড়েন না। এগুলো না পড়া ভাল।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল বই আছে। এগুলো পড়লে ভাষাজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব। কিন্তু মাদ্রাসা ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের বাইরে বই পড়ার অনীহা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলা ভাষা জ্ঞানে এরা থাকে অত্যন্ত দুর্বল।

আলীয়া মাদ্রাসা এবং স্কুল কলেজের সমস্তরের শিক্ষকদের সরকার থেকে প্রাপ্ত বেতন অনুদান সমান। স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা যে হারে বাংলা ও ইংরেজী ম্যাগাজিন ক্রয় করে থাকেন, মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে সাধারণত তা করতে দেখা যায় না। লক্ষ লক্ষ 'উলামায়ে কিরাম বাংলাদেশে আছেন। আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষকের সংখ্যা কম নয়। তাদের মধ্যে ২০০০ আলিম একটি করে আরবী ম্যাগাজিন ক্রয় করলে একটি মাসিক আরবী ম্যাগাজিন চলতে পারে।

একটি পরিবারে বছরে জুতা ক্রয়ের জন্য যত টাকা ব্যয় হয়, আরবী, বাংলা ভাষায় রচিত দ্বীনি পুস্তক ক্রয়ের জন্য তত টাকা ব্যয় হয় কিনা সন্দেহ। এ দুর্বলতা এবং প্রবণতা যত দ্রুত দূর হয়, ততই ভালো।

মাদ্রাসায় ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত সেকেলে। যার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমদের পক্ষে আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত কঠিন।

বাঙ্গালী আলিম সমাজের ভাষার প্রতি উদাসীনতা এবং উপেক্ষা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। শুধু বাংলার প্রতি নয়, উর্দু আরবী, ফার্সীর প্রতিও তাঁরা উদাসীন।

'আলিম উলামাদের অনেকে কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে অতি ধীর স্থির, নির্জীব এবং শ্লথগতি সম্পন্ন। 'উলামাদের ভাষা ব্যবহারের গতি এবং বৈচিত্র নেই বললেই চলে। ভাষাজ্ঞান, ভাষা শৈলী, ভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহারে মাদ্রাসা শিক্ষিত ও ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে তুলনা হয় না।

যদিও আমি মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সমালোচনায় অত্যন্ত কঠোর কিন্তু, আল্লাহ্র নিকট আমার হাশর কামনা করি তাদের সাথেই। আমার সমালোচনার লক্ষ্য হলো সংশোধন। আমাদের কিছু দেখতে বললে আমরা দেখি না। এমনভাবে বলতে হয় – যাকে বলা হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো। আমি নিজেও একজন শুদ্ধভাষী নই। আমার সমালোচনা বিশুদ্ধভাষীর অহংকার প্রসূত নয়। বরং, অপরাধীর আর্ত চিৎকারসম। বাড়ীতে আগুন লাগলে যে চিৎকার করবে, তাকে নেক্কার, মুত্তাকী হতে হবে না। মহাপাপী হলেও সে চিৎকার করতে পারবে। আমার সমালোচনা হলো সে শ্রেণীর। কোনো সুধী ব্যক্তি আমার এ পুস্তকে বা অন্য কোনো পুস্তকের তথ্য, তত্ত্ব এবং বিশেষ করে ভুলত্রুটিগুলো কষ্ট করে চিহ্নিত করে আমাকে লিখিত বা মৌখিক জানিয়ে দিয়ে (ফোন-৮৩১২৪৮০) আমার উস্তাদের মর্যাদায় অভিসিক্ত হতে বিনীত আরজ করছি।

অশুদ্ধ ভাষা প্রীতি ও ভীতি

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ভাষাগত দুর্বলতার একটি বড়ো কারণ অশুদ্ধ মাতৃভাষা প্রীতি এবং অশুদ্ধ বিদেশী ভাষা ভীতি। অতীতে ইসলাম চর্চা হয়েছে 'আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষায়। বিগত দু'শতাব্দীতে ইসলামী সাহিত্যে সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো উর্দু ভাষার এবং উর্দু ভাষীদের। ইসলামের সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রথম পরিচয় 'আরব বনিকদের মাধ্যমে। পরবর্তীতে ইরানী, আফগানী, তুর্কী, সুফী দরবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবে মানবাধিকারহীন বাঙ্গালী মুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অনেক সুফী দরবেশদের ভাষা ছিল ফার্সী। ভারতে উর্দু ভাষার উন্নয়নের পূর্বে ইসলামী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আরবীর পরেই সবচেয়ে বড়ো অবদান ছিল ফার্সী ভাষীদের। এরপরে উর্দু ভাষীদের। বহুবিধ কারণে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষিতগণ আরবী, ফার্সী এবং উর্দুকে পবিত্র ধর্মীয় ভাষা মনে করেন।

উর্দু এবং ফার্সী ভাষার বর্ণমালা মূল আরবী হরফ হওয়ার কারণে কুরআনী অক্ষরের মর্যাদাবশত আরবীর সঙ্গে ফার্সী এবং উর্দুর প্রতিও মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ফলে আরবী, ফার্সী অশুদ্ধ বলা বা লিখা বাঙ্গালী মাদ্রাসা শিক্ষিতদের অনেকের নিকট গুনাহর কাজ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তো আরবী অক্ষরে উর্দু, ফার্সী বা আরবী ভাষায় লেখা রুচি বহির্ভূত অশ্লীল কবিতা অথবা সিনেমার বিজ্ঞাপন কোথাও পড়ে থাকতে দেখলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সওয়াবের আশায় হাতে নিয়ে চুমো খায়। বুকে, কপালে ঠেকায়। কেউ কেউ তো এরূপ লেখা বিনা অজুতে স্পর্শ করতেও চায়না। এহেন আরবী, ফার্সী, উর্দু ভাষা অশুদ্ধ লেখায়, এমন কি বলায় মাদ্রাসা শিক্ষিতদের একটা ভীতি আছে।

অন্য দিকে অতীতে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম বাংলা না হওয়ার কারণে শুদ্ধ বাংলা অনেকেই জানতেন না। আপামর জনসাধারণ শুদ্ধ ভাষায় সাধারণত কথা বলেন না।

শুদ্ধ-অশুদ্ধ যেভাবেই হোক – ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে মাতৃভাষার শুদ্ধতার প্রতি সাধারণ মানুষ উদাসীন ছিলেন। মায়ের কাছে বেয়াদবি বলে কিছু নেই। মায়ের কোলে পায়খানা, পেশাব করে দিতে বা উলঙ্গ হয়ে মায়ের বুক আকড়ে থাকতে কোনো শিশুর দ্বিধা হয় না।

যত ভুলই সন্তান করে থাকুক না কেন – মায়ের কাছে তা ক্ষমার যোগ্য। এমন অপরাধ নেই যা কোনো অশ্রুসিক্ত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অকপটে স্বীকার করা যায় না। নিজের জীবন দিয়ে হলেও মা আপন সন্তানের অপরাধ ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেন।

নিজ ভাষাকে মানুষ মাতৃসম মনে করে। তাই হয়তো মাতৃভাষা অশুদ্ধ বলতে মহাজ্ঞানীরও সংকোচ হয় না, বিশেষ করে যদি তা তার এলাকার বা আঞ্চলিক ভাষা

হয়। 'আরবী, ফার্সী অশুদ্ধ বলায় যেমন ভীতি, সংকোচ আছে, মাতৃভাষা অশুদ্ধ বলায় মাদ্রাসা শিক্ষিতদের তদ্রূপ প্রীতিবোধ আছে।

খুলনা বিভাগ বাদে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের সেরা আলিমদের অশুদ্ধ বচন, বক্তৃতা প্রতিদিন ডাল ভাত খাওয়ার মতই স্বাভাবিক। মাছ ভাতের ন্যায় প্রিয় খাদ্য যেমন আমরা ছাড়তে পারি না, অশুদ্ধ বাংলাও আমরা ছাড়তে পারি না। বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষিত হলে। অশুদ্ধ মাতৃভাষা প্রীতি ও বিদেশী অশুদ্ধ ভাষা ভীতি আমার মতে বাঙ্গালী মুসলিমের ভাষা শিক্ষার প্রধান অন্তরায়।

অশুদ্ধ আরবীর একটি স্বরূপ

আরবী ভাষায় কথোপকথনে একটি দোষ প্রায়ই ঘটে থাকে। তা'হলো মুযাক্কার মুয়ান্নাস – পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ সংক্রান্ত। বাস্তব লিঙ্গ ভেদে ভাষায় লিঙ্গের মিল হলে অসুবিধার কথা নয়। আরবীতে লিঙ্গ দু'টি। Neuter gender বা ক্লীব লিঙ্গের শব্দগুলোও দু'লিঙ্গে বিভক্ত। ক্লীব জাতীয় শব্দগুলোর পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ নির্ণয়ের নীতিমালা অস্পষ্ট।

আরবী ভাষায় চন্দ্র পুংলিঙ্গ কিন্তু সূর্য স্ত্রীলিঙ্গ। এরূপ বিভাগের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি নীতি হলো – যা অধিকতর পছন্দনীয় – তা হলো পুংলিঙ্গ। যা কম পছন্দনীয় – তা হলো স্ত্রী লিঙ্গ।

প্রচন্ড সূর্যের উত্তাপে দিনের বেলায় মরুভূমিতে চলাফেরা কষ্টকর। অতীতকালে আরবগণ বাইরে চলাফেরা সাধারণত রাতের বেলা করতেন। বিশেষ করে চাঁদের আলোতে। জ্যোৎস্না প্লাবিত রজনী ছিল তাদের জন্য আনন্দ উৎসব। তাই তাদের প্রিয় চাঁদকে তারা পুংলিঙ্গ হিসেবে কল্পনা করে। অপ্রিয় কিন্তু বহুল উপকারী সূর্যকে কল্পনা করে স্ত্রীলিঙ্গ রূপে। সূর্যের উপগ্রহ পৃথিবী। পৃথিবীর উপগ্রহ হলো চন্দ্র। সূর্য ও চন্দ্রের সম্পর্ক দাদা নাতনীর সম্পর্ক। আরবী ভাষায় আদরের নাতনী হলো পুংলিঙ্গ। সূর্য দাদা স্ত্রীলিঙ্গ।

খলিফা জাতির মধ্যে সকলের উপরে। সকলের উপরে বলেই শ্রদ্ধেয়। সময় সময় তিনি ভীতি উৎপাদন করেন। ন্যায়পরায়ণ খলিফাকে সকলেই ভয় পায়। খলিফা হবে পুরুষ কিন্তু খলিফাহ্ শব্দটি আরবীতে স্ত্রীলিঙ্গ।

অশুদ্ধ বাংলার একটি রূপ

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের ভাষা জ্ঞানে দুর্বলতার প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট দিক হলো গুরুচন্ডালী। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন গুরু। চন্ডাল ভাব প্রকাশ করে অশুদ্ধ ভাষায়। দু'জনের সংলাপ লিখে নিলে ভাষার যে রূপ হয় তাকে বলা হয় গুরুচন্ডালী ভাষা। যারা কোনো বাক্য শুদ্ধ, কোনো বাক্য অশুদ্ধ উচ্চারণ করেন, তাদের ভাষাগত দোষটাকে বলা হয় গুরুচন্ডালী দোষ।

বাংলা ভাষার দু'টি রূপ হলো – সাধু ভাষা এবং চলতি ভাষা। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে রূপ দু'টি সুস্পষ্ট। বহু 'উলামায়ে কিরাম কথা বলার সময় সাধু এবং চলতি মিশিয়ে ফেলেন। যারা সাধু এবং চলতি রূপ মিশিয়ে কথা বলেন, তাদেরকে অশিক্ষিত এবং গুরুচন্ডালী দোষে দূষিত মনে করা হয়। মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বিশুদ্ধ বাংলায় ওয়াজ করেন। বহু ওয়ায়েজিনের ভাষায় থাকে গুরুচন্ডালী দোষ।

বহু 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে ভাষাজ্ঞান নিম্নস্তরের হওয়ার একটা বড় কারণ হলো অনর্গল মাতৃভাষা অশুদ্ধ বলতে তারা বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন। কোনো দোষ করে যদি কেউ লজ্জিত না হন, তা দূর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে তারা অশুদ্ধ উর্দু বা 'আরবী বলতে খুবই লজ্জিত। এতো লজ্জিত যে সাহস করে মুখ খুলেন না।

ভাষাজ্ঞান অর্জনে গীবতের ভূমিকা

উর্দু অতি সহজ ভাষা। তবে 'আরবীর ন্যায় মুযাক্কার মুয়ান্নাস বা পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে অতি কঠিন ভাষা। শব্দের লিঙ্গ নির্ণয়ে অনেকেই গলদগর্ম হন।

পারস্পরিক ঈর্ষা বা হিংসা অধিকাংশ 'আলেমের পেশাগত রোগ। সম মানের বা সম পেশার হলে একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারেন না। অন্যের ত্রুটি ধরায় অনেকে উস্তাদ। গীবতে চ্যাম্পিয়ন বহু আলেম 'উলামাকে পরাজিত করার শক্তি মনে হয় ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদেরও নেই।

কাকের মাংস কাকে খায় না। কিন্তু বহু আলেমের মাংস অন্য আলেমের জন্য হালাল ! এমন কি ফরজ ! তরক করলে মহাপাপী হতে হবে ! গীবত করতে না পারলে, অন্ততঃ অন্যের ভুল ধরতে না পারলে অনেকের নিদ্রা হারাম হয়ে যায় !

একজন 'আরবী 'উর্দু, ফার্সীতে কথা বললে দশজন পাওয়া যাবে তার ভুল ধরতে। উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেবেন যে তিনি ভাষা জ্ঞানে কত দুর্বল। বহু 'উলামার মধ্যে গীবত প্রবণতার কারণে একজন আলিম অন্য আলিমের সম্মুখে 'আরবী, ফার্সী, উর্দুতে মুখ খুলেন না।

গীবতের বিষক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া দৃষ্টে মনে হয় অনেকের পক্ষে আল্লাহ্‌র কালামের ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলা কবীরা গুনাহ্ ! রাসূলের (দঃ) ভাষায় কথা বলা মহাপাপ ! জান্নাতের ভাষায় কথা বললে জাহান্নামী হতে হবে ! 'উলামাদের এ মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভীতির কারণে তাদের ভাষাজ্ঞান উন্নত হয় না। তারা 'আরবী ফার্সী ভাষায় এ দুনিয়ায় নিজেদের মধ্যে যতটুকু ভাব বা পত্র বিনিময় করা উচিত – তা করেন না।

বিশুদ্ধ বাংলা ভাষী

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে যারা বাংলা ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য একজন হলেন মাওলানা আকরাম খাঁ। বাংলা ভাষায় রচিত নবী জীবনীগুলোর মধ্যে আকরাম খাঁ রচিত "মোস্তাফা চরিত" এখনো শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। মাদ্রাসা শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম লেখক হলেন আল্লামা আব্দুর রহীম (রঃ), মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, অধ্যাপক আখতার ফারুক, আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও আরো অনেকেই। তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

মাখরাজ

(আরবী উচ্চারণ)

আরবী উচ্চারণের প্রকৃতি বাংলা এবং ইংরেজী উচ্চারণ হতে আলাদা। বাংলা বা ইংরেজী অক্ষরের উচ্চারণ অনুসরণ করে আরবী অক্ষরগুলো উচ্চারণ করলে ভুল হওয়াটা শুধু স্বাভাবিক নয়, অবশ্যম্ভাবী। নানা ভাষা কত ধরনের শব্দ এবং ধ্বনি আমরা উচ্চারণ করি। উচ্চারণ কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক হয়, কখনও হয় বেঠিক। কিন্তু আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র নবীর নামটিকে যদি আমরা সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে না পারি, তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

যে কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ এবং ইসলাম সম্বন্ধে জানলাম, সেই কুরআন শব্দটিও আমরা লিখি বা উচ্চারণ করি 'কোরান' যা ভুল। 'কুরআন' শব্দটিতে আছে চারটি অক্ষর – (১) কাফ, (২) রা, (৩) আলিফ, (৪) নুন। কিন্তু কোরান শব্দে আমরা উচ্চারণ করি তিনটি অক্ষর (কোরান) – (১) কাফ, (২) রা, (৩) নুন অর্থাৎ অলিফ অক্ষরটি 'কোরান' উচ্চারণ করলে সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যায়। বহু আরবী শব্দের উচ্চারণই আমাদের কণ্ঠে অনেক সময় ব্যাঙ্গ উচ্চারণের মত হয়। যারা সঠিক আরবী উচ্চারণ জানেন, আমাদের উচ্চারণ তাদের হাসির উদ্রেক করে।

আল্লাহ্ শব্দের আগের শব্দের শেষ অক্ষরে যদি কাসরাহ্ বা জের থাকে, তবে আল্লাহ্ শব্দের উচ্চারণ হয় বারিক বা চিকন। মুখের ফাক হয় কম। কিন্তু আল্লাহ্ শব্দের আগের শব্দের শেষ অক্ষরে যদি ফাতহা বা জবর থাকে অথবা জাম্মাহ বা পেশ থাকলে তার ধ্বনি পুর বা মোটা উচ্চারিত হবে। দু'ঠোটের ফাঁক হবে বেশি আল্লাহ শব্দের উচ্চারণ হবে অনেকটা 'আল্লাহ' এবং 'আল্লোহ্' – এ দু'শব্দের মাঝামাঝি ধ্বনির মতো। অথচ, আমরা সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহ্ শব্দটি আল্লাহ্ই উচ্চারণ করি কখনও আল্লোহ্ বা অনুরূপ উচ্চারণ করি না। এটা ভুল। আর আল্লাহ্ শব্দটি যে আমরা ভুল উচ্চারণ করি তাও আমরা অনেকে সচেতন নই।

উচ্চারণের প্রতি উদাসীনতার ফলে দেখা যায় আমাদের প্রিয় নবীর (দঃ) দু'টি নাম মুহাম্মাদ এবং আহমাদ আমরা সঠিকভাবে উচ্চারণ করি না। এমনকি সঠিকভাবে লিখিও না। আমাদের নবীর নাম লিখি বা উচ্চারণ করি কখনও মুহম্মদ, কখনো মোহাম্মদ, মুহাম্মদ মোহাম্মাদ ইত্যাদি। কিন্তু সঠিক বানান এবং উচ্চারণ হলো মুহাম্মাদ।

নবীর নামের প্রথম অক্ষরের উপর আছে পেশ। পেশ এর উচ্চারণ ওকার নয় বরং উকার। নবীর নামের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অক্ষরের উপর আছে জবর। যার উচ্চারণ হয় আকারের মতো। কিন্তু আমরা উচ্চারণ করি অকার রূপে। যার ফলে মুহাম্মাদ শব্দটি হয়ে যায় কখনও মোহাম্মদ, কখনও মোহাম্মাদ, কখনও মুহম্মদ, কখনও মুহাম্মদ। অথচ এই চারটি বানানের বা উচ্চারণের একটিও সঠিক নয়।

আহ্‌মাদ লিখতে মিম অক্ষরের উপর আছে জবর, তার সঠিক উচ্চারণ হবে আহমাদ কিন্তু আমরা অনেকেই উচ্চারণ করি আহম্মেদ, বা আহমদ, আহম্মদ যা ভুল।

মৃত্যুর পর আখিরাতে আমাদের হিসাব নিকাশে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। প্রতিদিন উচ্চারিত অতি প্রিয় আরবী শব্দগুলোর ভুল উচ্চারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে আমাদের দেয়ার মত কোন জবাব থাকবে না। আল্লাহ্‌ যদি বলেন, 'তুই বান্দা এত শব্দ, এত ধ্বনি, এত উচ্চারণ কষ্ট করে শিখলি, কিন্তু আমার নাম, আমার নবীর নাম, আমার কেতাবের নাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণ শিক্ষার সময় তুই দুনিয়ায় পেলিনা' তখন আমাদের কি বলার থাকবে ?

নামাজ ফার্সী শব্দ। মূল কুরআনের আরবী শব্দ হলো 'সোয়ালাত'। নামাজ শব্দ উচ্চারণ করলে মনে হয় না কোন নেকী আছে কিন্তু 'সোয়ালাত' উচ্চারণ করলে অক্ষরে ৪০ নেকী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সোয়ালাত উচ্চারণ করতেও আমরা ভুল উচ্চারণ করি। সোয়ালাত লেখা হয় 'সোয়াদ', 'লাম', ও 'ওয়া'(উহ্য) এবং 'তা', এই চার অক্ষরে। কিন্তু, ব্যাপকভাবে ভুল উচ্চারণ করতে করতে অশুদ্ধটাই শুদ্ধ বলে আমাদের মনে হচ্ছে।

নবীর (দঃ) নাম উচ্চারণের সময় আমরা দরুদ পাঠাই সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে। দরুদ পাঠাবার সময় পর্যন্ত আমরা বেয়াদবী করি। কারণ 'সাল্লা' শব্দটির প্রথম অক্ষর 'সীন' নয় 'সোয়াদ'। এখন শুদ্ধ উচ্চারণ করলে লোকে মনে করবে উচ্চারণ ভুল হচ্ছে এবং বেয়াদবী হচ্ছে।

আমাদের নবী (দঃ) এক সময়ে বলেছিলেন যে, 'আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন তাহলে তিনি হতেন 'উমর'। অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'প্রত্যেক নবীরই জান্নাতে একজন সঙ্গী থাকবেন। আমার সঙ্গী হবেন 'উসমান'। আল্লাহ্‌র এই প্রিয় দু'জন সাহাবীর নাম আমরা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারি না।

অনেকের দৃষ্টিতে সাহাবীদের মধ্যে হযরত 'আলীর স্থান মারেফাতের শীর্ষে। তার নামও আমরা, সঠিকভাবে উচ্চারণ করি না। আরবী আইন অক্ষরটি উচ্চারণ 'ও' অথবা 'আ' দিয়ে করলে সঠিক হয় না। 'উমার উ এর সাথে একটা উলটা কমা দিয়ে আইন শব্দটি উচ্চারণের চেষ্টা করা হয়। মন্দের ভালো হিসাবে তাই চলছে। প্রথম খলিফা আবু বাকার-এ উচ্চারণ করি আবু বকর। তা ভুল। আরবী অক্ষর 'বা' এবং কাফের উপর আছে জবর। তাতে উচ্চারণ হবে বাকার, বকর নয়। এ পবিত্র নামটিকে বিকৃত করে কেউ কেউ উচ্চারণ করে বক্কর। আসতাগ ফিরুল্লাহ্‌।

যে শব্দটি মানুষের কাছে প্রিয় তা হ'লো তার নাম। কিন্তু এই নামগুলো যদি আমরা ভুল উচ্চারণ করি, কি করে নবীর (দঃ) শাফায়াত এবং আল্লাহ্‌র করুণা আমরা আশা করতে পারি ? অথচ উচ্চারণ ঠিক করে নেয়া মোটেই কঠিন কাজ নয়।

নূরানী পদ্ধতির পাঠক্রমে ২০ ঘন্টার মধ্যেই উচ্চারণ অনেকটা সহীহ বা শুদ্ধ হয়ে যায় এবং আরো অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করা যায়। কিন্তু অতো লম্বা হায়াতের মধ্যে উচ্চারণ ঠিক করার জন্যে ২০ ঘন্টা সময় আমাদের হয় না। অথচ কত সময় আমরা অপচয় করি।

যারা আমার মত নিজের চেষ্টায় আরবী শিখেছেন তাদের উচ্চারণে যে কত ভুল থাকে, তা কোন 'আলেমের নিকট তেলায়াত না শুনলে ধরার উপায় নেই। আমার জন্যে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়েছে নূরানী প্রশিক্ষণ।

আরবী উচ্চারণ আমরা শিখতে পারি না, তার কারণ, শিক্ষার আগ্রহ আমাদের তেমন নেই। যে পরিমাণ আগ্রহ থাকলে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয়ের আগ্রহ জন্মাবে ততটুকু আগ্রহ আমাদের নেই। টেলিভিশনের সামনে বসে যে আগ্রহ সহকারে আমরা নাটক বা সিনেমা বা ফুটবল খেলা দেখি, সেরূপ আগ্রহের সঙ্গে আরবী উচ্চারণ শিক্ষার চেষ্টা করলে ২০টি ঘন্টার মধ্যে উচ্চারণ অনেকটা শুদ্ধ হবে। কিন্তু এ সময়টুকু আমাদের হয় না।

পাখী বিক্রেতার খাঁচায় যখন আমরা অনেকগুলো পাখী দেখি, তখন আগ্রহের সঙ্গে আমরা কোনটা কোন পাখী তা জিজ্ঞাসা করি। তারপর পাখীর নাম সম্বন্ধে উৎসুক্য হারিয়ে ফেলি। তেমনি আলেম সাহেবানদের দেখলে উচ্চারণ সম্বন্ধে দু'চারটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তারপর ভুলে যাই। কিন্তু আগ্রহ থাকলে এবং মনোযোগ সহকারে ২০ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে পারলে আমাদের উচ্চারণ অনেকটা শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আফসোস আমাদের সময়ের এত দাম যে সারা জীবনেও এই ২০ ঘন্টা সময় আল্লাহ্‌র কালাম সঠিকভাবে উচ্চারণের জন্য ব্যয় করতে পারি না।

উচ্চারণের স্থান হলো মুখ। মুখের মধ্যে আছে দাঁত, জিহ্বা, তালু। আরবী উচ্চারণে এই তিনটির গুরুত্ব খুব বেশি। এছাড়াও রয়েছে ঠোঁট ও গলা। আরবী উচ্চারণ ঠিক করতে হলে নিজের মুখ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। মুখের ভিতরটা কিরূপ – এটা মডেল দিয়ে দেখানো সম্ভব। আরো ভাল হয় মুখ ফাঁক করে যদি আমরা আয়নায় ভাল করে উপর এবং নীচের দাঁতের মাড়ি, দাঁতের গোড়া, দাঁতের গা, তালু, জিহ্বার পাশ, গলা, গলার গোড়া ইত্যাদি দেখে বুঝে নিতে চেষ্টা করি।

টাইপ শিখতে আংগুলের গুরুত্ব যতটুকু, আরবী শিখতে জিহ্বার গুরুত্বও ততটুকু। টাইপিষ্ট, ষ্টেনো-টাইপিষ্টগণ টাইপ রাইটার মেশিনের কী বোর্ডের অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে টাইপ শিক্ষা শুরু করেন। টাইপ করতে করতে তার চোখ, মন, মস্তিষ্ক এবং আংগুলের মধ্যে একটি অপূর্ব সমন্বয় স্থাপিত হয়। শত শত ঘন্টা এবং পৃষ্ঠা টাইপ করার পর টাইপিষ্টের চোখ, কান, মন, মস্তিষ্ক এবং আঙ্গুলের এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন একটি শব্দ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই কোন আঙ্গুল ব্যবহার করতে হবে, মস্তিষ্ক সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়।

মন হলো প্রশাসক বা বাস্তবায়ন কর্তা বা হুকুম দাতা। মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সাথে সাথে মন আংগুলকে টাইপরাইটারের কী বোর্ডের যথাস্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। একজন টাইপিষ্ট না দেখে শুধু শব্দটি শুনেও টাইপ করতে পারে। এখানে কানের সাথে মস্তিষ্ক এবং হাতের আংগুলের সমন্বয় প্রয়োজন। চোখ এবং কানের তাৎক্ষনিক যোগাযোগ ছাড়াও টাইপিষ্ট টাইপ করতে পারে। টাইপিষ্ট মনে মনে কিছু ভাবছে, এই ভাবনা অবচেতনভাবেই আংগুলের মাথায় চলে আসে।

কোন টাইপিষ্টকে যদি বলা হয়, তুমি 'টাইপিষ্ট' শব্দটি টাইপ করো। টাইপ রাইটার মেশিনের সামনে বসে টাইপ রাইটার কী বোর্ডের উপর হাত রাখো। তারপর

প্রথমে ডান হাতের তর্জনীকে টাইপ রাইটারের নীচ থেকে তৃতীয় লাইনের এক অক্ষর ডান দিকে নিয়ে যাও, তারপর টি অক্ষরে চাপ দাও, তারপর ডান হাতের তর্জুনী একই লাইনে অবিস্থিত ওয়াই অক্ষরে নিয়ে যাও এবং ওয়াই অক্ষরে চাপ দাও, এরপর হাতের কণিষ্ঠ অংগুলি উপরের লাইনের এক অক্ষর ডানে পি অক্ষরে চাপ দাও। এরপর বাম হাতের আংটি পরার অংগুলি যথাস্থানে অবস্থিত এস অক্ষরে চাপ দাও। সর্বশেষ টি অক্ষরে সর্বপ্রথমে যেভাবে চাপ দিয়েছিলে সেভাবে চাপ দাও। এইভাবে কাউকে দিয়ে টাইপ করাতে হলে তা আর যাই হউক টাইপ হবে না।

কুড়ি ঘন্টা প্র্যাকটিস করে কোন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সঠিক কেন, মোটামুটি নিজের কাজ চালাবার মত টাইপও করতে পারবে না। কিন্তু ২০ ঘন্টা আরবী উচ্চারণ ঐ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যাতে নামাজ পড়া কিছুটা তৃপ্তির সঙ্গে সম্ভব।

একজন লোকের পক্ষে টাইপ শিক্ষা করা যত কঠিন, আরবী অক্ষরে উচ্চারণ বিধিমত শিক্ষার চেষ্টা করা হলে তার শত ভাগের এক ভাগও কঠিন মনে হয় না। অথচ, আমরা সারাটি জীবনই অশুদ্ধ উচ্চারণে নামাজ পড়ে যাচ্ছি। আল্লাহ্ আমাকে এবং আমাদের সকলকে হেদায়েত দিন।

আরবী অক্ষরের মাখরাজ

মাখরাজ শব্দের অর্থ হলো বাহির হওয়ার স্থান। খারিজ, খারেজী, খারাজা ইত্যাদি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দ। যে স্থান হতে কোনো অক্ষরের উচ্চারণ বাহির হওয়া শুরু হয় সে স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। অক্ষর উচ্চারণের ক্ষেত্রে মাখরাজ শব্দের অর্থ মূল, রুট বা উৎপত্তি স্থল বলা যেতে পারে। আরবী অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক করতে হলে উচ্চারণ কোথা থেকে খারিজ বা বাহির হওয়া শুরু হয় তা পূর্ব হতে বুঝে নিতে হবে। উচ্চারণের স্থান হিসাবে আরবী ভাষার ২৯টি অক্ষরকে ১৭টি মাখরাজ-এ বিভক্ত করা হয়েছে।

মুখ থেকে উচ্চারণ শুরু হয়। শারীরিকভাবে আমরা ঠোঁটকে মুখের শুরু ধরতে পারি। কিন্তু আরবী উচ্চারণের ক্ষেত্রে ঠোঁটকে শেষ ধরা হয়েছে। এবং শুরু ধরা হয়েছে গলার গোড়া।

১নং মাখরাজ (হা, হামজা/আলিফ)

গলাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। বুক এবং গলার সন্ধি স্থলকে আমরা গলার মূল বা শুরু ধরতে পারি। এই গলার মূল থেকে ৩টি অক্ষর উচ্চারিত হয়। এই তিনটি অক্ষর হলো 'হা' (হাউয়াজ), 'হামজা' এবং 'আলিফ'। আলিফ ও হামজা এক অক্ষরই ধরা যেতে পারে। আলিফের সঙ্গে হরকত যুক্ত হলে তা হামজা নামে কথিত হয়। যবর, যের, পেশ, যজম এগুলো হল হরকত। গলাকে আরবীতে "হলক" বলা হয়। গলার গোড়া অথবা হলকের শুরু হতে উচ্চারিত হয় আলিফ, হামজা এবং হা হাওয়াজ। এই তিনটি অক্ষরের উচ্চারণ স্থানকে ১নং মাখরাজ বলা হয়।

২নং মাখরাজ (আইন, হা (হুকতি)

এক নম্বর মাখরাজের শুরু গলা হতে। ৩নং মাখরারে শুরু হলো গলার উর্দ্ধতন প্রান্ত হতে। ২নং মাখরাজের বা উচ্চারণের স্থান স্বাভাবিকভাবে গলার মাঝখান থেকে, অর্থাৎ ১নং এবং ৩নং উচ্চারণের স্থানের মধ্যস্থলেই। গলা বা হলকের মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয় যে দু'টি অক্ষর এগুলো হলো 'আইন' ও 'হা' হুকতি।

আরবী অক্ষর 'আইন' ও 'হা' উচ্চারণ করা বড় কঠিন। অনেকের পক্ষে এ দু'টো অক্ষর উচ্চারণ করতে অসুবিধা হয়। পুরুষ হাঁস ডাকার সময় যে ধরনের শব্দ করে, 'হা' অক্ষর উচ্চারণের সময় ঐ ধরনের একটি শব্দ হয়। তবে এর উচ্চারণ হাঁসের ডাকের মতন ধরে নিলে ভুল হবে। বুঝার সুবিধার জন্য উপমাটি ব্যবহার করা হলো।

গলার মাঝখান থেকে বাতাস বের হয়। ঢেকুর বের হয়। গলার একটি বিশেষ স্থানকে বাতাস নল বা নলি বলা হয়। ইংরেজীতে বলা হয় 'উইন্ড পাইপ"। 'আইনঃ এবং "হাঁ' হুকতি উচ্চারণ করার সময় এই বাতাস নলিতে একটু চাপ দিয়ে হঠাৎ করে বাতাস ছেড়ে দিতে হয়। 'আইন' এবং 'হা' উচ্চারণের লিখিত বর্ণনা বা যে কোনো আরবী অক্ষরের উচ্চারণের লিখিত বর্ণনা শুনে কেউ নিজে বিদ্যা অর্জনের অর্থাৎ উচ্চারণের অভ্যাস করলে বিকৃত উচ্চারণের মারাত্মক সম্ভাবনা আছে। বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো একটি

ধারণা দিয়ে দেয়া। কিন্তু সঠিক উচ্চারণ একটি ব্যবহারিক বিষয়। এটা অবশ্যই ভাল ক্বারীর থেকে শুনে অভ্যাস করতে হবে।

৩নং মাখরাজ (খা, ঘাইন)

গলার শেষ বা উচ্চভাগ হতে উচ্চারিত হয় 'খা' এবং 'ঘাইন' এই অক্ষর দু'টি। গরু জবাই করলে গরুর গলা থেকে যে স্বর বের হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে 'খা' 'ঘা' এর উচ্চারণ অনেকটা তার কাছাকাছি।

'হা' এবং 'আইন' গলার যে স্থান থেকে উচ্চারিত হয় 'খা' এবং 'ঘাইন' তার উপর থেকে উচ্চারিত হয়। 'হা' এবং 'আইন' উচ্চারণের সময় গলায় একটু বেশি চাপ দিতে হয়। 'খা' এবং 'গাইন' এর মধ্যে গোংগানীর শব্দ হলেও চাপ পড়বে একটু কম।

৪নং মাখরাজ (বড় ক্বাফ বা গোল ক্বাফ)

গলার উপর থেকে শুরু হয় মুখের এরিয়া। মুখের গোড়ায় আছে জিহ্বা। জিহ্বার ঠিক উপর থেকেই শুরু হয় উপরের তালু। জিহ্বার নীচের অংশ আরও একটু সামনের থেকে শুরু হয়। জিহ্বার গোড়া হতে জিহ্বার মধ্যস্থল পর্যন্ত এবং উপরের তালুর গোড়া হতে তালুর মধ্যস্থল পর্যন্ত এলাকা হতে ৬টি আরবী অক্ষর উচ্চারিত হয় বলা যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে নীচের দিকে অর্থাৎ জিহ্বার গোড়া এবং তালুর শুরুর থেকে উচ্চারিত হয় একটি অক্ষর। তা হল 'ক্বাফ'। ইহাকে অনেকে 'বড় ক্বাফ' বলে থাকেন। বড় ক্বাফ উচ্চারিত হয় জিহ্বার মূল গলার থেকে নয়। তার একটু উপর থেকে।

যেহেতু জিহ্বার গোড়া থেকে উচ্চারিত হয় তাই অনেকটা কষ্ট করেই এই অক্ষরটি উচ্চারণ করতে হয়। কষ্ট করে উচ্চারণ করতে হয় বলেই হয়ত উচ্চারণটি একটু কর্কশ হয়। বড় ক্বাফের উচ্চারণকালে যে শব্দ হয়, তা কোকিলের মধুর স্বর নয় বরং কাকের কর্কশ শব্দের মত। ক্বা ক্বা উচ্চারণের সময় ঠাস ঠাস কর্কশ আওয়াজ হয় বলে মনে হয়।

৫নং মাখরাজ (ছোট কাফ বা লম্বা কাফ)

জিহ্বার গোড়া থেকে উচ্চারিত হয় বড় ক্বাফ। আর গোড়া থেকে একটু আগে বেড়ে উচ্চারিত হয় কাফ অথবা ছোট কাফ। এ ছোট কাফের মাঝখানে ইংরেজী এস অক্ষরের মত পেচানো রেখা থাকায় এটাকে কেউ কেউ পেচানো কাফও বলেন। পেচানো হলেও উচ্চারণটি কিন্তু বড় ক্বাফ হতে অনেকটা সহজতর।

জিহ্বার গোড়া থেকে একটু উপরে বা সম্মুখে এর উচ্চারণ স্থান। শুধু জিহ্বা দিয়েই এটা উচ্চারিত হয় না। জিহ্বা কিছুটা উপরের তালুর সঙ্গেও স্পর্শ করে। কাফের উপর যবর দিয়ে কা শব্দ উচ্চারণের সময় মনে হবে যেন জিহ্বাটা উপরের তালুর সাথে সামান্য একটু লেগে গেছে। জিহ্বাটা পেচানোর ফলে মনে হবে কিছুটা মুখের ভিতরে বা পিছন দিকে জিহ্বাটি একটু সংকুচিত হয়ে যায়।

পাঁচ নং মাখরাজ বা উৎপত্তি স্থান হতে যে ছোট কাফ উচ্চারিত হয় এর জন্য কোন কষ্ট করতে হয় না। বিনা চেষ্টায় ও বিনা কষ্টে উচ্চারিত হলেই উচ্চারণ প্রায় সঠিক হয়ে যায়।

বাংলা 'ক' অক্ষর উচ্চারণ করতে যেরূপ শব্দ উচ্চারণ হয়, ছোট কাফ উচ্চারণ করতেও সেরূপ উচ্চারণ হবে। তবে 'ক' উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার গোড়ার কিছু অংশ উপরের তালুর সাথে লাগে না। কিন্তু ছোট কাফ উচ্চারণের সময় তা হয়। এখানেই বাংলা 'ক' এবং 'কাফ' অক্ষরের পার্থক্য।

৬নং মাখরাজ (ধোয়াধ)

ছয় নং মাখরাজ বা উৎপত্তি স্থান থেকে উচ্চারিত হয় 'ধোয়াধ' অক্ষরটি। তাজবিদের কিতাবে অনেক ক্ষেত্রে এটাকে ৭নং মাখরাজ ধরা হয়। হয়ত তাই ঠিক। কিন্তু উৎপত্তি স্থানের হিসাবে মাখরাজের নাম্বার দেয়া হলে আমার মনে হয় 'ধোয়াধ' এর উচ্চারণ ৬নং মাখরাজ দেয়াই সঙ্গত।

হযরত মাওলানা ক্বারী ইব্রাহিম সাহেবের নুজহাতুল ক্বারীতে 'ধোয়াধ' এর মাখরাজের নাম্বার দেয়া হয়েছে ৮ নাম্বার। মুখের যে অংশ থেকে ধোয়াধ উচ্চারিত হয়, তা হলো জিহ্বার মুখ বা গোড়ার যে কোন এক কিনারা এবং তার বরাবর উপরের মাড়ি বা দাঁতের গোড়া বা দন্তপাটি।

জিহ্বার দু'কিনারা ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। যে কোন এক কিনারা বরাবর উপরের দাঁতের মাড়ি অথবা দাঁতের সঙ্গে জিহ্বা লাগিয়ে ধোয়াধ অক্ষর উচ্চারণ করতে হয়।

জিহ্বার ডান বা বাম যে কোন কিনারা হতে উচ্চারণ করা গেলেও বাম কিনারা হতে উচ্চারণ করা সহজ।

ধোয়াধ অক্ষরটির উচ্চারণ কারো কারো মতে আরবী অক্ষরের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন। তুর্কী এবং ইরানিয়ানরা এই অক্ষরটি আরবী 'যা' বা ইংরেজী 'জেড' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারণ করে।

বাংলাদেশেও ইরানী প্রভাবের ফলে এই প্রবণতা দেখা যায়। যেমন আমরা রোযার মাসকে রামাদান না বলে রামাজান বলে থাকি। কিন্তু আরবরা বলবে রামাদান। বিচারকের আরবী শব্দ কাধী। কিন্তু উপমহাদেশে এবং ইরানে এটার উচ্চারণ কাজী। আরবরা অবশ্য কাধী বলেই উচ্চারণ করে।

কাধী যদি কাজী হতে পারে, রামাদান যদি রামাযান হতে পারে তবে সুরা ফাতেহার 'দোয়াল্লিন" কেন 'জোয়াল্লিন' হতে পারবে না – এটা একটি প্রশ্ন।

এ বিষয়ে উলেমাদের মধ্যে মতবিরোধ বা এখতেলাখ আছে। এই বিরোধ বাংলাদেশর সিলেট জেলার অপেক্ষাকৃত বেশি। বিশ্বনাথ বাজারের দোয়াল্লিন পন্থী এবং জোয়াল্লিন পন্থীদের মধ্যে বেশ মারামারি হয়। তবে আপোষ হয় বাজারটি দু'ভাগ করে। নদীর এক পাড়ে 'ধোয়াল্লিন' পন্থীরা কেনা-বেচা করে এবং নদীর অপর পাড়ে 'জোয়াল্লিন' পন্থীরা কেনা-বেচা করে। এখন অবশ্য ধোয়াল্লিন এবং জোয়াল্লীন পন্থীদের মধ্যে অধিকতর সহমর্মিতা বিরাজ করছে।

ধোয়াধ শব্দটির উচ্চারণ যেহেতু কঠিন, তাই এ সম্পর্কে অধিকতর সাবধানতা এবং প্র্যাক্টিস বা অভ্যাসের প্রয়োজন আছে।

৭ নং মাখরাজ (শিন, জিম, ইয়া)

৬নং মাখরাজ পর্যন্ত জিহ্বার মধ্যবর্তী স্থানের পূর্বের মাখরাজ এলাকা। জিহ্বার ঠিক মাঝখানে এবং ঐ বরাবর উপরের তালু হতে উচ্চারিত হয় তিনটি অক্ষর। এগুলো হলো শিন, জীম এবং ইয়া। এ তিনটি অক্ষরও একটু চেষ্টা বা কসরত করে উচ্চারণ করতে হয়। কম চেষ্টায় এবং বিনা চেষ্টায় উচ্চারণ অন্য অক্ষরেরও হয় কিন্তু একই রকম উচ্চারণ নয়।

জিম অক্ষরটি উচ্চারণ করতে কিছু কষ্ট করতে হয়। অনুরূপ ধ্বনির অক্ষর যোয়া, যাল, যা উচ্চারণ করতে তত অসুবিধা হয় না বা অত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় না।

মিশরে জীম অক্ষরটি 'গ' এর মত উচ্চারণ হয়। যেমন আমরা বলি 'জামাল আবদুন নাসের'। মিশরীয়রা বলে 'গাম্মাল আবদুল নাসের'।

শিন শব্দটি উচ্চারণের সময় 'ইস' এর মত বা শিস্ দেয়ার মতো একটি শব্দ হয়। ইংরেজী 'এস' 'এইচ' যুক্ত হয়ে যে ধরনের উচ্চারণ হয় শিন এর উচ্চারণ তার কাছাকাছি। শীন, ইয়া উচ্চারণের সময় জিহ্বার মধ্যবর্তী স্থান এবং উপরের তালু কোন এক পর্যায়ে মিলে যায় বলে মনে হয়।

৮নং মাখরাজ (লাম)

উচ্চারণের স্থানের দিক দিয়ে জিম, শিন, ইয়া'র পরেই আলোচিত হওয়া উচিত 'নুন' অক্ষরটির মাখরাজ বা উৎপত্তিস্থল। কিন্তু তাজবীদের কিতাব অথবা উচ্চারণ সংক্রান্ত কিতাবগুলোতে দেখা যায় 'নুন' এর আগে 'লাম' অক্ষরটির উচ্চারণ আলোচিত হয়। হয়ত কিছুটা কারণও থাকতে পারে। লাম উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়া পর্যন্ত একটু জোর পড়ে।

লাম অক্ষরটি উচ্চারিত হয় জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরের সম্মুখের দাঁতের গোড়ার নিকট থেকে। উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগের কিনারের উপরের দুই পাশের দাঁতের গোড়া পর্যন্ত চলে আসে। লাম উচ্চারণের সময় একটু লম্বা করে 'আল' উচ্চারণ করলে জিহ্বা উপরের তালুর অগ্রভাগ বা উপরের দাঁতের সামনের দিকে মাড়ি পর্যন্ত লেগে যায়। লম্বা করে টেনে উচ্চারণ করলেই জিহ্বা উপরের তালুর সম্মুখের দিকে লাগে, তা বুঝা যায়।

৯নং মাখরাজ (নুন)

সবগুলো অক্ষর উচ্চারণেই জিহ্বার কিছুটা ভূমিকা আছে। ৯নং মাখরাজ হতে 'নুন' অক্ষরটি উচ্চারিত হয়। নুন উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ সম্মুখের উপরের দাঁতের মাড়ি এবং তালুর মাঝখানে সম্মুখে যে খালী জায়গা থাকে, তাতে লেগে যায়। 'আন' শব্দ উচ্চারণকালে উচ্চারণের শেষ প্রান্তে জিহ্বাটি উপরের দাঁতের মাড়ির একটু পিছন দিকে মসৃণ তালুতে গিয়ে স্পর্শ করে। আন শব্দটি দীর্ঘ করলে জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের তালুতে লেগে থাকে এবং কোন্ জায়গায় লাগে তা অনুভব করা যায়।

১০ নং মাখরাজ (রা)

১০নং উৎপত্তিস্থল বা মাখরাজ হতে উচ্চারিত হয় 'রা' হরফটি। জিহ্বার আগা থেকে বেশ কয়েকটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। 'রা' অক্ষরটি উচ্চারিত হয় জিহ্বার স্বাভাবিক অগ্রভাগ থেকে নয় বরং মনে হয় যেন অগ্রভাগের উল্টা পিঠ থেকে। জিহ্বার অগ্রভাগের নীচের দিক মুখের নীচের চোয়ালের সাথেই লেগে থাকার কথা। কিন্তু 'রা' উচ্চারণ করলে জিহ্বার অগ্রভাব বা আগা উল্টিয়ে উপরের তালুর সঙ্গে লাগার ভাব হয়। আর এর উচ্চারণ বাংলা 'র' এর মত নয়। বরং অনেকটা 'ড়' এবং র এর মাঝামাঝি। উচ্চারণের সময় একটু মোটা করে 'রা' উচ্চারণ করতে হয়। তবে 'রা' এর নীচে 'যের' থাকলে চিকন সুর উৎপাদিত হয়। 'রা' এর উপর জবর এবং পেশ হলে এই অক্ষরের উচ্চারণ মোটা হয়।

১১নং মাখরাজ (তোয়া, তা, দাল)

১১নং মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি অক্ষর। এগুলো হলো তোয়া, তা, দাল। এই তিনটি অক্ষর উচ্চারণের সময় ১৩নং মাখরাজে যে তিনটি অক্ষর (সোয়াধ, সিন, যা) এবং ১২নং মাখরাজে ৩টি অক্ষর (জোয়া, জাল, ছা) অক্ষরের উচ্চারণ স্থানের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। এতে অক্ষরগুলোর উচ্চারণ বুঝতে সুবিধা হয়। ১১নং মাখরাজের ৩টি অক্ষর তোয়া, দাল, তা, উচ্চারণের সময় জীম, শিন, ইয়া অক্ষরের মাখরাজ বা উচ্চারণের উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে খেয়াল রাখলে ভাল হবে। ১১নং মাখরাজের তিনটি অক্ষর তোয়া, দাল, তা উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের এবং সম্মুখের ২টি দাঁতের গোড়া বা মাড়ির সঙ্গে লেগে যায়। অর্থাৎ এই তিনটি অক্ষর উচ্চারণকালে জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরের সামনের ২টি দাঁতের গোড়া ব্যবহৃত হয়।

দাল এবং তা' এর উচ্চারণ খুব সহজ। কিন্তু 'তোয়া' উচ্চারণ একটু কঠিন। তা' এর উপর জবর হলে উচ্চারণ 'তা' হয়। কিন্তু তোয়া এর উপর জবর হলে উচ্চারণ 'তা' হবে না। সেটা হবে তোয়া। উচ্চারণ হবে একটু মোটা স্বরে এবং মুখ কিছুটা গোল হয়ে আসিবে। মনে হবে সমগ্র মুখ থেকে অক্ষরটি উচ্চারিত হয়।

'তোয়া' এর উচ্চারণ বাংলা 'ত' এবং ইংরেজী 'টি' এর মতও নয়। এই অক্ষরের উচ্চারণটি একটু কষ্ট করে ওস্তাদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে।

১২নং মাখরাজ (সা, জাল, জোয়া)

উপরের দুই দাঁতের আগার অক্ষর হলো 'সা', 'জাল' ও 'জোয়া'। এই তিনটি অক্ষর উচ্চারিত হয় জিহ্বার অগ্রভাগ এবং সম্মুখের উপরের দাঁতের অগ্রভাগ দ্বারা। উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ সম্মুখের দুই দাঁতের আগায় লেগে যায়। 'সীন' উচ্চারণকালে জিহ্বার আগা নীচের দুই দাঁতে লাগে এবং তার বিপরীতে 'সা' উচ্চারণের সময় জিহ্বার আগা উপরের দুই দাঁতের আগায় লাগে। 'সা' এর আগের অক্ষর 'তা' উচ্চারণের সময় জিহ্বার আগা উপরের দাঁতের গোড়ায় লাগে।

'সা' 'জাল' ও 'জোয়া' এই তিনটি অক্ষরের উচ্চারণ আমার মনে হয় সবচেয়ে হালকা, সবচেয়ে নরম ও সবচেয়ে কোমল। জিহ্বার আগা এবং উপরের দাঁতের আগা দিয়ে অত্যন্ত হালকাভাবে এই তিনটি অক্ষর, উচ্চারিত হয়। এই তিনটি অক্ষরের মধ্যে 'জোয়া' অক্ষরের উচ্চারণটি অপেক্ষাকৃত কঠিন। 'জোয়া' উচ্চারণ করার সময় পুর বা মোটা করে উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু 'জাল' অত্যন্ত কোমলভাবে উচ্চারণ করতে হয়। অনুরূপ অক্ষর 'জ্বা' অপেক্ষাকৃত কঠিনভাবে উচ্চারিত হয় নিচের সম্মুখের দাত এবং জিহ্বার আগার সংযোগে।

'জোয়া' এবং জাল-এর উচ্চারণ অনেকটা একই রকম। রকম কিন্তু 'জোয়া' উচ্চারণের সময় মুখটা একটু গোল হয়ে যাবে। 'জালিম' শব্দের বানানে 'জোয়া' আছে। 'জোয়ার' উপরে যবর বা ফাতহা দিলে 'যা' উচ্চারণ না হয়ে 'জোয়া উচ্চারণ হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ জালিম শব্দটিকে আরবরা জালিম না বলে 'যোয়ালিম' এর ন্যায় অনুরূপ একটি শব্দ উচ্চারণ করবে। যেহেতু আরবীতে অকার বা ওকার নেই, তাই শব্দটি যোয়ালিম হবে না। জালিম শব্দের উচ্চারণ হবে জালিম এবং যোয়ালিম এর মাঝামাঝি একটি উচ্চারণ।

'সা' অক্ষরটি অত্যন্ত নরমভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু নিচের দাঁত এবং জিহ্বার সমন্বয়ে উচ্চারিত সীন এবং সোয়াদ অক্ষর দুটির ধ্বনি একইরূপ হলেও অপেক্ষাকৃত কঠিনভাবে উচ্চারিত হয়।

'সোয়াদ' 'সীন এবং জা এই তিনটি অক্ষরের মধ্যে সোয়াদ সবচেয়ে কঠিন। সীন মাঝামাঝি এবং 'স' এর উচ্চারণ হবে সবচেয়ে কোমল। 'সোয়াদ' এর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কঠিন বলা হলেও ইহা কঠিন হবে 'জোয়া' 'জাল' এবং 'সা' এর তুলনায়। কিন্তু 'ধোয়াধ' এবং বড় ক্বাফ ইত্যাদির ন্যায় কঠিন নয়।

যে কোনো ভাষার শব্দের সঠিক উচ্চারণ সম্বন্ধে সর্ব প্রথম এবং সর্বশেষ কথা হলো – সঠিক উচ্চারণ শিক্ষার প্রকৃষ্ট এবং সর্বোত্তম সময় শিশুকাল – যা শুরু হয় শিশুদের আধো আধো শব্দ উচ্চারণের সময় থেকে। যে কোনো ভাষার এমন কোনো উচ্চারণ যোগ্য ধ্বনি নেই যা কোনো স্বাভাবিক শিশু সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। পৃথিবীর যে কোনো ভাষার যত কঠিন উচ্চারণই হোক না কেন সে দেশের একটি সাধারণ শিশু সঠিক উচ্চারণ করতে পারবে কিন্তু অন্য দেশের ভিন্ন ভাষার ভাষাবিজ্ঞানী বা ধ্বনি বিশারদ মহা পন্ডিত তা সঠিকভাবে উচ্চারণ নাও করতে পারেন।

একটি অক্ষরের উচ্চারণ অন্য একটি হতে আলাদা করতে হলে অনুরূপ অক্ষরের উচ্চারণ কিভাবে এবং কোথা থেকে হয় তা স্মরণ রাখতে হবে। 'সা' এর বাংলা তেমন প্রতিশব্দ নেই। বাংলাদেশ, ভারত, ইরানে, তুরস্কে এই 'সা' 'স' এর মতন উচ্চারণ হয়। আমরা 'সা' এবং 'সীন' একই রকম উচ্চারণ করে ফেলি, যা ভুল। আরবেরা সঠিক উচ্চারণ করে।

মিশরী ও প্যালেস্টাইনীরাও ভুল করে। তারা 'সা' এর উচ্চারণ 'তা' এর মতন করে। নামাজের মধ্যে সালাসা রাকাতায় বলার সময় তারা 'তালতা রাকাতায়' উচ্চারণ করে। আমরা বাংলা অক্ষর 'স' দিয়ে 'সালাসা' উচ্চারণ করি, যা 'সীন' এর উচ্চারণ হয়ে যায়। 'সীন' এবং 'সা' এর উচ্চারণ লিখিতভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝানো সম্ভব নয়। কারীর নিকট থেকে উচ্চারণ শুনে 'সীন' এবং 'সা' এর মধ্যে উচ্চারণের কি পার্থক্য তা বুঝে নিতে হবে।

'সা' উচ্চারণের সময় বাতাস বের হবে। তবে সীন উচ্চারণের সময় মনে হয় বাতাস কম বের হবে।

'সা' 'জা' 'জোয়া' উচ্চারণের সময় মনে হবে যেন শুধু বাতাসই নয়, জিহ্বার থেকে বুদবুদ বের হতে পারে। বুদবুদ বের হয়ে যেতে পারে।

হজরত উসমানের নামের সঙ্গে 'সা' আছে। এই মোবারক সাহাবীর নাম আমরা ভুল উচ্চারণ করি। আল কোরাআনের পরই হাদিসের স্থান। হাদীস শব্দে 'সা' আছে অথচ অনর্গল নিঃসংকচিত্তে আমরা এ ভুল উচ্চারণ করে থাকি। তাই কেউ কেউ আরবী হাদীস শব্দটি বাংলায় লিখেন হাদীছ।

১৩নং মাখরাজ ('সায়াদ, সীন, যা)

জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা হলে যেভাবে থাকে "সোয়াদ", "সীন", "যা" উচ্চারণের সময় জিহ্বা সেভাবে থাকে। স্বাভাবিক জিহ্বা কি অবস্থানে থাকে ? মুখ ফাক করে রাখলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জিহ্বার মাথা দুই মাড়ির দাঁতের মাঝখানে দিয়ে একটু বের হয়ে আসে যা ঘুমের অবস্থায় হয়।

সাধারণতঃ জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের দাঁতের সাথে লেগে থাকে। বাড়ীর চারদিকে যেমন লোহার গ্রীল, দেওয়াল বা বেড়া থাকে, নিচের দাঁতগুলো জিহ্বার জন্য সেরূপ নিরাপত্তা হিসাবে কাজ করে। 'সীন', 'সোয়াদ' ও 'যা' উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ সম্মুখের দাঁতের, বিশেষভাবে সম্মুখের ২টি দাঁতের সঙ্গে লেগে যায়। মুখ ফাঁক হয়ে যাবে কিন্তু জিহ্বা এই তিনটি অক্ষর উচ্চারণের সময় দাঁতের সঙ্গে লেগে থাকবে।

'সীন' অক্ষরটির উচ্চারণ বাংলা 'স' এবং ইংরেজী 'এস' এর মত; 'যা' অক্ষরটির উচ্চারণ বাংলা 'য' এবং ইংরেজী 'জেড' এর মত। 'সোয়াদ' অক্ষরটির উচ্চারণ বাংলায় তেমন নাই তবে ইংরেজী ২টি 'এস' উচ্চারণ করতে যেমন শব্দ হয় তেমন হবে।

ইংরেজী শব্দ কিস্, মিস্, হিস্, উচ্চারণের সময় মনে হবে কিছুটা বাতাস মুখ থেকে বের হয়ে আসে।

'যা' উচ্চারণের সময় বাতাস বের হবে না। মনে হবে যেন কিছুটা বাতাস ভেতরে ঢুকছে। 'সীন' উচ্চারণের সময় কিছুটা বাতাস বের হবে তবে 'সোয়াদ' অপেক্ষা কম। 'সোয়াদ' উচ্চারণের সময় মুখ কিছুটা গোল হয়ে যাবে।

'সীন' উচ্চারণের সময় দাঁত একটু বেশি দেখা যাবে। 'যা' উচ্চারণের সময় দাঁত দেখা যাবে না। কিন্তু মুখ ফাঁক হয়ে যাওয়ার ফলে জিহ্বা কিছুটা দেখা যেতে পারে। এই তিনটি অক্ষর উচ্চারণের মধ্যে 'সোয়াদ' হলো অপেক্ষাকৃত কঠিন।

১৪নং মাখরাজ (বা, মীম, ওয়াও)

ঠোঁটের অক্ষর 'বা' 'মীম' উচ্চারণের সময় দু'টি ঠোঁট ব্যবহার হয়। 'ওয়াও' অক্ষরটিও ২ ঠোঁটের সাহার্যে উচ্চারিত হয়। দুই ঠোঁট এবং ২ ঠোঁটের মাঝখান থেকে এই তিনটি অক্ষর উচ্চারিত হয় বলা যেতে পারে। তবে 'ওয়াও' এর উচ্চারণ 'বা' এবং 'মীম' এর উচ্চারণ থেকে একটু আলাদা। 'ওয়াও' অক্ষরটি ইংরেজীতে ডাব্লিউ এর মত উচ্চারিত হয়।

তুর্কী, ইরানী এবং ভারতীয়রা ওয়াও কে অনেক সময় ইংরেজী 'ভী' অথবা বা বাংলা 'ব' উচ্চারণ করে। যেমন সুহরাওয়াদী শব্দটি বঙ্গীয় হিন্দুরা উচ্চারণ করে সোহরাবর্দী। কিন্তু জওহরলাল শব্দটি উচ্চারণটি ঠিকই উচ্চারণ করে কখনো জবাহরলাল উচ্চারণ করেনা।

বাঙ্গালী মুসলমানরা এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান আলীবর্দীর নাম সঠিকভাবে লিখতে বা উচ্চারণ করতে পারে না। বাংলার নাটকে উপন্যাসে সাহিত্য, সিনেমায় সর্বত্র দেখা যায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার মাতামহ ছিলেন আলীবর্দী খাঁন। এই ব্যক্তির আসল নাম আলী ওয়ার্দী খান।

'ওয়াও' উচ্চারণ করার সময় মুখ প্রথম সূক্ষ্ম গোল হয়, মাঝখানে একটু বড় ফাঁক হয়। আবার গোল হয়ে মুখ ছোট হয়ে যায়। অর্থাৎ ওয়াও উচ্চারণের তিন অবস্থায়ই দুই ঠোঁটের মধ্যে ফাঁকা থাকে। কিন্তু 'মীম' এবং 'বা' উচ্চারণের সময় কোন এক পর্যায়ে দুই ঠোঁট মিলে যায়।

'বা' উচ্চারণের সময় ঠোঁটের ভিতরের দিক থেকে অর্থাৎ ঠোঁটের যে অংশ ভিজা থাকে সে অংশ হতে উচ্চারিত হয়। কিন্তু 'মীম' উচ্চারিত হয় ২ ঠোঁটের অপেক্ষাকৃত শুকনা স্থান থেকে বা বাইরের অংশ থেকে।

১৫ নং মাখরাজ (ফা)

নিচের ঠোঁট উপরের দাত দিয়ে কাঁমাড়িয়ে উচ্চারণ করতে হয় আরবী অক্ষর 'ফা'। 'ফা' অক্ষরটির উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী 'এফ' অক্ষরের এবং বাংলা 'ফ' অক্ষরের মতন। 'ফা' এর উচ্চারণ বাংলা 'প' করলে ভুল হবে।

আরবীতে বাংলা 'প' এর কোন বিপরীত অক্ষর নাই। 'প' এর উচ্চারণ করতে হলে 'বা' এবং 'ফা' অক্ষর দিয়ে করতে হয়।

পাকিস্তান শব্দের উচ্চারণ আরবরা করবে বাকিস্তান অথবা ফাকিস্তান। ফাকী দেওয়ার চেয়ে বাকী রাখা অপেক্ষাকৃত ভাল। সেজন্য পাকিস্তান সরকার চেয়েছে আরবরা যেন তাদের দেশের নাম 'ফাকিস্তান' না করে 'বাকিস্তান' করে। আরবগণ এ অনুরোধ মেনে নিয়েছে।

'ফা' অক্ষরটি উচ্চারণের সময় উপরের দাঁতের আগা নিচের ঠোঁটের মাঝখানে বা পেটে লাগবে। মুখের চেহারাটা হবে বিরক্তি বা রাগে নিচের ঠোঁটের পেট মামড়ানর মতন। 'ফা' উচ্চারণের সময় মনে হবে মুখ থেকে কিছুটা বাতাস বেরিয়ে আসছে যেমন হয় 'সা' উচ্চারণের সময়।

১৬ নং মাখরাজ (স্বর বর্ণ)

'ওয়াও', 'আলিফ', 'ইয়া' এই ৩টি অক্ষর আরবীতে স্বরবর্ণ। এগুলো স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হয় এবং অন্য অক্ষরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উচ্চারণ দীঘায়িত করে।

উচ্চারণ দীর্ঘায়িত হওয়ার সময় যে শব্দ হয় এ শব্দটি অনেকটা মুখের খালি জায়গা থেকে উচ্চারিত। খালি জায়গা জিহ্বা এবং তালুর মাঝখানে।

আ, উ, ঈ উচ্চারণের সময় কোন বিশেষ স্থান হতে উচ্চারিত না হয়ে জিহ্বা, তালু, কণ্ঠনালী ইত্যাদির মাঝখান থেকে দীর্ঘায়িত স্বরের উচ্চারণ হয়। উচ্চারণের জন্য জিহ্বা দাঁতকে স্পর্শ করে না। জিহ্বা বাঁকা হয় না, মুখের কোন অঙ্গ অন্য অঙ্গকে স্পর্শ করে না বরং মুখ ও কণ্ঠনালীর মাঝখানে একটা হাওয়া বা বাতাসের সৃষ্টি হয়। এই অক্ষরগুলিকে দীর্ঘায়িত স্বর বা হরফে ইল্লাতী বরা হয়।

১৭নং মাখরাজ (গুন্নাহ্)

নাকের থেকে উচ্চারিত হয় 'মীম' এবং 'নুন'। এই ২টি অক্ষর ডাবল হয়ে গেলে একটু লম্বা স্বর সৃষ্টি হয়। অন্যান্য অক্ষর ডাবল হলে তাশদীদ বলা হয় কিন্তু 'মীম' এবং 'নুন' যদি ডাবল হয় তবে উচ্চারণটি নাকে বাজাইয়া করতে হয় – যেমন মি – ম্ – ম্ – ম্ – মা। লা ম্ ম্ ম্ ম্ ম্া। ই ন্ ন্ ন্ ন্ ন্ না। উপরের এই তিনটি শব্দের মধ্যে হসন্তযুক্ত ম্ এবং ন্ এর উচ্চারণের সময় নাক এবং কণ্ঠনালীর থেকে একরকম স্বর বের হয়। এই শব্দকে নাসিকামুল বা নাকের বাঁশির স্বর বলা হয়। আররীতে এই স্বরকে গুন্নাহ বলা হয়। এ উচ্চারণ হলো আরবী উচ্চারণের ১৭নং বা সর্বশেষ মাখরাজ।

আরবী অক্ষরগুলো উচ্চারণ করার সময় ১২টি অক্ষর চার গ্রুপে ভাগ করা যায়। প্রতিটি গ্রুপে ৩টি অক্ষর লিখে ১টি গ্রুপের ৩টি অক্ষরের সাথে অন্যান্য গ্রুপের অক্ষরের উচ্চারণের কি পার্থক্য তা তুলনা করে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলে উচ্চারণ শেখা সহজ হয়।

যেমন প্রথম গ্রুপে হলো ৩টি অক্ষর জীম, শীন, ইয়া। এই তিনটি শব্দে তালু এবং জিহ্বার মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয়।

উপরের তালুর শেষ প্রান্তেই আছে উপরের দাঁত। উপরের দাঁতের গোড়ায় জিহ্বা লাগিয়ে উচ্চারিত হয় দ্বিতীয় গ্রুপের তিনটি অক্ষর 'তোয়া' 'দাল' এবং 'তা'। এগুলো উপরের দাঁতের গোড়া হতে বা দাঁতের একটু একটু উচ্চস্থান হতে উচ্চারিত হয়। তৃতীয় গ্রুপের তিনটি অক্ষর হলো যোয়া, জ্বাল, সা। এগুলো উপরের দাঁতের আগা এবং জিহ্বার আগা হতে উচ্চারিত হয়। চতুর্থ গ্রুপের ৩টি অক্ষর 'সোয়াদ' 'সীন' ও 'যা' উচ্চারিত হয় জিহ্বার আগা নিচের দাঁতের মাঝখানে লাগিয়ে।

এই ৪টি গ্রুপের শব্দের মধ্যে আমরা দেখলাম, প্রথমে আসে উপরের তালুর মাঝখান, দ্বিতীয়তঃ উপরের দাঁতের গোড়া, তৃতীয়তঃ উপরের দাঁতের মাথা। চতুর্থতঃ নিচের দাঁতের গোড়া।

এই ৪টি গ্রুপের ১২টি অক্ষর এবং গলার ৬টি অক্ষর মিলিয়ে মোট ১৮টি অক্ষর। বাকী অক্ষরগুলোর মধ্যে ঠোঁটের অক্ষর ৪টি 'বা' 'মীম' ও 'ফা' 'ওয়াও'। আর থাকে ৮টি অক্ষর যেমনঃ- বড় কাফ, ছোট কাফ, 'দোয়াদ' লাম' 'নুন', 'রা' এবং 'আলিফ' এইগুলো একক স্থান থেকে উচ্চারিত হয়।

আরবী উচ্চারণের সময় কেউ মুখের সামনে তুলা রেখে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। দেখা যাবে অন্য ভাষা উচ্চারণের সময় তুলা যত বেশি নড়ে, তার চেয়ে বেশি নড়বে আরবী ভাষা উচ্চারণে সময়।

আরবী উচ্চারণের মধ্যে একটি জলদগম্ভীর বীরত্ব ব্যঞ্জক ভাব আছে। আরবী উচ্চারণের সময় বাংলা বা ফর্সীর মতন ফিস ফিস পাখীর কিচির মিচির এর মত শব্দ কম হয়। অনেক ক্ষেত্রে তরবারীর ঝনঝনানী বা বাঁশ ফাটার শব্দ হয়।

আরবী অক্ষর উচ্চারণের সময় মুখ থেকে বাতাস বের হয়। বাংলা উচ্চারণের সময় বাহিরের বাতাস মুখের ভিতরে ঢুকে বা সমান চাপে থাকে। যেহেতু আরবী অক্ষর উচ্চারণের সময় মুখের বাতাস বের হয়, তাই মুখ সব সময় পরিষ্কার রাখতে হয়। মেছওয়াক করতে হয়। যাতে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের না হয়।

নিজ ভাষার ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ হয়ে গেলে বয়স বাড়ার পর অন্য ভাষার উচ্চারণের বর্ণনা শুনে বা ঐ ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে বই প্রবন্ধ পড়ে সে ভাষার সঠিক উচ্চারণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে না। চাইনিজ এবং আরবী উচ্চারণ অতি কঠিন। কিন্তু বয়স্ক চাইনিজ এবং আরবগণ তাদের ভাষা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে, অন্য ভাষা নয়। একবার এক ধরনের ধ্বনি শুনতে ও উচ্চারণে অভ্যস্থ হয়ে গেলে অন্য ভাষায় এমনকি নিজ ভাষার শব্দ বা ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ অতি কঠিন হয়।

কুরআনের ভাষা বা জান্নাতের ভাষা সঠিক উচ্চারণের সঠিক সময় এবং সহজতম উপায় হলো মাতৃভাষা শিক্ষার পূর্বেই তাকে আরবী শব্দ এবং ধ্বনি শ্রবনে এবং উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ চেতনা এবং উপলব্ধি কি আমাদের আছে?

বিশ্বের যে কোনো দেশের মুসলিম শিশুকে তার মাতৃভাষার অক্ষর শিক্ষাদানের পূর্বেই আরবী অক্ষর উচ্চারণের শিক্ষা দিতে হবে। এ দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করতে পারেন না। মাতৃভাষার ছড়া, ইংরেজী রাইম অর্থ বুঝে শিশু মুখস্ত করে না। সুর, ছন্দ বা তাল থাকলে শিশুরা মায়ের কণ্ঠে শুনে শুনেই ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক উচ্চারণে অভ্যস্থ হয়। ঐ শিশুর সঠিক উচ্চারণের সম্ভাবনা বেশি যে শিশুর পিতা-মাতা অথবা শিক্ষকের উচ্চারণ সঠিক এবং শিশুকাল থেকেই স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে শিশুর মন প্রভাবিত করে সঠিক উচ্চারণ শিখিয়ে দিতে যথেষ্ট তৎপর হন।

ভাষা চর্চায় মহানবী (সা.)-এর আদর্শ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.)-কে মহান আল্লাহ্‌তা'য়ালা মানব জাতির জন্যে কল্যাণ ও সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারক হিসেবে তিনি ছিলেন মুসলমানদের এবং বিশ্বের সকল মানবের আদর্শ। কিন্তু, পিতা হিসেবে, স্বামী হিসেবে, সুরুচিশীল ও সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন ধর্মমত নির্বিশেষে সকলেরই আদর্শ। তাঁর ব্যবহার, আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, চাল-চলন যে কোনো রুচিশীল এবং সুন্দর জীবন যাপনে আগ্রহী ইয়াহুদী-নাসারা, কাফির পৌত্তলিকসহ্ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি অনুকরণীয় ও অনুসরনীয় সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলো।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সার্বজনীন আদর্শ

আজকাল আমরা মুসলমান হয়েও পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কৃষ্টি-সংস্কৃতি হিন্দু বা খ্রীষ্টানদের অনুকরণ করতে চাই। রাসূল (সা.)-এর সময় ইয়াহুদী-নাসারা-পৌত্তলিক আরবগণ আমাদের রাসূল (সা.)-কে রুচি, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য চেতনার মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিয়েছিল।

দুঃখের বিষয়, নামায-রোযার ব্যাপারে আমাদের 'উলামা-ই-কিরাম, ইমাম সাহেবান, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ রাসূলের (সাঃ) আদর্শ মানুষের সম্মুখে তুলে ধরতে যতটুকু সচেষ্ট, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবীকে রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে তুলে ধরতে ঠিক ততটুকু অমনোযোগী। ফলে, ধর্ম বিশ্বাসী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ও সংস্কৃতিতে আমাদের অনেকে হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং পাশ্চাত্যের অনুসারী।

ভাষা সম্বন্ধে রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ আমাদের সম্মুখে কী ? হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ শিশুকাল থেকে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

জ্ঞানের অনুপ্রেরণা

রাসূল (সাঃ) এমন কথা বলতেন না, যা তিনি নিজে করতেন না। কিন্তু এই সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম ছিল একটি মাত্র ক্ষেত্রে, তা হলো স্বাক্ষরতা অর্জন।

বদরের যুদ্ধে বন্দী প্রতিটি সৈনিকের মুক্তির শর্ত এই ছিল যে, তারা অন্ততঃ একজন নিরক্ষর মুসলিমকে লিখতে ও পড়তে শেখাবেন। জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ দিয়ে যত নির্দেশ বিশ্বনবী (সাঃ) জারী করেছেন, দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মনেতা তা করেননি। কিন্তু, তিনি নিজে নিরক্ষর বা উম্মী ছিলেন। এ এক রহস্য। তা-ই ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শিক্ষক ছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং নিজে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ছিল তাঁর পাঠের উপকরণ। তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি দেখতেন, নিরীক্ষা করতেন, গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

আল্লাহ্ ব্যতীত রাসূলের (সাঃ) অন্য কোনো শিক্ষক থাকবে, তা আল্লাহ্র অভিপ্রেত ছিল না। যিনি হবেন মানবতার শিক্ষক, তাঁকে হতে হবে ত্রুটিশূন্য। মানুষের মধ্যে এমন কোনো শিক্ষক হতে পারেন না, যিনি ত্রুটিহীন।

আমাদের নবীর পুত্র ছিল, কন্যা ছিল, বন্ধু ছিল, সহযোগী ছিল, শত্রু ছিল। কিন্তু কোনো শিক্ষক ছিল না। রাসূলকে উম্মী বা নিরক্ষর রাখার হাকীকত আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.)-কে নিরক্ষর উম্মী নবী বলে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিরক্ষর থাকুন এটাই ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা। এই উম্মী, নিরক্ষর নবীর ভাষা জ্ঞান কেমন ছিল ?

যুগনায়ক

যুগের সবচেয়ে আধুনিক, প্রগতিশীল এবং সমকালীন শিক্ষক শ্রেণী অপেক্ষা উন্নততর হওয়া নবীদের সুন্নাত। আল্লাহ্র নবীগণ ছিলেন নিজ নিজ যুগের সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং আধুনিক মানুষ। তা না হলে অন্যেরা তাদের আদর্শকে অনুকরণীয় হিসেবে গ্রহণ করবে কেন ? আল্লাহ্ নবীদেরকে ঐসব গুণে বিভূষিত করেই পাঠিয়েছেন, যে গুণাবলীতে সে যামানার লোকেরা উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

হযরত দাউদ (আ.)-এর যুগে জনগণের মধ্যে গান বাজনার চর্চা হতো খুব বেশি। সে এলাকার লোকদের মধ্যে অভাব-অনটন ছিল না। তাঁরা অবসর সময় গান-বাজনার চর্চা করতেন এবং সুর সাগরে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকতেন।

দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ এমন সুন্দর কণ্ঠ এবং সুমধুর সুর দিয়ে পাঠালেন যে তিনি যখন আল্লাহ্র কালাম পাঠ করতেন এবং লোকদেরকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতেন, তখন শুধু মানুষ কেন, জমিনের জীব-জন্তু ভীড় জমাতো, আকাশে উড়া পাখিও নেমে আসতো।

ব্যাবিলন, এশিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে অত্যাধিক ধনশালী হয়ে উঠেছিল। ভূমধ্য সাগর এবং আরব সাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় সামুদ্রিক জাহাজ শিল্প ছিল খুবই উন্নত। আল্লাহ্ হযরত নূহ (আ.)-কে প্রদান করেন মানব ইতিহাসের বৃহত্তম জাহাজ তৈরীর জ্ঞান।

কারুণের অর্থ সম্পদ তো উপকথায় পরিণত হয়েছিল। নেবুচাঁদ নযর, ফিরাউন, সাদ্দাদ, নমরুদের অর্থ-সম্পদ এবং রাজক্ষমতার তখন মানুষ ছিল বিমুগ্ধ এবং হতবাক। আল্লাহ্ হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পাঠালেন মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং ঐশর্য্যশালী সম্রাট করে।

হযরত মুসা (আ.)-এর যুগে মিসরীয়রা যাদুবিদ্যায় ছিল অত্যধিক পারদর্শী। যাদুর মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে ভীতিপ্রদ যাদু ছিল সাপ বানানো। মূসা (আ.)-কে আল্লাহ্ দিলেন লাঠিকে সাপ বানানোর ক্ষমতা।

হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্র ছিল বিশ্বে অতি উন্নত। ইউনানী বা গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাব শুধু সে যুগে নয়, এ বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশেও অনুভূত এবং সুস্পষ্ট। রোগ নিরাময় করার মাধ্যমেই ছিল সে যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম বিকাশ। তাই আল্লাহ্ ঈসা (আ.)-কে দিলেন হাতের স্পর্শে অন্ধকে দৃষ্টিদানের ক্ষমতা। খঞ্জকে পদদান, কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময়, এমন কি মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা।

আরবদের ভাষণের উৎকর্ষতা

রাসূল করীম (সা.)-এর যুগে আরবে ভাষা এবং কবিতা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। আরবী ভাষায় এক-একটি শব্দের যতগুলো প্রতিশব্দ আছে, বিশ্বের অন্য কোনো ভাষায় তদ্রূপ নেই। 'এক ঘোড়া' শব্দটিরই শোনা যায় ৯০০ প্রতিশব্দ ছিল।

আরবীয়রা ছিল স্বভাবে কবি। সাবয়া মু'য়াল্লাকা-কালোত্তীর্ণ হয়ে আজও শিল্প-সাহিত্যিকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর চাইতে চমকপ্রদ কাহিনী বিশ্বের কোনো ভাষায় আজও সৃষ্টি হয়নি।

নবী পরিবারের লোকেরা কবি স্বভাবের ছিলেন। নবীর (সা.) মৃত্যুতে বিবি আয়েশা (রা.) ও বিবি ফাতেমা (রা.)-এর বিলাপ কালোত্তীর্ণ শোক গাঁথায় পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মচারীকে লেখা হযরত আলীর (রা.) এক একটি পত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের স্বাক্ষর বহন করে।

বিশ্ব গ্রন্থ আল কুর'আন

আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থ আল কুর'আন শুধুমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়, আরবী ভাষার উজ্জ্বলতম সাহিত্য।

বিশ্বের আর কোনো গ্রন্থ নেই, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করা হয়। ছন্দের মিল থাকলে, ছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে কোন ছড়া মুখস্থ করা যত সহজ হয়, ছন্দহীন গদ্য কাব্য মুখস্থ রাখা তত সহজ নয়। ছন্দ-মাধুর্যের জন্যেই কুর'আন মুখস্থ করা সহজতর হয়েছে।

আরবদেশে বহু খ্রীস্টান কুর'আন তিলওয়াত করে বা শ্রবণ করে দিনের কর্মসূচি শুরু করে। কারণ, তাতে মানসিক প্রশান্তি আসে। আমরা কুর'আন তিলাওয়াত করি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে। আরবেরা কিন্তু তা উপভোগ করে। আরব দেশে একাধিক রেডিও স্টেশন আছে, যা থেকে সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী শুধু কুর'আন তিলাওয়াতই প্রচার করা হয়। কায়রোর একটি রেডিও স্টেশন হতে দিন-রাত সব সময় শুধু কুর'আন তিলাওয়াত করা হয়, আর সব সময়েই কিছু না কিছু শ্রোতা তা শুনে।

বাংলা সাহিত্যে কোন কোন কবির সঙ্গীত খুব শ্রুতিমধুর এবং কালজয়ী। এ সঙ্গীত যতোই শ্রুতিমধুর হোক না কেন সারাক্ষণ রেডিওতে প্রচার করা হলে শ্রোতারা শুধু বিরক্তই হবে তা নয়, রেডিও বন্ধ করে দিতে চাইবে।

সূরা আর-রহমানের ছন্দ-মাধুর্যের কথা বাদই দেয়া যাক, সূরা ফাতিহা একজন মুসলমান জীবনে কতবার পাঠ করে ? কেউ কি কখনও সূরা ফাতিহা পড়ে ক্লান্ত হয়েছে? বোধ হয় না। এর কারণ শুধু যে অন্তর্নিহিত বাণী তা নয়; এতে রয়েছে কাব্যসুধা – এ অমৃতের নেশা কাটে না। এ সূরার বাংলা অনুবাদ হলে ভাবার্থ হয়তো ঠিক থাকতে পারে, কিন্তু কাব্যমাধুর্য কোথায় পাওয়া যাবে ?

আল কুর'আন দুনিয়ার শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ নয়, কাব্যগ্রন্থও বটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর আলিমের ভুল ব্যাখ্যা এবং ফতোয়ার ফলে বাংলার মুসলিমগণ থেকে গেছে ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি উদাসীন।

কাব্যানুরাগী আরব সমাজে আবির্ভূত নবী মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন আরবের সবচেয়ে সুন্দর এবং শুদ্ধভাষী। নবী করীম (সা.) শুধু শুদ্ধ ভাষায় নয়, বরং বিশুদ্ধ ভাষায় কথা

বলতেন। সারা জীবনে তিনি একটি মিথ্যা বাক্যও উচ্চারণ করেননি। আর সারা জীবনে বিশ্বনবী একটি অশুদ্ধ শব্দ বা বাক্যও উচ্চারণ করেননি। শিশুকালেও আমাদের নবী বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনে লোকজন আশ্চর্য ও বিমোহিত হতো। জিজ্ঞেস করতো, ছেলেটি কোন পরিবারের।

আমাদের মহানবী (সা.) কথায়, আচরণে, পোশাকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন এবং বিশুদ্ধ থাকা পছন্দ করতেন। তাঁর জামা-কাপড়ে কোন দিন কেউ কোন দাগ দেখেনি। তাঁর পোশাক তাঁর চরিত্রের ন্যায়ই নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁর ভাষাও ছিল বিশুদ্ধ এবং উচ্চারণ ছিল সুস্পষ্ট।

মহানবীর (দঃ) বাচন ভঙ্গি

ভাষায় বিশুদ্ধতা এবং উচ্চারণে সুস্পষ্টতা ছিল নবী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর কথা এমন স্পষ্ট ছিল যে, যারা তাঁর কাছে বসে থাকতেন, তারা তাঁর কথাগুলো শুনে মুখস্থ করতে পারতেন, লিখে নিতে পারতেন। হাদীস সেভাবেই প্রণীত হয়েছে। তিনি বলেছেন, অন্যরা শুনেছেন, হেফজ করেছেন এবং লিখেছেন।

তখনকার দিনে কাগজ-পেন্সিল সহজলভ্য ছিল না। এত অসুবিধা সত্ত্বেও রাসূলে করীম (সা.)-এর বাক্য এমনভাবে উচ্চারিত হতো বা বলা হতো যাতে অন্যরা তা লিখে নিতে পারতেন। তিনি দ্রুত বাক্য বলতেন না। তাঁর কথা বলার ধরণ এমন ছিল যে, প্রতিটি বাক্য নয়; প্রতিটি অক্ষর অন্যরা বুঝতে পারতেন। আরবীতে 'আইন' 'হামযার' মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরো বাক্যের মধ্যে কোন অক্ষরটা উচ্চারিত হচ্ছে, তা শ্রোতারা স্পষ্ট ধরতে পারতেন। অর্ধেক কথা মুখের ভিতরে, বাকী অর্ধেক মুখের বাইরে – এভাবে মহানবী (সা.) কথা বলতেন না। কথা বলার উদ্দেশ্য অন্যের কানে তা পৌঁছিয়ে দেয়া। কথা বলার সময় আস্তে কথা বলা হলে অন্যের বুঝতে কষ্ট হয়। অন্যকে কষ্ট দেয়া অসুন্দর আচরণ এবং বেয়াদবি।

ইলমুল কিরাত বা মাখরাজ আমরা কিভাবে পেলাম? আরবী ধ্বনি বিজ্ঞান অতি উন্নত। এর উৎস কি ? এর উৎস হলো সুন্নাহ। কারণ, রাসূল (সা.) শুদ্ধভাবে কথা বলতেন। স্পষ্ট উচ্চারণ করতেন।

ভাষণ ভঙ্গি

আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-এর ভাষণ পদ্ধতি এমন ছিল যে, যত বড় মাহফিল হতো তাঁর স্বর তত উচ্চ হতো। কথা বলার সময় তিনি স্বর তত উচ্চ করতেন যাতে সবচেয়ে পিছনে যে বসে আছেন, তার মনে হত যে নবী করীম (সা.) তার সম্মুখে বসে কথা বলছেন। তিনি দু'চারজনের সামনে কথা বলেছেন আর আরাফাত ময়দানে লক্ষ লোকের মাঝে বক্তৃতা করেছেন। তখন মাইক ছিল না। তা সত্ত্বেও তার কোন কথা বোঝেনি এমন লোক ছিল না। যে সমস্ত গুণ একটি মানুষের ব্যক্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে, তাঁর মধ্যে রয়েছে শুদ্ধ ভাষণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ।

শুদ্ধ ভাষার সুন্নাহ

আমাদের নবী (সা.) তাঁর মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলতেন এবং সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন। মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলা আমাদের নবীর (সা.) সুন্নাত। বাম হাতে খেলে

একটা সুন্নাতের বরখেলাফ করা হল। অনুরূপভাবে একটি অশুদ্ধ শব্দ এবং বাক্য উচ্চারণ করলাম, সুন্নাতের একটি খেলাফ করলাম। আমরা অনেকে মুখ খুললেই সঙ্গে সঙ্গে সুন্নাতের বরখেলাফ শুরু করি।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, আরবী অশুদ্ধ বলা সুন্নাতের বরখেলাফ। অন্য ভাষা অশুদ্ধ বলা সুন্নাতের বরখেলাফ নয়। এটা কিন্তু ভুল। আমাদের নবী (সা.) ডান হাত দিয়ে খেজুর খেয়েছেন। যদি কেউ বলে যে, বাম হাত দিয়ে খেজুর খাওয়া সুন্নাতের বরখেলাফ, কিন্তু আম আর লিচু বাম হাত দিয়ে খাওয়া সুন্নাতের বরখেলাফ নয়, তা ভুল হবে।

শুদ্ধ ভাষণ এবং দাওয়াত

শ্রোতাদের উপর বক্তৃতার প্রভাব অনস্বীকার্য। জনগণকে বোঝাতে হবে মাতৃভাষায়, শুদ্ধ ও সুন্দর উচ্চারণে। বড় নেতাদের একটা বড় গুণ হল সুন্দর বক্তৃতা দেয়ার দক্ষতা। ভাষার উপর দখল থাকলে বক্তব্যের প্রভাব শ্রোতার উপর অনেক বেশি হয়। মাতৃভাষার উপর দখল না থাকলে ভাল বক্তা হওয়া যায় না।

মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব

মুসলিম জীবনে 'আলিমদের প্রভাব প্রচন্ড এবং অত্যন্ত গভীর। আরবীয়, ইরানী, তুর্কীরা তাদের মাতৃভাষার চর্চা যতটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারেন, আমরা আমাদের অবচেতন মনের সংস্কারের ফলে ততটুকু পারিনি।

ভারত বিভাগের পর ভাষা সমস্যা এবং ভাষা আন্দোলন এ দেশের ছাত্র, শিক্ষিত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের যতটুকু আলোড়িত করেছে, অন্য কোন সমস্যা বা আন্দোলন ততটুকু করেনি। কিন্তু 'উলামা-ই-কিরাম বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের প্রতিকী দিক সমূহে শিরকী প্রবণতা লক্ষ্য করে ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। তাই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজও তাদের প্রতি উদাসীন।

রাসূল (সা.) নিজ মাতৃভাষায় একটি অশুদ্ধ বাক্য সারা জীবনে উচ্চারণ করেননি। পরম পরিতাপের বিষয়, লক্ষ লক্ষ 'উলামা-ই-কিরামের মধ্যে সর্বক্ষণ মাতৃভাষা শুদ্ধ বলেন এরূপ হাজার হাজার আলিম সারা বাংলায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা সুন্নাত। দুঃখের বিষয় আমরা দ্বীনদার মুসলিমগণ অনেকেই এ সুন্নাত পালন করি না। এ অবস্থার নিরসনকল্পে 'উলামা-ই-কিরাম এবং ইমাম সাহেবানকে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধিকতর উৎসাহী হতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আল-আরাফাহ্ (ইংলিশ মিডিয়াম) মাদ্রাসা

তুরস্ক পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কোয়ার্টার পর্যন্ত মুসলিম শাসনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। সারা মুসলিম বিশ্ব থেকে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য বহু শিক্ষার্থী ইস্তাম্বুলে উপস্থিত হতো। প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেয়ার সুযোগও ইস্তাম্বুলে আগত উচ্চাকাঙ্খী যুবকদের বেশি ছিল। উসমানিয়া খিলাফতের চারিদিকে যারা ঘুর ঘুর করতো – তাদের ভাগ্য অধিকতর সুপ্রসন্ন হতো চাকুরী-বাকুরী, আমীর-উমরাহ্, উজির-নাজির হওয়ার ক্ষেত্রে ।

তুরস্কের মিশনারী শিক্ষার প্রভাব

মুসলিম খিলাফতকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামের দুশমনেরা এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে মুসলিম বিশ্বে শুরু হয় অধঃপতন, অন্ধকার ও জাহেলিয়াতের যুগ। জিন্দা পীর আওরঙ্গজেব আলমগীর ইন্তেকাল করেন ১৭০৭ সনে। তাঁর ইন্তিকালের পর জাতীয় জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভোগ বিলাস, আত্মঘাতী নীতি, শত্রুতার জটাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এ দেশীয় কতিপয় উচ্চাবিলাসী মুসলিম এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের সহায়তায় বিদেশী মিশনারীগণ।

মিশনারীদের উদ্ভাবিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল উন্নত মানের এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাশের অনুকূল। তারা তুরস্কে উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় সিলেবাস ছিল মুসলিম মাদ্রাসার সিলেবাসেরই অনুরূপ। যেমন– নটরডেম কলেজ, হলিক্রস কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ডের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসই অনুসরণ করে থাকে। সিলেবাসে বর্ণিত শিক্ষা অপেক্ষা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য আরো কিছূ গুণাবলী ও দক্ষতা অর্জন করে।

তুরস্কের ইসলামী মাদ্রাসা সমূহ অতি অদক্ষ, অকর্মন্য শিক্ষিত ব্যক্তি উৎপাদন করতো। অন্যদিকে মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্রত মিশনারী স্কুলের শিক্ষার্থীরা সনাতন শিক্ষার সাথে সাথে অর্জন করতো কঠোর শ্রমশীলতা, সুস্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলাবোধ, যুক্তিবিদ্যা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা ও নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা অতি সহজেই খলিফার সেনাবাহিনীতে প্রবেশের সুযোগ পেতো এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই দেখা যেতো – মিশনারী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন পেশায় নিজস্ব প্রতিভা,

দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করে কর্মক্ষেত্রে উচ্চ শিখরে আরোহণ করতেন। পরবর্তীতে এ সব দক্ষ ব্যক্তিরাই নেতৃত্বের আসন পেয়ে যেতো।

মিশনারী পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোর সিলেবাস ইসলামী হলেও পরিবেশ, মন-মানসিকতা, মূল্যবোধ ছিল ধর্ম বিরোধী ও যুক্তিহীন। এসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী ক্রিয়াকর্ম যেমন – নারী-পুরুষে অবাধে মেলামেশা এবং অবৈধ যৌনাচার, উদার মদ্যপান, রং-ঢং, বেলেল্লাপনা, পাশ্চাত্য বেশ-ভূষা এবং আচার-আচরণে অভ্যস্থ করে তোলে।

কামাল আতাতুর্ক যখন ইসলামী মুখোশধারী উসমানীয়া খিলাফত উচ্ছেদ করে ইসলাম বিরোধী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্ন এবং পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ বিপ্লবের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, তখন তার এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহানুভূতিশীল ও সমর্থক সহকর্মী পেতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি।

তুরস্কের তৎকালীন ব্যবসা, বাণিজ্য, রাজনীতি, আমলাতন্ত্রে ঘুনে ধরা খিলাফত উচ্ছেদে সহযোগিতা করার জন্য কর্মক্ষম ব্যক্তিত্ব পাওয়া কষ্টকর হয়নি। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার ফলে তুরস্কে ধর্মহীনতা তথা ধর্মনিরপেক্ষতার যে সর্বনাশা বীজ সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়েছিল তা আজ বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং তুরস্কের জনগণ এর খেশারত দিচ্ছে বংশ পরমপরায়।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের প্রয়োজন বর্তমান সরকারী সিলেবাস রেখেই ইসলামী চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদের উন্মেষ বা উন্নয়ন ঘটানো। যারা বিশ্বাসে, প্রত্যয়ে হবে ঈমানদার মুসলিম, সংস্কৃতিতে হবে সুন্নাহর অনুসারী এবং জান্নাতমুখী। কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি কুটনীতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন। এ ধরনের যোগ্য মানুষ আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় দূরের কথা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায়ও তৈরী হচ্ছে না। আল্লাহ্ মুসলমানকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব মানবের আদর্শ, পথ প্রদর্শক হিসেবে। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমান বিশ্বে মুসলমানেরা অন্য জাতির অনুকরন ও অনুসরণ করছে। মুসলমানেরা স্বীয় উন্নত আদর্শ পরিত্যাগ করার ফলে নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে নির্জীব ও পরগাছা জাতিতে পরিণত হয়েছে। অন্য জাতি আজ বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করছে।

প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের যোগ্যতা

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র মালয়েশিয়া গণতান্ত্রিক দেশ বলে খ্যাত। উদীয়মান নেতা আনোয়ার ইব্রাহীমকে নিয়ে মুসলিম বিশ্বের সফলতম গণনেতা মাহাথির মোহাম্মদ যা করলেন এবং জনগণের ভোট সংগ্রহ করলেন তাতে মনে হয় না সে দেশে সঠিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের রায় প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বের একটি মুসলিম দেশেও ইসলামী খেলাফতের আদর্শ দূরের কথা, পাশ্চাত্য শির্কী মোনাফেকী মার্কা গণতন্ত্রের শুধু খারাপগুলো গ্রহণ করছি। ভালোগুলো বর্জন করছি। ফলে প্রকৃত গণতন্ত্রের আদর্শ কখনো শিকড় গাড়তে পারেনি। আজও মুসলিম বিশ্বের শাসন ব্যবস্থা চলছে ফেরাউনী ও নমরুদী মূল্যবোধ ও পদ্ধতিতে। যে যায় লংকায় সে হয় রাবণ। গণতন্ত্রের কথা বলে যে সমস্ত মুসলিম নেতারা ক্ষমতায় আসেন, মসনদে বসেই তারা হয়ে উঠেন এক একটি নমরুদ বা ফেরাউন। তাদের রক্ষক হন সিনিয়র প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাগণ।

মসনদের কাছে থেকে মসনদের মোহ জেনারেলদের মধ্যে তৈরী হয়। আগামী ৫০ বছর পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের বিরাট ভূমিকা এবং অবদান থাকবে। চাকুরী যদি করতে হয় – এমন চাকুরীটি করা ভাল যাতে মনিব হওয়া যায় বা মনিবের জাতে উঠা যায়। এই বাস্তবতা যতই রূঢ় হোক না কেন স্বীকার করে নেয়া ভালো।

আল-আরাফাহ্ মাদ্রাসার শিশুদেরকে ক্যাডেট কলেজ এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দেয়ার মন-মানসিকতা, সচেতনতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। তা করা হবে খেলাধূলা, প্যারেড, প্রতিরক্ষা সংস্কৃতি অনুসরণের মাধ্যমে। প্রতিরক্ষা সংস্কৃতির একটি মূল বিষয় হলো শৃঙ্খলা, আদেশ প্রতিপালনে নিষ্ঠা ও নেতৃত্বের বিকাশ।

জীবনের যে ক্ষেত্রেই থাকুক না কেন শুধুমাত্র অনুসারী, অনুগামী নয়; নেতা হিসেবেই থাকতে হবে – এই প্রবণতা এবং যোগ্যতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টির চেষ্টা করা যেতে পারে। বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন গ্রুপ করে প্রিফেক্ট, মনিটর সিস্টেমের মাধ্যমে এবং অন্যভাবে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে।

উচ্চারণ

জীবনে সাফল্য ও নেতৃত্বের জন্য ভাষা-জ্ঞান, প্রকাশ ভঙ্গী এবং উচ্চারণের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে দীর্ঘ সময় লাগে। কিন্তু সঠিক উচ্চারণ অল্প সময়ের এবং অল্প বয়সে সম্ভব। শিশু বয়সে অশুদ্ধ উচ্চারণ রপ্ত হয়ে গেলে সারা জীবনের চেষ্টায়ও তা আর ঠিক করা যায় না।

এদেশ থেকে যারা লেখাপড়া শেষ করার পর ইংল্যান্ড, আমেরিকায় যান, ২০-২৫ বছর সেখানে থাকলেও তাদের উচ্চারণে সাধারণতঃ অতি স্বল্প এবং প্রান্তিক পরিবর্তন হয়। উচ্চারণের ধরন শুনেই বুঝে নেয়া যাবে – তিনি একজন বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী বা উপমহাদেশীয়।

আমেরিকা, ইংল্যান্ডে যারা সস্ত্রীক লেখাপড়া করতে যান অথবা যারা সেখানে থাকেন – তাদের ছেলে-মেয়ে কথা বলা শিক্ষার পর ৩-৪ বছর আমেরিকা, ইংল্যান্ড এর কিণ্ডারগার্টেনে পড়ালেখা করে। আসলে তাদের উচ্চারণ হয় ইংরেজ আমেরিকানদের মতো। উচ্চারণ ঠিক করার প্রকৃষ্ট সময় হলো শিশুকাল।

আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় শিশুদের উচ্চারণের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হবে, যাতে তারা ইংরেজদের মতো ইংরেজী বলতে পারে। আরবদের মতো আরবী উচ্চারণ করতে পারে। শান্তি নিকেতনের বাঙ্গালীদের মতো বাংলা উচ্চারণ করতে পারে।

অডিও ভিডিও ক্যাসেট

আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে অডিও-ভিডিও ক্যাসেটের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক হারে করা হবে। শিশুরা বক্তৃতা শুনা অপেক্ষা টেলিভিশন দেখতে ভালবাসে। পাঠ্য পুস্তকগুলো সম্পূর্ণভাবে অডিও ভিডিও করে নেয়া হবে। সঙ্গত সময় পর পরই ভিসিপি, ভিডিও প্লেয়ার ছেড়ে দেয়া – যা দেখতে শিশুরা আগ্রহী ও মনযোগী। অডিও-ভিডিও ক্যাসেটগুলো অত্যন্ত চিন্তা ভাবনা করে সংগ্রহ এবং প্রণয়ন।

আমি এক সময় ওয়াশিংটন মহানগরীর অর্লিংটন শহরে স্থাপিত আমেরিকান Foreign Service Institute এ বাংলার শিক্ষক ছিলাম। যদিও আমি ভাষা শিক্ষক ছিলাম কিন্তু আমাকে ক্লাসে সাধারণত কথা বলতে দেয়া হতো না। ক্লাসে যদি শিক্ষক কথা বলতে না পারেন, তবে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা বা অবদান কী হতে পারে ?

ইউ. এস. এ Foreign Service Institute এ ভাষা শিক্ষার সমস্ত পুস্তক ভাল উচ্চারণের শিক্ষক দ্বারা অডিও করে রাখা ছিল। ১৯৭২ সালে ভিডিও ততবেশী প্রচলিত হয়নি। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো – বিভিন্ন ব্যক্তির বাংলা উচ্চারণ এত ভিন্ন ভিন্ন যে – কোনো একটি উচ্চারণ অনুসরণ করলে বিদেশীদের জন্যে অন্য উচ্চারণের শব্দ বুঝা কষ্টকর। কর্তৃপক্ষ তাই ভাষা ক্লাসে কোনো একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণ প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা আয়ত্ব করিয়ে নিতে চাইতেন।

আমেরিকানদের মতে বাংলাভাষার ক্ষেত্রে পৌরহিত্য এবং ইমামতি করছে, অন্ততঃ এ পারের বাঙ্গালীরা নয় বরং ওপারের বাঙ্গালীরা। তাই আমেরিকানগণ ওপারের বাঙ্গালী দ্বারা বিভিন্ন স্তরের পুরো বই অডিও ক্যাসেট করে রেখেছিল। শিক্ষকের উপস্থিতিতে ক্যাসেট প্লেয়ার চালিয়ে দেয়া হতো। ছাত্র শিক্ষক উভয়েই পুস্তকের রেকর্ড করা পড়া শুনতেন। রেকর্ডের মধ্যে শব্দ এবং বাক্যের পরে গ্যাপ বা বিরতি থাকতো, যে সময় ছাত্র উচ্চস্বরে প্রতি উচ্চারণ করতে পারতো।

এরূপ ব্যবস্থায় শিক্ষকের প্রয়োজন বা ভূমিকা তেমন কিছু থাকে না। কিন্তু ছাত্র যদি কোন কিছু বুঝতে অসুবিধায় পড়েন এবং কোন প্রশ্ন করতে চান, তবে শিক্ষক ক্যাসেট প্লেয়ার ষ্টপ করে, প্রশ্নসারী ছাত্রের বক্তব্য শুনবেন, জবাব দিবেন এবং বিষয়টি বুঝিয়ে দিবেন। এটাই শিক্ষকের মূল ভূমিকা।

হস্তাক্ষর

উচ্চারণের ন্যায় হস্তাক্ষরও সুন্দর অসুন্দর করার প্রকৃষ্ট সময় হলো শিশুকাল। যে শিশুর হস্তাক্ষর শিশুকালে অসুন্দর হয়, তার হাতের লেখা উন্নত করার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় সুন্দর হস্তাক্ষরের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দেয়া হবে – শিশু যাতে অন্ততঃ ইংরেজী, বাংলা, আরবী শ'খানেক অক্ষর সুন্দর এবং সুস্পষ্ট এবং সঠিক ভাবে লিখতে পারে। সুচিন্তিত এবং দৃঢ় নীতি থাকলে শিশুদেরকে Vowel চিহ্নসহ ২০০টি অক্ষর লিখতে শিখিয়ে দেয়া খুব কঠিন কাজ নয়।

কুংফু, ক্যারাত, শারিরীক কসরত

কুংফু, ক্যারাতসহ নতুন নতুন কিছু শারীরিক ব্যায়াম ইদানিং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এগুলো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিশুরা কাল্পনিক রহস্য সিরিজের ছবি খুবই পছন্দ করে। কল্পিত বীরের ক্রিয়াকর্ম দেখে তারাও মনে মনে তাদের মতো হতে চায়।

আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় বিভিন্ন ধরনের খেলনা বন্দুক, বক্সিং গ্লোব, কৃত্রিম যুদ্ধ উপকরণ রাখা হবে, যা ব্যবহারে শিশুরা অত্যন্ত আনন্দ পাবে। তবে এগুলোর মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হবে। যেমন - দৌড়া-দৌড়ি, ধস্তাধস্তি করে এসে একটি যোগ বা বিয়োগ অংক করে নেয়া। আবার দৌড় দিয়ে আরেক বার এসে একটি বাক্য বোর্ডে লিখে নেয়া। বিভিন্ন ভাবে পড়া এবং খেলাধুলাকে ইন্টেগ্রেট করা হবে।

যানবাহন ও খেলনা

বিভিন্ন ধরনের খেলনা যানবাহন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় একটি খেলনা মিউজিয়াম থাকবে। খেলনাগুলো খুব শক্ত হবে। কারণ এগুলো ছোড়াছুড়ি করলেও যাতে নষ্ট না হয়। যে সমস্ত খেলনা ব্যবহারের সময় শিশুরা শারীরিক ভাবে আহত হবার সম্ভাবনা থাকে, তা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করতে দেয়া হবে।

ট্রাইসাইকেল

শিশুরা যানবাহন জাতীয় খেলনা খুবই পছন্দ করে। ব্যাটারী দিয়ে চালিত খেলনা দেখা অপেক্ষা ক্ষুদ্র যানবাহনে উঠতে পারলে শিশুরা বেশি আনন্দ পায়। এ ধরণের যানবাহনের খেলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হবে।

বেতন ও ব্যয়

পরিকল্পিত উন্নত মাদ্রাসা স্থাপন সময় ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ব্যয়ের কথা চিন্তা করে বসে থাকলে চলবে না। শুরু করতে হবে। যোগ্য শিক্ষক পাওয়া আরো কষ্টকর। আল-হেরা কিণ্ডারগার্টেনটি ভালোই চলছে। আবাসিক শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ফি ৫০,০০০ টাকা (১৯৯১)। আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় শিক্ষার মান অবশ্যই আল-হেরা ক্যাডেট স্কুল থেকে উন্নততর করার লক্ষ্য রাখতে হবে।

আবাসিক, অনাবাসিক

আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসা যে উদ্দেশ্যে করা হবে – তা অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পূর্ণ করা সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই আবাসিক করতে হবে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে অনাবাসিকভাবে শুরু করা যেতে পারে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো (১) সুস্থ দেহ গঠন, (২) জ্ঞানের ক্ষুধা সৃষ্টি ও বিকাশ (৩) সঠিক মন-মানসের উন্মেষ, (৪) আত্মার আদর্শ ভিত্তিক উন্নয়ন ও (৫) জান্নাত প্রাপ্তির লক্ষ্যে আমল-আখলাক গঠন। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এ পাঁচ উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন অতি কষ্টসাধ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শারীরিক ব্যায়াম, অনুশীলন এবং খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকার কারণে শিশুদের মজবুত স্বাস্থ্য গড়ে উঠে না।

পরীক্ষায় পাশই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য থাকে। কোনো কিছু বুঝার জন্য মনের অনুশীলন বা বিশ্লেষণ ক্ষমতা উন্নয়নের দিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেয়া হয় না। শিশুরা যা মুখস্থ করে, তাই প্রশ্ন করা হলে জবাব দিতে পারে। মুখস্থ জবাব এত তাড়াতাড়ি দেয় যে, তাতে মনে হয় না যে শিশু যা মুখস্থ করেছে তা বুঝেছে। ফলে শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মন-মানস গঠনও সুষ্ঠুভাবে হয় না।

শিক্ষার অনেক বড় উদ্দেশ্য হলো আত্মার উন্নয়ন, চরিত্র গঠন, ভাল-মন্দ পার্থক্যকরণ এবং সঠিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি। এ পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন দূরের কথা; তা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যেই নেই।

সনাতন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম, নীতিবোধ, হাদীস কুরআনের আয়াত ও অর্থ মুখস্থ করিয়ে দেয়ার একটি চিন্তাধারা ও লক্ষ্য আছে। তাতে জান্নাতপ্রাপ্তি হয়তো সহজ লভ্য হতে পারে, তবে যুক্তি দিয়ে বুঝার উপর গুরুত্ব কম। এ শিক্ষায় নৈতিকতার কিছুটা বিকাশ হলেও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছাত্ররা অনেক পিছিয়ে থাকে। তাই তারা

জীবন সংগ্রামে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের সমান তালে চলতে পারে না, পিছন পড়ে যায়।

আখিরাতে নাজাত যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, অন্ততঃ দুনিয়াদারী উন্নতি, প্রগতি অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়, তবে বলা হবে সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষাই আমাদের শিশুর জন্যে অধিকতর কল্যাণকর এবং উপযোগী। আমরা কি তবে দুনিয়ার সুবিধা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দেবো ?

দুনিয়ার সব কিছুতো আল্লাহ্ আমাদের ভোগের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন, ফিরিস্তাদের ভোগের জন্যে নয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে দুনিয়া এবং আখিরাতে আমাদের কামিয়াবী হাসেল হয়। দুনিয়া যেন আমাদের পুরো করায়ত্ব হয়। দুনিয়াদারদের পেছনে না থেকে সাহাবীদের ন্যায় সম্মুখের আসনে যেন আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারি।

আখিরাতে আমাদের নেতৃত্ব না হোক অন্ততঃ আখিরাত যেন হারাতে না হয় এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমুখী আধুনিক মানুষদের জন্যে প্রয়োজন আছে। এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদাও আছে।

ঈমান, ইয়াকিন, আকিদা, শরীয়তি আমল, আখলাক রেখেও আমরা দুনিয়ার সরদারী পেতে পারি। এমন মাদ্রাসা আমরা উন্নয়ন করতে পারি যে, মাদ্রাসার ছাত্রদের মৌলিক পরিচিতি হবে দ্বীনদার মুসলিম। এদের ঈমান ও ইয়াকিন এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর কায়েম করার চেষ্টা করা হবে যে, আল্লাহর হুকুম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুন্নাহকেই তারা জীবনের একমাত্র পথ নির্দেশ মনে করবে। এ দুনিয়ায় তাদের আমল, আখলাকের লক্ষ্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল ও আখেরাতে নাজাত ও জান্নাত প্রাপ্তি।

পাঠ্যসূচী

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় শিক্ষণীয় বিষয় বাংলাদেশে প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থায় যা শিক্ষা দেয়া হয় তার সবকিছুই থাকবে। শিক্ষার্থীগণ 'O' Level এবং 'A' Level এর পরীক্ষা দিতে পারবে। সংগঠকগণ ইচ্ছা করলে অভিভাবকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে সিলেবাসে পরিবর্তন এনে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংলিশ মিডিয়ামে ঢাকা শহরের "সেন্ট জোসেফ" ও "হলিক্রস কলেজের" মতো ইংলিশ মিডিয়ামে বোর্ডের এস.এস.সি. ও এইচ এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তদুপরি থাকবে দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়। তাদের যেন ঢাকা ল্যাবরেটরী স্কুলের ছাত্রদের মতো কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান – কোনো বিভাগেই কলেজে ভর্তি হতে অসুবিধা না হয়। 'O' Level ও 'A' Level এর পরীক্ষাও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দিতে পারে।

উপরোক্ত চিন্তার আলোকে প্রথমতঃ একটি মডেল মাদ্রাসা স্থাপনে এবং কালক্রমে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে মত বিনিময় ও সর্বাত্মক সহযোগিতার আবেদন করছি।

আল-আরাফাহ্ (ইংলিশ মিডিয়াম) মাদ্রাসায় ইসলামী পরিবেশ

শিশুদের ঈমান আকিদা

শিশুদের ঈমান আকিদা নির্ভর করে পরিবেশ ও প্রাথমিক শিক্ষার উপর। হিন্দু মায়ের কোলে প্রতিপালিত শিশু পরবর্তীতে যে শিক্ষাই পাক না কেন প্রায় সকলে হিন্দু হয়েই মৃত্যুবরণ করে। অনুরূপভাবে, মুসলিম ও খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশু বৃদ্ধ অবস্থায় সংস্কারগতভাবে তা-ই থেকে যায়। যারা ধর্মান্তরিত হয়, তাদের সংখ্যা নগন্য। হয়তো হাজারের মধ্যে একজন। পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিরকী সংস্কৃতির আবর্তে পড়ে শিশু পরিণত বয়সে নামধারী থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ে উঠে মুশরিক, মুনাফিক এবং এর এক ক্ষুদ্রাংশ কাফির।

আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসার মাকসুদ বিশেষ করে পরিবেশের লক্ষ্য হবে শিশুকে গোড়া থেকেই বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সংস্কারে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা। যুক্তি দিয়ে বুঝার আগে পরিবেশ এবং সংস্কারগতভাবে যারা ইসলামকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন তাদের বিশ্বাস নাড়ানো কঠিন।

যদিও আজকাল আমরা অনেকে ধর্মীয়ভাবে মুসলিম কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে, আসবাবপত্রে ইয়াহুদী-নাছারা ভিন্ন অন্য কিছু নই। রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা গণতান্ত্রিক মুশরিক। অর্থনীতিতে অনেকে নাস্তিক, জড়বাদী, জালিম। সংস্কৃতিতে পৌত্তলিক, মুশরিক ও ফাসেক। তাওবা না করলে এবং ক্ষমা না পেলে জালিম ও মুশরিকের পরিণতি চিরকাল নরকবাস (আল-কুরআন)।

ঈমান ইয়াকিনের উপরে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তার বুনিয়াদি এবং চূড়ান্ত রূপ হলো রাসূল করীম (সঃ) এর সুন্নাহ্। সুন্নাহ্ ভিন্ন মুসলিম শিশুর অন্য কোনো সংস্কৃতি হতে পারে না। এ বিশ্বাস রেখে আল-আরাফাহ্ মাদ্রাসার আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

দশ ওয়াক্ত নামাজ

শিশুরা নামাজকে বোঝা মনে করে না। সালাত তাদের কাছে একটি খেলার মতো। মাতাপিতাকে তারা নামাজের সময় অনুসরণ করতে ভালবাসে। ৪/৫ বছরের শিশু এই বয়সে শিশুদেরকে মসজিদমুখী ও ধর্মীয় অনুরাগী করা অত্যন্ত সহজ। অথচ ১০ বছরের পর থেকে সন্তানদেরকে ডেকে, তোষামোদ করে প্রয়োজনবোধে জোর করে মসজিদে নিতে হয়।

আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় এ বয়সেই শিশুদেরকে অজু ও নামাজে অভ্যস্ত করিয়ে নেয়া হবে। যে বয়সে তারা নামাজকে বোঝা মনে না করে আনন্দ মনে করে, সে বয়সে তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত ছাড়াও অতিরিক্ত ৫ ওয়াক্ত নামাজে অভ্যস্ত করে নেয়া হবে।

এই অতিরিক্ত নামাজ হলো – (১) ইশরাক, (২) দুহা (চাশত), (৩) যাওয়াল, (৪) আওয়াবিন, (৫) তাহাজ্জুদ। ইশরাক পড়া হবে সূর্য উঠার ২২ মিনিট পর, দুহা পড়া হয় সকাল ৯ টার পর, যাওয়াল পড়া হয় সূর্য হেলে পড়ার পর এবং জুহরের আগে, আওয়াবীন মাগরিবের পর, তাহাজ্জুদ পড়া হয় এশার পর এবং সুবহে সাদিকের পূর্বে।

সুন্নাত মুস্তাহাব

তাবলীগের জামাতে এক সঙ্গে তিন চিল্লা দিলে অনেকগুলো সুন্নাত, মুস্তাহাব পালনের অভ্যাস হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সুন্নাহ্ অনুসারে নিত্য করণীয়সমূহ তালিকা করে শিশুদেরকে তা পালন করতে অভ্যস্ত করিয়ে নেয়া হবে। সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা, সুন্নাত পালন করতে গৌরব ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা হবে। সুন্নাত লংঘন করতে লজ্জার অনুভূতি সৃষ্টি করা হবে। এ কাজগুলো করার জন্য রীতিমত গবেষণা করতে হবে। আশা করা যায় আনন্দের মাধ্যমে শিশুরা সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল পালনে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে তাদেরকে প্রথম দর্শনেও যেন ইয়াহুদী নাসারা মনে না হয়।

তাহাজ্জুদ নামাজ

আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসার শিশুরা ৯:০০ টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। রাত ১০:০০ টার পর ছাত্র শিক্ষক কারো জেগে থাকার কোনো প্রশ্নই উঠে না। রাত ৩:০০ টার পর সকলকে উঠতে হবে। হাত মুখ ধুয়ে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে হবে। তারপর শব্দ করে লেখাপড়ায় অভ্যস্ত হতে হবে। শব্দ করে ফজরের নামাজ পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হবে। এ সময়টা পড়া মুখস্থ্ করার জন্য উত্তম সময়। হাফিজিয়া মাদ্রাসায় এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

একটি শিশুকে রাত ৩:০০ টা থেকে ৬:০০ টা অর্থাৎ ফজরের নামাজ পর্যন্ত জেগে থেকে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় এবং লেখাপড়ায় অভ্যস্থ্ করতে পারলে তা একজন ছাত্রের সারা জীবনে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হবে। এরূপ শিশু পরবর্তী জীবনে আশা করা যায় তাহাজ্জুদ এবং ফজরের নামাজ কাযা হবে না। যাদের তাহাজ্জুদ এবং ফজর কাযা হয় না, তারা সাধারণত বাকী ৪ ওয়াক্ত নামাজ কাযা করে না।

ক্বিরাত ও ইমামতি

নামাজে ইমামতির অন্যতম শর্ত হলো সঠিক উচ্চারণ। ইলম, তাকওয়া, পোশাক ইত্যাদির প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। যার ক্বিরাত সঠিক নয়, তিনি ইমামতি করতে পারেন না। আল-আরাফাহ্ কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় সুস্পষ্ট আরবী উচ্চারণে ক্বিরাত শিক্ষার উপর খুবই গুরুত্ব দেয়া হবে। গুরুত্ব অন্ততঃ এতটুকু হবে যে শিশুরা ইমামতি করতে দ্বিধাবোধ করবে না। নিজেদের মধ্যে নফল নামাজের ইমামতি করিয়ে তাদেরকে ইমামতির যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনে সাহায্য করা হবে।

যে সূরাগুলো পাঠ করে শিশুরা এ বয়সে ইমামতি করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে সেগুলো আশা করা যায়, বড় হয়েও তারা ভুলবে না।

দু'য়া ও মুনাজাত

আত্মীয় স্বজন মারা গেলে দু'য়া, মিলাদ, খতম ও মুনাজাতের জন্য মাদ্রাসার ছাত্র, ইমাম ডাকতে হয়। ২৫-৩০টি আরবী মুনাজাত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে মুখস্থ্ করা বা রাখা কষ্টকর। কিন্তু শিশুরা ২৫-৩০টি মুনাজাত কেন, অল্প বয়সে পুরো কুরআন পর্যন্ত হিফ্জ

করে ফেলতে পারে। কুরআনের প্রয়োজনীয় আয়াত মুখস্থ করিয়ে দেয়া হবে যা মুনাজাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আরবী মুনাজাতের উপর আমাদের দেশবাসীর আস্থা বেশি। মুনাজাতে কুরআনের আয়াত ব্যবহার করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহ্‌র কাছে আল্লাহ্‌র বাণী দিয়েই কিছু চাইতে হবে। কুরআনের আয়াত ছাড়াও ইংরেজী, বাংলায় যথেষ্ট সংখ্যক সুললিত এবং সুন্দর মুনাজাত প্রণয়ন করে মুখস্থ করিয়ে দেয়া হবে, যা মৃত ব্যক্তির দাফন অনুষ্ঠান বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাঠ করা হয়।

তোতা পাখির মত মুখস্ত মুনাজাত নয়, মুনাজাতের মাধ্যমে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে আন্তরিকতার সাথে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যান কামনা এবং মুনাজাতে কান্নার অভ্যাসও আয়ত্ব করিয়ে নেয়া যায়। শিশুদের মন থাকে অত্যন্ত নরম। অতি সহজেই চোখে পানি আসে। মা, খালা, দাদী-নানী ভাই বোনদের জন্য করুণভাবে মুনাজাত প্রণয়ন করা যায়, যাতে শিশুর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠবে।

মিলাদ

'মিলাদ' অনুষ্ঠান উপ-মহাদেশের বাইরে নেই। এটা ভারতীয় ও বাংলাদেশের মুসলমানদের ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহাবীরা মিলাদের মতো অনুষ্ঠান না করলেও তাসবিহ্‌ তাহলিল ইত্যাদির জন্য বসতেন। মিলাদ যে ষ্টাইলে বা আঙ্গিকে করা হয় সে ষ্টাইলে না হলেও তাসবিহ্‌, যিকির এবং দু'য়ার মাহ্‌ফিল সাহাবীদের সময়েও হতো। আল-আরাফাহ্‌ কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসার শিশুদেরকে মিলাদ ও দু'য়া পাঠের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। যে কোনো উপলক্ষে যেন তারা বাসায় মিলাদ পড়াতে পারে। শিশুর পরিচালিত মিলাদ অবশ্যই বড়দের জন্য আকর্ষণীয় হবে।

হাম্‌দ, নাত

ওয়াজের মাহ্‌ফিলে লোক আনা এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখা কষ্টকর হয়। গানের মজলিসে লোক এমনিতেই বসে থাকে। বিশেষ বিশেষ ধরনের গান নাজায়েজ। কিন্তু হাম্‌দ, নাত, গজল, ইসলামী সঙ্গীত খুব সম্ভব নাজায়েজ নয়। 'উলামায়ে কিরামের ওয়াজের মধ্যে নাটক এবং গানের রেশ থাকে। আল-আরাফাহ্‌ কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় অবশ্যই হাম্‌দ, নাত, ইসলামী সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হবে। তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন স্থানে হাম্‌দ, নাত-এর অনুষ্ঠান করা হবে।

টুপি পাগড়ী পরিধান

আফগানিস্তানে মদ্যপায়ী, বেহায়া-বেশরম ব্যক্তিও পাগড়ী পরতে লজ্জিত নয়। অথচ বাংলাদেশ পাশ্চাত্য শিক্ষিত নয়, মাদ্রাসায় শিক্ষিত এবং বুজুর্গানে দ্বীনের কাছেও টুপির বোঝা এতো ভারী না হলেও পাগড়ীর বোঝা কয়েক মন ভারী বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত ইসলামী চেতনাসম্পন্ন আধুনিক মুসলিমদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময় আন্ডারউইয়ার পরতে কোনদিন ভুল হয় না। কিন্তু টুপিটা মাথায় তোলা তো দূরের কথা, পকেটে ঢুকাতে পর্যন্ত ভুল হয়ে যায়।

আল-আরাফাহ্‌ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসার শিশুদেরকে শুধু টুপি নয়, অতি দ্রুত মাথায় পাগড়ী বাঁধতে এবং পাগড়ী দিয়ে ক্লাশ করতে অভ্যস্ত করিয়ে নেয়া হবে। সংস্কৃতি হিসেবে নয়, ধর্মীয় চেতনার কারণে যার মাথায় পাগড়ী পরা থাকবে তার ক্বাল্‌বে আশা করা যায় ইয়াকিন, ঈমান রাখার জায়গাও হবে।

পোশাক পরিচ্ছদ

আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসার শিশুদের ব্যবহারোপযোগী এক সেট পাশ্চাত্য পোশাক থাকবে। তবে ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ পোশাক থাকবে একাধিক। শিশুরা ছোটকাল থেকে হাফপ্যান্ট পরলে প্রাপ্ত বয়সেও সতরের প্রতি অমনোযোগী হয়।

আল-আরাফাহ্ কিণ্ডারগার্টেন মাদ্রাসার শিশুরা হাফপ্যান্ট পরবে না। তাদের ঢিলা বা লুজ প্যান্ট এবং পায়জামা থাকবে। পায়জামার মধ্যে ফিতার পরিবর্তে বোতাম থাকবে। তাদের জামার কলার শার্টের কলারের মতো না করে সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল, ইউরোপের রাজা বাদশাহরা যেরূপ খাড়া কলারের জামা পরিধান করে থাকেন – সেরূপ লাগবদ্ধ কলার হবে। কলারের মধ্যে সূতি কারুকার্য থাকবে যাতে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। 'উঁচু কলারের প্রবর্তক ছিলেন খলিফা হারুনুর রশিদের মন্ত্রী জাফর বারমেকি।'

উঁচু স্তরের শেখ/মাশায়েখ এবং আয়াতুল্লাহ্গণ, জামার উপরে যে ধরণের উপরি আলখেল্লা পরিধান করে থাকেন, সে ধরনের উপরি জামাও তাদেরকে দেয়া হবে। পাগড়ী ও আলখেল্লা পরিয়ে একশত শিশুকে দু'লাইনে যদি রাস্তায় বের করা হয়, তাদেরকে দেখার জন্য পথচারীরা কিছু সময়ের জন্য হলেও থমকে দাঁড়াবে।

আল্লাহ্ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ বেশি সুন্দর। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হলো শিশু। তাদের জামা কাপড় হতে হবে সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। তাদের মনে যেন পাশ্চাত্য শিশুদের তুলনায় কোনরূপ হীনমন্যতাবোধ না জন্মে, সে ধরণের সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহারের চেষ্টা করা হবে।

কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা

পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন

ধর্মীয় উপাসনালয়ে মানবতার একরূপ এবং সংসারে অন্য রূপ। ইসলামের দৃষ্টিতে এ দৃশ্য অচিন্তনীয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ সার্বজনীন জীবন বিধান। জীবনের সকল ক্রিয়াকর্মই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের অংশ। মানব ক্রিয়া কান্ডকে ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ যে ভাবেই ভাগ করি না কেন, তা একই জীবনের অংশ।

সিলেবাসে কুরআনের শব্দাবলীর অর্থ

আল্ কুরআনের মূল শব্দগুলোর অর্থ ছাত্রদেরকে মুখস্থ করিয়ে দেয়ার পাঠ্যসূচী কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসায় অবশ্যই রাখতে হবে। অল্প বয়সে স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকে। তখন পুরা কুরআনও হিফ্জ করে নেয়া অনেকের পক্ষে সহজ হয়। সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ মুখস্থ করে নেয়া তত কঠিন হবে না। কুরআনের শব্দগুলোর বাংলা অর্থ জানা থাকলে কুরআন বুঝা সহজ হবে।

মাদ্রাসা কিন্ডারগার্টেন কেন ?

কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর শিক্ষার মান সম্বন্ধে অভিভাবক মন্ডলীর ভালো ধারণা আছে। অন্যদিকে মাদ্রাসার শিক্ষার মান সম্বন্ধে অনেকের ধারণা ততটুকু ভালো নয়। কিন্ডারগার্টেনে যে সমস্ত কচি শিশু লেখাপড়া করে তারা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাবা মা থেকে শুদ্ধতর উচ্চারণে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে পারে। অথচ মাদ্রাসায় একজন ছাত্র ১৫-২০ বছর পড়ার পর মোদার্‌রিস হিসাবে আরও ৫ বছর চাকুরী করেও সঠিক উচ্চারণ দূরের কথা বোধগম্যভাবে আরবদের সঙ্গে আরবীতে কথা বলতে পারেন না।

এ অনভিপ্রেত অবস্থার কারণে মাদ্রাসা নামের সাথে যদি আপাততঃ কিন্ডারগার্টেন শব্দটি যোগ করে কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা নামে প্রতিষ্ঠান শুরু করা যায়, অনেক অভিভাবক এ জাতীয় মাদ্রাসা সম্বন্ধে উৎসাহ হবেন।

চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ উন্নতমানের শিক্ষা পদ্ধতির একটি মাদ্রাসা চালু আছে। এটি যে একটি সনাতন পদ্ধতির নয় বরং একটি উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা বুঝবার জন্যে 'আধুনিক' শব্দটি যোগ করে 'বায়তুশ শরফ আধুনিক মাদ্রাসা' – এভাবে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা আধুনিক হওয়ায় ইসলাম বিরোধী হয়নি, তেমনি কোনো মাদ্রাসার সাথে কিন্ডারগার্টেন যোগ দিলে তেমন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

সিলেবাস

যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা পদ্ধতির একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর সিলেবাস। সিলেবাস অনুসারেই শিক্ষকগণ কী পড়াবেন বা পড়াতে হবে তা নির্ধারণ করেন। যুগোপযোগী সিলেবাস সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা দরকার আছে। বর্তমান নিজামিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস আড়াই শত বছর পূর্বে প্রণীত হয়েছিল। কিছুটা পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে এখনও তা চালু আছে।

কুরআন এবং হাদীস ঠিক রেখে যুগোপযোগী সিলেবাস গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। আমাদের মাদ্রাসা সিলেবাস যুগোপযোগী করে নেয়া সম্ভব হয়নি বলে হয়তো মাদ্রাসা শিক্ষকগণ জীবন সংগ্রামে পিছনে পড়ে আছেন।

ভাষার গুরুত্ব

মাদ্রাসা সিলেবাসে ভাষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আরবী ভাষার উপর অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। সাথে সাথে বাংলা, ইংরেজীর উপরও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ভাষা জ্ঞানের সাথে সাথে সঠিক উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। একবার ভুল উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়ে গেলে উচ্চারণ সংশোধন করা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

হামদ্-নাত

উন্নত ধরনের কিন্ডারগার্টেন বা পাবলিক স্কুল টাইপ মাদ্রাসাগুলোতে হামদ্-নাত শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। মহানবীর (দঃ) সময় দফ নামে এক দিক খোলা বাদ্য যন্ত্রের প্রচলন ছিল। একবার সম্ভবত: ঈদ উৎসবে মহানবীর (দঃ) সম্মুখে দফ বাজানো হচ্ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) এ নিয়ে বিবি আয়েশাকে তিরস্কার করলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসন্তুষ্ট হন। এতে প্রতীয়মান হয় দফ বাজানো শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ নয়। দফ এর অনুরূপ বাদ্য যন্ত্রাদি ব্যবহার মাদ্রাসায় চলতে পারে।

দেয়াল পত্রিকা

ছাত্র-ছাত্রীদের আত্ম-প্রকাশ এবং প্রতিভা বিকাশের অন্যতম সুযোগ হলো সাময়িকী এবং দেয়াল পত্রিকা। দেওয়াল পত্রিকার সকল লেখা উৎসাহী ছাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। পত্রিকায় বিশেষ সাইজ এবং কলাম মাপ সম্পাদকের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে। স্কুলে লেখকেরা বিভিন্ন বিষয়ে লিখে বহু রঙে আলপনা বা নক্শা এঁকে সম্পাদকের কাছে জমা দিবেন। সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত লেখা দেয়াল পত্রিকার বিভিন্ন অংশে আটকিয়ে দেবেন। এরূপ ব্যবস্থায় বহু সংখ্যক দেয়াল পত্রিকা অল্প শ্রমে প্রকাশিত হতে পারে।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোগে "আল-আরাফাহ্ কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা" নামে একটি ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা শুরু করা হয়েছে ১৯৯৯ সনে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইংরেজী, বাংলা, অংক সিলেবাস হুবহু 'O' Level পদ্ধতির কিন্ডারগার্টেন স্কুলের অনুরূপ। এর সঙ্গে যোগ করে দেয়া হয়েছে কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ ও দু'য়া-দুরূদ শিক্ষা। আরবী ভাষা এবং কিন্ডারগার্টেন স্তরে শিশুদের জন্যে যতটুকু সম্ভব ইসলামী আকিদা ও আখলাক উন্নয়নে বিভিন্ন কারিকুলাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আগামী বছর ইন্শাআল্লাহ্ কুরআন হিফ্জ প্রকল্প শিক্ষাসূচী অন্তর্ভূক্ত করা হবে। যদিও শিক্ষার মিডিয়াম ইংরেজী কিন্তু পরিবেশ মাদ্রাসার অনুরূপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাদ্রাসাটি এখনো পরীক্ষাধীন রয়েছে। শুভাকাঙ্খি ও অভিভাবকের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এটি ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার সমন্বয়ে ইসলামী শিক্ষার একটি নতুন আদর্শ মডেল রূপে গড়ে উঠতে পারে।

কিণ্ডারগার্টেনের উৎকর্ষতা

কিন্ডারগার্টেনগুলো গড়ে উঠছে নিজের অন্তর্নিহিত আদর্শ ও শক্তির বলে। যে কারণে ফোরকানীয়া মাক্তাবগুলি মরে যাচ্ছে, সে কারণেই কিন্ডারগার্টেনগুলো গড়ে উঠছে। কোনো কোনো ইসলাম-দরদী হয়তো বলবেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চেতনা কমে যাচ্ছে। তাই বিত্তবান মুসলমান নিজেদের সন্তানদের ফোরকানীয়াতে না পাঠিয়ে কিন্ডারগার্টেনে পাঠাচ্ছেন। কথাটা ঠিক নয়।

দুনিয়ার কোন কিছুই এক জায়গায় বসে নেই। কালের আবর্তে পরিস্থিতি ও পরিবেশের তাগিদে গ্রহণ/বর্জনের মাধ্যমে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ফোরকানীয়া শিক্ষা ব্যবস্থা, যেমনটি ছিলো হাজার বছর আগে। এর কোনো পরিবর্তন নেই, উন্নতি নেই। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন ব্যবস্থা ক্রমবিবর্তনের ধারায় অগ্রসর হচ্ছে। যুগের প্রয়োজনে ও দাবীতে এ শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন অপরিহার্য। শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে পণ্ডিতগণ গবেষণা করছেন, এর ফলে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতিতে অভিভাবকদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

রাসূল (সঃ)-এর যুগে যা ছিলো না, তা প্রবর্তন করা বিদা'আত। কিন্তু সব বিদা'আত কি খারাপ? রসূল (সঃ)-এর সময় লোকেরা উটে চড়ে মরুভূমি পাড়ি দিতো। কিন্তু আজ তো উট আর মরুর জাহাজ নয়; এখন আরবেরা চলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেডিলাকে। খোলাকায়ে রাশেদীন এবং উমাইয়া আব্বাসীয় যুগে লোকে পায়ে হেঁটে যেতো হজ্জ পালন করতো, কিন্তু এখন ইন্দোনেশিয়া হতেও হাজীরা হজ্জ করতে যান উড়োজাহাজে চড়ে। বালুর ঘড়ির পরিবর্তে আমরা সিকো ঘড়িতে সালাতের সময় দেখি। সবদিকেই পরিবর্তন মেনে নিচ্ছি ও ভোগ করছি। অথচ ফোরকানীয়াতে শিশু শিক্ষার পদ্ধতির এক বিন্দুও পরিবর্তন নেই।

খালিক বা স্রষ্টার ধারণা দান

একটি শিশুকে আপনি যদি বলেন, আল্লাহ্ খালিক, মালিক, আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার পক্ষে অকাট্য যুক্তি ও জ্ঞান শিশুকে কিভাবে দেবেন? আল্লাহতে বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস না করলে দোযখে জ্বলতে হবে, আগুনে পুড়তে হবে, এভাবে হয় তো তাকে বুঝানো যায়, আল্লাহ্ আছেন। কিন্তু তা কি ঠিক হবে?

শিশুকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তোমার গায়ের জামাটা কে বানিয়ে দিয়েছেন? তোমাদের বাড়ীতে পিঠা বানায় কে? নাস্তা বানায় কে? চা বানায় কে? তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে – চানাচুর, চকোলেট কে বানায়, আইসক্রীম কে তৈরী করে? এমন সব প্রশ্ন করতে হবে যাতে সে সহজে উত্তর দিতে পারে।

শিশু একটু বড় হলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে – নৌকা কে বানিয়েছে, রিক্সা কে বানিয়েছে, গাড়ী কে বানায়, ঘর কে বানায়, টেবিল, চেয়ার কে বানায়?

এভাবে সহজ থেকে কঠিনতর প্রশ্ন করতে হবে – যখন তার মধ্যে এ চেতনা সৃষ্টি হবে যে, প্রত্যেক জিনিসই তো একজন তৈরী করেছেন?

[illegible] দিক দিয়ে তাকে অনুভূত করে দিয়ে, প্রশ্ন করে বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করতে হবে – আচ্ছা বলো তো এবার, তোমাকে কে বানিয়েছে? তোমার আব্বাকে কে বানিয়েছে? তোমার দাদুকে কে বানিয়েছে? হয়তো শিশু বলে ফেলবে, আল্লাহ্ বানিয়েছেন।

যদি সে না পারে, তা হলে বলা যায় – আচ্ছা আজ থাক, কালকে বলো। আজকে চিন্তা করো, তুমি যদি না জানো, তোমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করো। পরদিন অবশ্যই সে বলবে, তাকে বানিয়েছেন আল্লাহ্।

তখন তাকে আরো কঠিন প্রশ্ন করা যেতে পারে। এবার বলো তো, এ সুন্দর চাঁদকে কে বানিয়েছে। তোমরা কেউ পারবে কি আকাশ বানাতে? কাগজে আঁকতে হয়তো পারবে। কিন্তু, সূর্য কি কেউ বানাতে পারবে? তা হলে বলো, কে সূর্য বানাতে পারে? এ পদ্ধতিতে আল্লাহ্ যে একজন মহান স্রষ্টা শিশুকে সে জ্ঞান দিতে হবে।

রিসালাতের ধারণা দান

রিসালাতের জ্ঞান একটি শিশুকে আপনি কিভাবে দেবেন? আল্লাহ্ বহু নবী পাঠিয়েছেন, নবীরা আল্লাহ্র কথা মানুষকে জানাতেন, এ পদ্ধতিতে হয়তো কিছুটা বুঝানো যেতে পারে।

আরো আধুনিক উপায়ে রিসালাতের জ্ঞান সহজভাবে দিতে হবে। শিশু যা জানে না, এরূপ প্রশ্ন তাকে করতে হবে। প্রশ্নগুলি হবে সহজ – একবার বলে দেয়ার পর যাতে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা হলেও বলতে পারে।

শিশুরা যা জানে না, তাদেরকে তা কে শেখায়? শিক্ষা দেন তাদের বাবা-মা, শিক্ষক। কিন্তু যা কোনো মানুষ জানে না, যেখানে কোনো মানুষই যেতে পারে নি, সেখানকার খবর মানুষকে কে শেখাবে? ঐ শিক্ষা দিতে পারেন আল্লাহ্ – যিনি বানাতে পারেন চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা, আকাশ, সমুদ্র – যা কোনো মানুষ পারে না। আল্লাহ্ কি সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন? তিনি কিভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দেন? আল্লাহ্ শুধু নবীগণকে সরাসরি শিক্ষা দান করতেন। নবী মানুষকে আল্লাহ্র কথা শিক্ষা দিতেন।

শিশুদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে তারা কোনো নবীর নাম জানে কি না। হয়তো কেউ কোনো নবীর নাম বলবে, হয়তো বা কেউ বলতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবেই মানব জাতির পিতা আদম কিংবা নবী ইব্রাহীম (আঃ)-এর নাম জেনে থাকবে।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা

ইব্রাহীম (আঃ)-এর গল্পটি এমনিতে সুন্দর, তবুও আরো সুন্দর। আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত এনে নানা শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে গল্পটিকে আরো আকর্ষণীয় ভাবে শিশুদের কাছে উপস্থাপন করা যায়। গল্প শেষে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে – আগুনে কারো হাত লেগেছে কি না, আগুনের মধ্যে হাত দিলে কেমন লাগবে, জ্বলন্ত মোমবাতিতে হাত দিলে হাত পুড়বে কি না, একটি মোমবাতি জ্বালিয়েও অতি সাবধানতার সাথে তা দেখানো যায় যে আগুন খুব গরম।

ক্লাস রুমের সামনে কিছু খড়কুটা বা পুরানো কাগজ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করে দেখানো যেতে পারে, আগুনের মধ্যে অনেক কিছু ফেলে দিলে পুড়ে যায়। শিক্ষক একবার নিজের হাতটা এগিয়ে দিয়ে এমনভাবে নিয়ে আসবেন যাতে তাঁর হাত পুড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে।

[illegible] যায় – এর চেয়ে বড় আগুন জ্বালাতে পারলে, বড় বড় গাছ কেটে এনে তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে কেমন অবস্থা হবে। সে আগুনের উপর দিয়ে কি কেউ হাঁটতে পারবে ? কেউ কি সেখানে বসে থাকতে পারবে ?

কোনো যাদুকর কি তা পারবে ? দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যাদুকর কি তা পারবে ? শিশুরা স্বাভাবিকভাবে বলবে – কেউ পারবে না। তখন বলতে হবে, দুনিয়ার মধ্যে একজন মানুষ তা পেরেছিলেন। শিশু পার্কে যতোটুকু জায়গা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গা জুড়ে আগুন জ্বালানো হয়েছিলো বন থেকে বড় বড় গাছ কেটে এনে। তারপর তাঁকে এক দুষ্ট রাজা নমরূদ আগুনের মধ্যে ফেলে দিলো আর ভাবলো, তিনি তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য। সবাই দেখলো তাঁর একটি পশমও পোড়েন নি।

আগুনের মধ্যে বসে বসে তিনি হাসছেন, শুধু তা-ই নয়, রমনা পার্কের মধ্যে যে রকম ফুল ফোটে, তার চেয়ে আরো হাজার গুণ সুন্দর ফুল তার চারিদিকে ফুটে আছে ! কি আশ্চর্য ব্যাপার, আগুনের মধ্যে বসে থাকতে পারেন যিনি, তাঁর নাম তোমরা কেউ জান না ?

তাঁর নাম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র বন্ধু। তাঁকে আল্লাহ্ খুব কঠিন কঠিন পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু, সবগুলি পরীক্ষায় তিনি পুরা নম্বর পেয়ে পাস করেছেন। প্রত্যেকটিতে ১০০-তে ১০০ নম্বর পেয়েছেন। এক নম্বরও আল্লাহ্ কাটেন নি। শেষে আল্লাহ্ তাঁকে নিজের বন্ধু বানিয়েছেন। তুমিও ভাল কাজ করলে, কখনও মিথ্যা কথা না বললে – আল্লাহ্‌র বন্ধু হতে পারবে।

এমনভাবে, পানির উপর কে হাঁটতে পারেন ? দুনিয়াতে কে সবচেয়ে বড় নৌকা তৈরী করেছেন ? এ সমস্ত ঘটনায় শিশুদের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করা যায়। এমনভাবে বলতে হবে যাতে তারা আরো শুনতে চায়, তারা আরো জানতে চায়। কিন্ডারগার্টেনের পদ্ধতিতে কিভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, তা ব্যাখ্যা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে পদ্ধতির স্বরূপটা একটু বোঝাবার জন্য দু'টি উদাহরণ দেয়া হলো।

বর্তমান কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলিতে এভাবে যে স্রষ্টা ও নবীর পরিচয় দেয়া হয়, তা নয়। ইসলামী কিন্ডারগার্টেন হলে কিভাবে শিক্ষা দেয়া হবে তা'ই বোঝাবার জন্যে দু'একটি উদাহরণ দেয়া হলো। মোটকথা, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। কিন্ডারগার্টেন জনপ্রিয় হওয়ার আরো বহু কারণ আছে। শহরে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা খুবই কম। হাইস্কুলের সাথে নিচের ক্লাসও আছে এরূপ স্কুল বহু দূরে দূরে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে দূরে স্কুলে পাঠাতে হলে যানবাহনের প্রয়োজন হয়। দূরত্ব বেশি হলে তা হয়ে ওঠে ব্যয়বহুল।

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ দেশে প্রচলন করে খ্রীস্টান মিশনারী। পাশ্চাত্যের সবকিছুর প্রতি আমাদের রয়েছে একটা অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ মোহ। খারাপ জিনিসের প্রতিও আমাদের মোহ কম নয়। কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিটা যেহেতু খারাপ নয়, তাই সন্তান-সন্ততিকে কিন্ডারগার্টেনে পাঠাতে কারো অনীহা থাকে না, যদি সামর্থ থাকে।

কিন্ডারগার্টেনে ছাত্র নেয়া হয় কম, তাই শিশুদের প্রতি মনোযোগ দেয়া সহজ হয়। ঢাকা শহরে কিন্ডারগার্টেনে ছাত্রদের মাসিক বেতন হার প্রকার-ভেদে বিভিন্ন। প্রতিমাসে ১২,৫০০/- টাকা উচ্চ বেতন-ভাতা (আবাসিক) দিয়েও বাবা-মা ইসলামী কিন্ডারগার্টেনে সন্তান পাঠাতে চান।

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ২৫-৩০ টাকার মতো মাসিক বেতন, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে দেখা যায়। কিন্তু কিন্ডারগার্টেনে বেতন হার অত্যধিক হলেও অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানকে ভর্তি করাতে সেখানেই ভিড় করে বেশি। এর কারণ কি ? কারণ সচেতন অভিভাবক চায় উচ্চ বেতন দিয়ে হলেও শিক্ষার উন্নত মান ও পরিবেশ।

বড় বড় প্রতিটি শহরে হাজার হাজার পরিবার এখন উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত। তারাও সবদিক দিয়ে পারিবারিক ব্যয় সংকোচন করে ছেলে-মেয়েদেরকে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ভিত করতে আগ্রহী। কারণ শিশুদের শিক্ষার প্রাথমিক ভিত মজবুত না হলে ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক স্কুলে সুবিধা করতে পারেনা।

সন্তান প্রথম বিভাগে পাস করতে না পারলে পিতামাতার ভোগান্তির শেষ নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি বা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ তো দূরের কথা, ঢাকা কলেজের সিঁড়ি ডিঙ্গানোও সম্ভব হয়না।

প্রথম বিভাগে পাস করা অনেক ছেলেমেয়ের বাবা-মা চান, তাঁদের সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা সমমানের একটা কিছু হোক। সন্তান কেরানী হলেই হলো, আর কিছু চাই না – এরূপ হীন ধারণা কোনো মধ্যবিত্ত অভিভাবক করেন না।

মোটকথা, কিন্ডারগার্টেনগুলি এ যুগের সময়োপযোগী হয়েছে। ইসলামী চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কিন্ডারগার্টেন সিস্টেম-এর প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হলে বা মুখ ফিরিয়ে রাখলে কিন্ডারগার্টেনগুলো উঠে যাবে না। তাই আমাদেরকে ব্যাঙের মতো গজিয়ে উঠা বিজাতীয় দর্শনে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিরোধকল্পে কিন্ডারগার্টেনে ঢুকতে হবে এবং এগুলোকে আমাদের আদর্শ ও জীবন দর্শনের রং-এ সাজাতে হবে। কিন্তু এ কাজ করবে কারা ?

মসজিদ কেন্দ্রিক ইসলামী কিন্ডারগার্টেন

আমাদের দেশে বর্তমানে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বড় বড় শহরগুলো তো বটেই, এমনকি থানা শহরেও একাধিক কিন্ডারগার্টেন স্থাপিত হচ্ছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে ছাত্রবেতন খুব বেশি। তা সত্ত্বেও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে সিট পাওয়া কষ্টকর।

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা কী ? কিন্ডারগার্টেন প্রাইমারী বা মাক্তাব অপেক্ষা উন্নত ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি রয়েছে। দু'শ বছর আগে পরিবহন ছিল হাতি, ঘোড়া, পালকী, ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি। গ্রামে আজকাল কাউকে পালকীতে চড়তে দেখা যায় না। আরবরা উটে চড়ে সফর করেনা। ভ্রমণ করে ক্যাডিল্যাক বা জেট বিমানে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিসীম উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মাক্তাবের শিক্ষাব্যবস্থা পদ্ধতি এবং সিলেবাস ২০০ বছর আগেও যেমন ছিল এখনও অনেকটা তেমনি আছে।

আমাদের মসজিদ-কেন্দ্রিক মাক্তাবের অনুকরণে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে শুরু হয় চার্চ স্কুল। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে চার্চ স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতিতে আনা হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। এ দেশে খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ চার্চ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এই সকল চার্চ স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি ক্রমশই উন্নততর করা হচ্ছে। এ দেশের বহু মুসলিম অভিজাত ব্যক্তির ছেলেমেয়েদের চার্চ স্কুলে পাঠাতে সংকোচ বোধ করতেন – তাই আমাদের দেশে গীর্জা-কেন্দ্রিক স্কুলগুলোকে চার্চ স্কুল না বলে বলা হতো মিশনারী স্কুল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেন।

'কিন্ডারগার্টেন' জার্মান শব্দ। এর অর্থ শিশু-বাগান। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতি তেমন একটা নতুন কিছু নয়। এটা পূর্বতন শিক্ষা-পদ্ধতির একটি উন্নততর ধাপ। আমাদের ফোরকানীয়া মাক্তাবের শিক্ষা পদ্ধতিকে উন্নততর করা হলে এর সঙ্গে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা-পদ্ধতি তেমন কোনো পার্থক্য থাকবে না।

চট্টগ্রামের বায়তুশ-শরফের পীর সাহেব শিশুদের জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। এর শিক্ষাদান পদ্ধতি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ন্যায় উন্নত এবং ছাত্রদের বেতনও বেশি। কিন্তু এটাকে তিনি বায়তুশ-শরফ কিন্ডারগার্টেন স্কুল নাম দেন নি – নাম দিয়েছেন আধুনিক মাদ্রাসা। যাঁরা এর সাথে পরিচিত, তাঁরা জানেন এ মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতি আধুনিক এবং উন্নত ধরনের।

কিন্ডারগার্টেন বা আধুনিক মাদ্রাসায় মাসিক বেতন ১০০ টাকার কম নয়। প্রতি ছাত্রের মাসিক বেতন কম করে ১০০ টাকা হলে এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা, চট্টগ্রাম, মফস্বল শহর ছাড়াও কিছু কিছু বর্ধিষ্ণু থানা হেড কোয়ার্টার বা বড় বড় বাজার-বন্দরের সন্নিকটে চলতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের ৮৫ হাজার গ্রামে আমাদের সেই চিরাচরিত ফোরকানীয়া মাক্তাব এবং প্রাইমারী স্কুল থাকবে। ফোরকানীয়া মাক্তাবকে ইসলামী কিন্ডারগার্টেন স্কুলে রূপান্তর এবং মসজিদের ইমামগণের নেতৃত্বে ইসলামী কিন্ডারগার্টেন স্কুল পরিচালিত হতে পারে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮২ সনে জনৈক মোহাম্মদ আলমগীর রচিত "ইসলামী কিন্ডারগার্টেন" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছে। একটি ইসলামী কিন্ডারগার্টেন স্কুল কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তারই কিছু বিবরণ আছে এই পুস্তকে। গ্রাম-বাংলার হাজার হাজার মাক্তাব আরও একটু ভালভাবে পরিচালনা এবং সম্প্রসারণের জন্যে প্রকাশিত হয়েছে মোহাম্মদ মুফজুল হক রচিত "ফোরকানীয়া মক্তব পরিচালনা পদ্ধতি" শীর্ষক আর একটি পুস্তক।

ধর্ম শিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পৃথকীকরণ

অনেকে মসজিদ কেন্দ্রিক মাক্তাব শিক্ষাকে সেকেলে, প্রাচীন, মধ্যযুগীয় মনে করে থাকেন। তাদের মনে সন্দেহ, আধুনিক যুগে মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষার তেমন প্রয়োজন নেই। কেননা এ শিক্ষার যুগোপযোগী আবেদন নেই। এ ধারণা আসলে হীনমন্যতা এবং অজ্ঞতাপ্রসূত। এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব এবং দাসত্ব কায়েম হওয়ার পর ইংরেজরা শিশু শিক্ষাকে প্রাইমারী শিক্ষার নামে মসজিদ থেকে আলাদা করে। উদ্দেশ্য ছিলো ধর্ম বহির্ভূত প্রাইমারী শিক্ষার নামে বিজাতীয় দর্শনে শিক্ষাদান এবং মক্তবের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার বহির্ভূত ধর্মীয় শিক্ষা যা শুধু ধর্মীয় কাজ সমাধা করা যায়। এর ফলে একদিকে তৈরী হয়েছে স্যাকুলারিজমে বিশ্বাসী ধর্ম বিদ্বেষী; অন্যদিকে তৈরী হয়েছে কিছু ধর্মান্ধ। এরফলে বর্তমান সমাজে যে অরাজকতা বিরাজ করছে বা লেজে গোবরে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এর জন্য মূলতঃ দায়ী পরাধীন জাতির জন্য ইংরেজ সৃষ্ট দু'কিছিমের কু-শিক্ষানীতি।

আমাদের দেশে ইংরেজরা দু'কিছিমের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গেলেও তাদের দেশে শিক্ষানীতি ভিন্নতর। ইংরেজদের দেশে উচ্চ শিক্ষা – কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক। কিন্তু প্রতিটি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে বিরাট আকারের চার্চ। এ গুলোকে বলে চ্যাপল, আরো বড়ো হলে এবং অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য থাকলে বলা হয় – ক্যাথিড্রাল। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বা পর্ব উপলক্ষে সকলে সমবেত হয় চ্যাপলে। আমাদের দেশে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশন বা সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। ইউরোপ আমেরিকার স্কুল এবং কলেজে কিন্তু প্রতি কোর্স শেষে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। এ উপলক্ষে বের করা হয় দীর্ঘ শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা শুরু হয় গীর্জা বা খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে।

চার্চ স্কুল

ইউরোপ আমেরিকার শিশু শিক্ষাকে রাখা হয়েছে গীর্জার নিয়ন্ত্রণে। অনেক দেশেই গীর্জা নিরপেক্ষ কোনো প্রাইমারী স্কুল নেই। পাশ্চাত্যের প্রাইমারী স্কুলগুলোকে বলা হয় চার্চ স্কুল। চার্চ স্কুল শব্দটি দ্বারা বিশেষভাবে শিশুদের জন্যে পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন স্কুলকে বুঝায়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গীর্জার বাইরে থাকলেও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে প্রাইমারী বা শিশু শিক্ষাকে গীর্জার নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা আবশ্যক। পাশ্চাত্য সমাজে এটা স্বীকৃত।

যে সমাজের নাগরিকগণ ধর্মের প্রতি আস্থাবান, সে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি হলো ধর্ম। ধর্মের মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাসের ভাগই বেশি। সত্য বা মিথ্যা, সততা বা প্রতারণা, দায়িত্ববোধ বা দায়িত্বহীনতা ইত্যাদির তুলনামূলক মূল্যায়ন হয়তো

শিশুকে যুক্তি দিয়ে বুঝানো যায় কিন্তু সহজ হয় তার কচি মনে [illegible] ঈমানের বীজ বপন করে দেয়া।

দেরী করে স্কুলে যাওয়া বা দেরী করে অফিসে আসা, কোনো কাজে হাত দেয়া হলে তা অযথা ফেলে রাখা যে খারাপ – তা হয়তো যুক্তি দিয়ে বুঝানো যায়। কিন্তু তার নৈতিক বিশ্বাসকে আচরণে পরিণত করতে পারলে এ ধারণা ও অভ্যাস বেশি দিন স্থায়ী হয়। বয়স কালেও এ থেকে বিচ্যুতির সম্ভাবনা কম।

যে শিশু শবে ক্বদর বা শবে মে'রাজের রাতে মায়ের সাথে জেগে থেকে নামায পড়ে এবং পরের দিন রোযা রাখে তাকে হাজার যুক্তি দিয়ে অথবা মূর্তি পূজার মাহাত্মের উপর কয়েক ডজন পুস্তক পড়িয়ে কালীপূজা বা দূর্গা পূজা করানো যাবে না। হোক না সে নবী চরিত বা কুরআন হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ। এর কারণ, তার ঈমান এবং বিশ্বাস।

গীর্জা কেন্দ্রিক নৈতিক শিক্ষা

বৃটেন বা ইউরোপ-আমেরিকার ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সততা, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সেবা, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধকে বিশ্বাসে পরিণত করার তাগিদে শিশু শিক্ষাকে গীর্জা কেন্দ্রিক রাখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে শিশু শিক্ষাকে আমরা মসজিদ থেকে আলাদা করে দিয়েছি। এর ফলে জাতি আজ খেশারত দিচ্ছে ছড়ায়-গণ্ডায়। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে এর পরিনাম হয়েছে ভয়াবহ। ঘুষ, চুরি, প্রতারণা, সরকারী অর্থ আত্মসাতের মূল কারণ নৈতিক অবক্ষয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্ধেক অর্থই অপচয় হয় আমাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাবে। শিশু মনে নৈতিকতার বীজ বপন না করে অপরাধীদের জন্য কঠোর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শুধু কোর্ট কাছারীর ভয় দেখিয়ে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিশাপ থেকে সমাজকে রক্ষা করা যাবেনা। এর উদাহরণ খোঁজ করার জন্যে বেশি পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থাই প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাই মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে মানব সম্পদের উন্নয়ন ও জাতির অগ্রগতির স্বার্থে মসজিদ কেন্দ্রিক শিশু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আমাদের সমাজে অপরিহার্য।

কিন্ডারগার্টেন পরিচালনায় সচেতনতা

বাংলাদেশে বাহ্যিক ইসলামী চেতনাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই। এই সব ব্যক্তিরা ইসলাম ধর্মের সেবা করেন বটে; কিন্তু ইসলাম ধর্মকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে বর্তমানে তাঁরা কি কোন পরিশ্রম ও সময় বিনিয়োগ করেন ? এ প্রশ্ন শুধু আমার নয়। অনেকেরই।

এদেশে হাজার হাজার সচেতন দীনদার মুসলমান আছেন, যাঁরা মন-প্রাণ দিয়ে কামনা করেন যে, এদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিধান কায়েম হোক, খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানার ন্যায় যতোটুকু সম্ভব ফিরে আসুক। মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও রাসূল (সঃ)-এর হাদীস মেনে চলুক।

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে কালেমা তাইয়্যেবার হক আদায় করাই যথেষ্ট নয়, কালেমা শাহাদত-এর হকও আদায় করতে হবে, অন্য মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলাম কায়েম করতে হবে, সমাজে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, ইসলামী আখলাকের জন্যে ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে, তাঁরা নিছক ব্যক্তিগত ইবাদতে সন্তুষ্ট না থেকে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেও কিছু করতে চেষ্টা করেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও অন্যদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেবার জন্যে ওয়াজ-মাহফিল, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। বক্তা হলেও এ সমস্ত অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম ও রাসূলের বাণী কিছুটা শোনাতে এবং ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন।

একটু সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন হলে এ সমস্ত দ্বীনদার মুসলমানরা সমাজে ইসলাম বিরোধী যে সমস্ত ফাহেশা কাজকর্ম হচ্ছে তা আলোচনা করেন, সাহস একটু বেশি থাকলে অনৈসলামী বা ফাহেশা কাজের সরব প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেন।

যাঁরা মনে করেন প্রতিবাদ সমালোচনা করে তেমন কিছু হয় না, বরং নীরবে কাজ করে একটা ফোরকানীয়া মাক্তাব চালাতে পারলেও দ্বীনের কিছুটা অর্থবহ খিদমত হয়, তাঁরা বড় বড় কথা না বলে ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে নীরব সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে মসজিদ, মাক্তাব, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী পাঠাগার, মসজিদ পাঠাগার, এতিমখানা ইত্যাদি স্থাপনের জন্যে এগিয়ে আসেন।

নিজেরা যতোটুকু পারেন, টাকা পয়সা দান করেন, টাকা-পয়সা না থাকলে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক বা সময় সাদ্‌কাহ দিয়ে খালিস নিয়তে ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন।

অনেকে আবার আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অপেক্ষা ব্যক্তিগত খুদীর সন্তুষ্টির জন্য, সমাজে স্বীকৃতি, নেতৃত্ব ও প্রাধান্যের জন্যে এ সমস্ত ভালো কাজে যোগ দেন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে কাজ না করে নিজের সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করলে তারা হয়তো এ দুনিয়াতে পুরস্কৃত হবেন, পরকাল হারাবেন তবুও তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ বেশ উপকৃত হয়।

যে সমস্ত সচেতন মুসলমান মনে করেন, ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছাড়া ইসলামী সমাজ হতে পারে না এবং অনৈসলামী সমাজে ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব নয় বা কষ্টকর, তাঁরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম কায়েমের জন্যে ইসলামমুখী রাজনৈতিক আন্দোলনও করে থাকেন।

যা হোক, বর্তমান সমাজে ইসলামী কর্মসূচীর সাধারণ কতগুলো ধারা হলো – ওয়াজ-মাহফিল, ইসলামী সেমিনার, আলোচনা সভার আয়োজন করা, ইসলামী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেয়া, ইসলামী চেতনাসম্পন্ন লোকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, যোগাযোগ চালু করা, শলা-পরামর্শ করা, খানকাহ প্রতিষ্ঠা করা, ডানপন্থী রাজনীতি করা ইত্যাদি।

যাঁরা বিভিন্ন সামাজিক ও নাগরিক জীবনে ইসলামী ভাবধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন, তাঁদের করণীয় একটি বিশেষ দিক হতে পারে, শহরে ইসলামী কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা। এ বিশেষ দিকটার প্রতি আমরা অত্যন্ত অসচেতন।

আমাদের উদাসীনতা ও অবহেলার কারণে আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ইসলামী চেতনার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাগজে দাগ কাটলে মুছে যায়, কিন্তু পাথরে দাগ কাটলে তা মুছে যায় না। বয়স্কদের মনে দ্বীনের কথা শুনিয়ে ইসলামী আদর্শের দাগ কাটাবার চেষ্টা কিছুটা কঠিন – তা সহজে মুছে যায়। কিন্তু শিশু-কিশোরদের নরম মনে যদি ইসলামের দাগ কেটে দেয়া যায়, তা পাথরে কাটা দাগের মতো গভীর হয় – যা সহজে মুছে না।

পারিবারিক পরিবেশে মায়ের শিক্ষায় যে ছেলে মুসলিম জীবনের আদর্শের ছাপ নিয়ে গড়ে উঠে, তাকে অমুসলমান বানানো যায় না। তেমনি মুসলমান মায়ের কোলে অমুসলমান পরিবেশে গড়ে উঠা ছেলেকে মুসলমান বানানো বড়ই কষ্টকর। অথচ এই চিরন্তন এবং শাশ্বত সত্যটি আমরা অনুধাবন করছি না।

শহরে শিশুরা স্কুলে কি শিখছে, সেদিকে আমাদের খেয়াল নেই। স্কুল কলেজ পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে যখন তাদের ভিন্ন রূপ দেখি, তখন আমরা আঁতকে উঠি। সেমিনার করি, জাঁকজমকের সাথে মিলাদ-মাহফিল করি, বড় বড় তাফসীর মাহফিল করি, আরো কতভাবে চেষ্টা তদবীর করি, কিন্তু এসব সত্ত্বেও সমাজের যুবকদের দূরের কথা, নিজের সন্তানকে নিজে যা বিশ্বাস করি এবং ভালো জানি তার প্রতি আস্থাশীল রাখতে পারছি কই?

আমাদের এই ব্যর্থতার প্রধান কারণই হলো শিশু শিক্ষার প্রতি চরম উদাসীনতা ও অমনোযোগ। বর্তমান দুর্দশা এবং পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রয়োজন শিশু শিক্ষাকে কি করে ইসলামীকরণ করা যায় – সেদিকে চিন্তা-ভাবনা করা।

সীমিত পর্যায়ে বড় বড় শহরের শহুরে পরিবেশে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলির জনপ্রিয়তা ও আর্থিক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের উচিত প্রতিটি মহল্লায়, সম্ভব হলে প্রতিটি মসজিদের সাথে ইসলামী কিন্ডারগার্টেন সংগঠন করা। এটি এমন একটি পদ্ধতি, যাতে অন্যের কাছে হাত না পেতেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হয়ে ইসলামী কাজ করা যায়।

একদিকে [illegible] মক্তবে ছেলেমেয়ে পাঠানো নাগরিক সমাজে সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে বাড়ীতে কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে দু'শত টাকা বেতনে প্রাইভেট [illegible] টিউটর রাখাও অনেকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, যেক্ষেত্রে ৪০ বছর আগে

গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন কোনো শিক্ষিত সন্তান ছিলো না, যে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন না; সেখানে, শহরের মধ্যবিত্ত নয়, এমনকি ধানমন্ডি-বনানীর ইসলামী চেতনাসম্পন্ন উচ্চবিত্তদের অনেকের সন্তানকেও কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

সম্প্রতি একটি তথ্যে জানা যায়, ব্রিটিশ আমলে বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষিতের হার ছিলো সর্বনিম্নে। তা সত্ত্বেও এ দেশের শতকরা ৪৫ জনেরও বেশি মুসলমান কুরআন পড়তে পারতেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে মাত্র ৫ শতাংশ মুসলমান কুরআন পাঠ করতে পারে। অথচ সাধারণ শিক্ষিতের হার ৪০% মতান্তরে ৬০% ভাগ।

আল্লাহ্র কালাম বুঝে হোক কিংবা না বুঝে হোক– অন্য কোনো শিক্ষার সংগে এর কোনো তুলনাই হতে পারে না। এ সমস্যার সমাধান কী? এক কথায়, সমাধান হলো ইসলামী কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করা। সে সমস্ত কিন্ডারগার্টেনে কুরআন তিলাওয়াত, শুদ্ধভাবে সূরা-কিরাত শিক্ষাদান অবশ্য পাঠ্য হবে।

কিন্ডারগার্টেন পরিচালনা কারা করবেন ?

ইসলামী কিন্ডারগার্টেন যুগের দাবী। বর্তমান যুগে-সমস্যার সমাধানের জন্যে আমাদের ইসলামী কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ইসলামী কিন্ডারগার্টেন করার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা আমাদের নেই।

প্রচলিত স্কুল/মাদ্রাসা পরিচালনা

এই স্কুল, মাদ্রাসা, প্রাইমারী স্কুল, ফোরকানীয়া ইত্যাদি কিভাবে করা যায় এবং কিভাবে পরিচালনা করা হয়, এর সংগে আমাদের মোটামুটি পরিচয় এবং ধারণা অনেকেরই আছে।

কিন্ডারগার্টেন একটি বিদেশী ব্যবস্থা। এদেশে পাশ্চাত্যাভিমুখী এবং নাক উঁচা বড় লোকেরাই তাদের ছেলেমেয়েদেরকে অতীতে কিন্ডারগার্টেন ও মিশন স্কুলে পাঠাতেন। তাই, খুব কম অভিভাবকের কিন্ডারগার্টেন স্কুল পরিচালনা পদ্ধতি, সিলেবাস ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা আছে। যে বিষয়ে ধারণা বা জ্ঞান নেই, তা আমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে কঠিন বলে মনে হবে। আসলে ব্যাপারটা মোটেই কঠিন নয়।

ইমাম কর্তৃক কিন্ডারগার্টেন পরিচালনা

ঢাকা শহরে এমন বহু ইমাম আছেন, যাঁরা এক মাসের প্রশিক্ষণ পেলে মসজিদের সাথে কিন্ডারগার্টেন বা আধুনিক ফোরকানীয়া মাক্তাব চালাতে পারবেন। কিন্ডারগার্টেন পরিচালন পদ্ধতি যে কঠিন কিছুই নয়, তা বুঝাবার জন্যই অধ্যক্ষ আলমগীর রচিত 'ইসলামী কিন্ডারগার্টেন' পুস্তকটি সহায়ক হতে পারে। যাঁরা পূর্বে কোনো কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ধারে কাছেও যান নি এবং মনে করতেন কিন্ডারগার্টেন শুধু খ্রীষ্টান মিশনারী বা ইংরেজী শিক্ষিত এম. এ.; এম. এস. সি. পাস ব্যক্তিবর্গই চালাতে পারেন – আশা করি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত "ইসলামী কিন্ডারগার্টেন" পুস্তক পাঠে তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণার কিছুটা নিরসন হবে।

পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা যে শুধু লেখাপড়া শিখলেই করা যায় তা নয়। লক্ষ লক্ষ ইংরেজী শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক আছেন, যাঁরা চাকুরী করা ছাড়া উন্নত জীবিকার জন্য তেমন কিছু করতে পারেন না, অথচ কতো কম শিক্ষিত লোক লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করছেন। স্যুট টাইয়ের গিঁট বাঁধতে হলে যাঁরা মাঘ মাসের শীতের রাতেও ঘেমে উঠবেন, তাঁদের মতো অনেক ব্যবসায়ী নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দু'শ/আড়াই'শ টাই পরা বাবুদের খাটিয়ে বেতন দিচ্ছেন। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জ্ঞান শুধুমাত্র শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। এ জন্য ইল্‌ম যতটুকু দরকার, হিলম তার চেয়ে বেশি দরকার।

অনুদান ভিত্তিক মাদ্রাসা পরিচালনাকারী

যাকাত, সাদ্‌কাহ্, ফিতরা, কোরবানীর চামড়া ও টাকা আদায় করে বিনা বেতনে যে মৌলভী সাহেব একটি ফোরকানীয়া মাক্তাব চালাতে পারেন, তাঁর চেয়ে অনেক কম বুদ্ধি নিয়েও কিন্ডারগার্টেন স্কুল পরিচালনা করা যায়। বিশেষ করে কিন্ডারগার্টেন স্কুল

পরিচালনার জন্য মসজিদের [illegible] [illegible] [illegible] বা মসজিদের [illegible] [illegible] প্রয়োজন হবে না। বরং কিন্ডারগার্টেন স্কুল পরিচালনার জন্য মাসিক বেতন হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন।

তা ছাড়া, কিন্ডারগার্টেনগুলি মসজিদ সংলগ্ন হলে এবং 'আধুনিক ফোরকানীয়া' বা কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা' এ জাতীয় নাম দেয়া হলে এবং কুরআন তিলাওয়াত অবশ্যই পাঠ্য থাকলে বহু বিত্তশালী ধর্মপ্রাণ মুসল্লীরা আনন্দচিত্তে দানের হস্ত প্রসারিত করবেন। স্বল্প বিত্তশালীরা স্বত:স্ফূর্তভাবে চেয়ার, টেবিল, আলমারী, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দেবেন।

চট্টগ্রামের বায়তুশ-শরফের পীর সাহেব কিবলা 'আদর্শ মাদ্রাসা' নামে একটি ইসলামী কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেছেন। কোনো পীর সাহেব কিবলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এটাই আমার জানা মতে প্রথম। বিংশ শতকের শেষ দশকে ঢাকায় বহু ইসলামী কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। ছাত্র প্রতি বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা বেতন ভাতা গ্রহণকারী আবাসিক ইসলামী কিন্ডারগার্টেন উত্তরা মডেল টাউনেও গড়ে উঠেছে।

পরিচালনা ও শিক্ষকতা এক নয়

মসজিদের ইমাম সাহেব কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে তাঁকে যে ইংরেজী ওয়ার্ডবুক বা ইংরেজী পড়াতে হবে, তা নয়। তাঁর থাকবে সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব। তিনি শিক্ষা দেবেন কুরআন তিলাওয়াত। ইংরেজী, বাংলা, ধারাপাত শিক্ষার জন্য নিয়োগ করবেন অন্য শিক্ষক। ইংরেজী ওয়ার্ড-বুক এবং বাংলা নিজে পড়াতে না পারলেও কয়েকদিন দেখার পর সহজেই বুঝতে পারবেন কোন্ শিক্ষক ভাল পড়াচ্ছেন, কে ফাঁকি দিচ্ছেন এবং কে ভুল পড়াচ্ছেন।

গ্রামের হাই স্কুলগুলি যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের কতোজন ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত ? এম.এ., এম.এস.সি., বি.টি. পাস হেড মাস্টার-এর যোগ্যতা ও দক্ষতা কতটুকু, তা প্রাইমারী স্কুল পাস করা সেক্রেটারী ঠিকই বুঝতে পারেন। মোট কথা, কিন্ডারগার্টেন পরিচালনা এমন কোনো জটিল কাজ নয় যে, একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ইমাম বা সমাজকর্মী তা পরিচালনা করতে পারবেন না।

মাদ্রাসা শিক্ষার নব দিগন্ত

ঢাকা মহানগরীতে এবং দেশের অন্যান্য শহরগুলিতেও ইসলামী চেতনাসম্পন্ন কর্মীদের উদ্যোগে কিছু কিছু ইসলামী কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠছে। এগুলি যেহেতু পারস্পরিক সংযোগ এবং সমন্বয় ছাড়া বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে, তাই একটির সাথে আর একটির ততোটুকু মিল নেই।

পিতামাতাই চান নিজে ধর্মবিমুখ বা ধর্মনিরপেক্ষ হলেও নিজ সন্তান ধর্মভীরু হোক। তাই যদি দেখেন, কোনো স্কুলের ছেলে-মেয়েরা হামদ্-না'ত গাইছে, জুহরের সালাতের সময় লাইন বেঁধে সালাতে যাচ্ছে, মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকেন এবং মনে মনে ভাবেন, ইসলামী পরিবেশে ছেলেগুলি মানুষ হচ্ছে !

ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনা কতোটুকু সৃষ্টি হবে তা নির্ভর করে শিক্ষক ও ব্যবস্থাপকদের নিজস্ব প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার উপর। বিভিন্ন শহরে বহু স্কুল কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে ইতোমধ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। তাই, আমরা মনে করি এ সম্বন্ধে ইসলামী

শিক্ষাবিদদের ও বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। অধ্যক্ষ [illegible] রচিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলামী কিন্ডারগার্টেন' পুস্তকটি এ চিন্তা-ভাবনার জন্য একটি ওয়ার্কিং পেপারও বলা যেতে পারে।

এ পুস্তকের লেখক রচিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'মসজিদ পাঠাগার' শীর্ষক পুস্তকটির প্রতিপাদ্য ছিল মসজিদ পাঠাগারের গঠনতন্ত্র, পরিচালনা পদ্ধতি ও নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়। উক্ত পুস্তকখানা এবং সরকার থেকে প্রদত্ত পনের লক্ষ টাকার পুস্তক সাহায্য দেয়ার ফলে বছর খানেকের মধ্যেই দেখা যায় প্রায় ছ'শ মসজিদ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মসজিদ পাঠাগার ক্রমশঃ একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'ইসলামী পাঠাগার' পুস্তকটির ন্যায় "ইসলামী কিন্ডারগার্টেন" শীর্ষক পুস্তকটিও প্রকাশিত হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে। ইসলামী কিন্ডারগার্টেন স্কুল পরিচালনায় এ পুস্তকটি আমাদের সহায়ক হবে।

একটি আধুনিক সমাজের চেহারা সে সমাজের আমলা এবং বুদ্ধিজীবীদের মানস ও চিন্তাধারারই প্রতিফলন। যদি আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলামী আদর্শে পুনর্গঠিত দেখতে চাই, তবে আমাদের শিক্ষা কর্মসূচীর সর্বপ্রথম টার্গেট গ্রুপ হবে ঐ সমস্ত ছেলেমেয়ে – শিক্ষাজীবনের শেষে যারা হবে পদস্থ আমলা, বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, শিল্পপতি, বড়ো ব্যবসায়ী, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। আমরা পছন্দ করি বা না করি, অপ্রিয় হলেও সত্য যে, প্রতিভাবান ছাত্রদের অধিকাংশই আসবে ব্যয়বহুল ও উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন কর্মীদের মনোযোগ উন্নতমানের অর্থনৈতিক স্বনির্ভর ইসলামী কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়োজিত হওয়া উচিত। অথচ এ প্রয়োজনীয় দিকটির প্রতি রয়েছে আমাদের চরম উপেক্ষা ও বেদনাদায়ক উদাসীনতা।

পঞ্চম অধ্যায়

ফোরকানীয়া মাক্তাব

ফোরকানীয়া মাক্তাব আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। তারও বেশি। মক্কায় যখন আমাদের প্রিয় নবী ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন আরব দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল সতের জন (মতান্তরে ১৯ জন)। হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন এই সতের বা উনিশ জনের অন্যতম। মক্কায় প্রকাশ্যভাবে ইসলামী শিক্ষাদানের জন্যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা মাক্তাব স্থাপন সম্ভব ছিল না। সাহাবী আরকাম এর গৃহ (বাইতুল আরকাম) ছিল মুসলিমদের গোপন শিক্ষা কেন্দ্র। মদীনায় স্থাপিত হলো ইসলামের ইতিহাসের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান – মসজিদুন্নবী বা নবীর মসজিদ। প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)। মদীনার সেদিনকার ফোরকানীয়া মাক্তাবের অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ উম্মে মাকতুম (রাঃ), হযরত আবু বাকার (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ) – এমনি আরও জালিলুল কদর সাহাবীবৃন্দ।

মসজিদে নববী

মদীনার মসজিদে নববী শুধুমাত্র ইবাদতের কেন্দ্র ছিল না। এর কর্মপরিধি বহু দিকে বিস্তৃত ছিল। এটা ছিল দারুল হুকুমাত বা রাষ্ট্র ভবন। এ গৃহ শুধু প্রাথমিক ফোরকানীয়া শিক্ষাকেন্দ্রই ছিল না; মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম শিক্ষকের ভাষণও সাহাবীগণ এখানেই শুনতেন। এটা ছিল ইসলামী জীবনদর্শনের শিক্ষা কেন্দ্র। সিহাহ্ সিত্তার সংকলিত হাদীসের অধিকাংশই বর্ণিত হয়েছে এখানে। এখানেই গড়ে উঠেছে মুসলিম খিলাফতের সবচেয়ে বড় কুতুবখানা এবং লাইব্রেরী। সাহাবীগণ এখানেই ইসলামী আখলাকের সবক পেতেন। নব-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত ও জারী হতো এখান থেকেই।

মদীনার মসজিদে এবং প্রাঙ্গণে হাদীসের তালিম ছাড়া আরও একটি বিষয় শিক্ষা দেয়া হতো। এটা ছিল সামরিক শিক্ষা। আজকালকার মিলিটারী একাডেমী বা ক্যাডেট কলেজে যা শিক্ষা দেয়া হয়, তৎকালীন পরিবেশে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ও সামরিক শিক্ষাও মদীনার মসজিদেই দেয়া হতো।

আমাদের ফোরকানীয়া মাক্তাবে যদিও সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন সম্ভব নয়, তবু শরীর চর্চা, ব্যায়াম ইত্যাদি অবশ্যই পাঠ্য তালিকায় থাকা উচিত এবং তা অনুসৃত। তৎকালীন মুসলিম মুজাহিদরা নতুন দেশ জয় করার পর আবাসস্থল নির্মাণের পূর্বেই

[illegible] ছিলেন দু'টি গৃহ – একটি মসজিদ এবং অন্যটি মাক্তাব। ইমাম গাযালী (রঃ) হযরত আবদুল কাদের জিলানীরও (রঃ) শিক্ষার স্থান ছিল মসজিদ কুত্তুবখানা।

আল-কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা কেন্দ্র

মসজিদে মুসলমানরা আল্লাহ্‌কে সিজদা করে, নামায পড়ে। কিন্তু সিজদা করার সাথে সাথে নামায রোযা ও অন্যান্য দ্বীনি বিষয় শিক্ষা করাও প্রয়োজন এবং নামায পড়ার পূর্বেই নামায কিভাবে পড়তে হবে তা শিক্ষা করা জরুরী। মসজিদে আল্লাহ্‌র ইবাদত হয়, মাক্তাবে আল্লাহ্‌র বান্দাকে ইবাদতের তরীকা শিক্ষা দেয়া হয়। তাই মসজিদ এবং মাক্তাব এ দু'টো পাশাপাশি গড়ে উঠেছে।

একজন মুসলমান সবচেয়ে বেশি কোন্ গ্রন্থ পাঠ করে? কোন্ গ্রন্থ পাঠ করে মুমিন ক্লান্ত হয় না বা পড়া হয়ে গেছে, আর পড়ার প্রয়োজন নেই – এরূপ মনে করে না? বৃদ্ধ বয়সে যখন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, যখন কোনো বই পড়তে আর ভালো লাগে না, তখন কোন্ গ্রন্থ একজন মুসলমান আঁকড়ে ধরে? এ প্রশ্নের জবাব একটাই – 'আল-কুরআন', 'আল-কুরআন'।

আজও এই আল-কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার তাগিদ এবং প্রয়োজন মেটাচ্ছে ফোরকানীয়া মাক্তাব। যতদিন আল-কুরআন তিলাওয়াতের প্রবণতা থাকবে এবং আল-কুরআন অপেক্ষা অন্য কোনো উন্নততর বিকল্প আবিষ্কৃত না হবে, ততদিন ফোরকানীয়া মাক্তাব টিকে থাকবে, ফোরকানীয়া মাক্তাবের ঐতিহ্য প্রাচীনতর হবে। আল-কুরআনের অপর নাম ফুরকান। আল-কুরআন সত্য মিথ্যার মাঝে ফরক বা পার্থক্য করে বলে একে ফুরক্বান বলা হয়। মাক্তাবে আল-ফুরক্বান শিক্ষা দেয়া হয়। তাই মাক্তাবকে বলা হয় ফোরকানীয়া মাক্তাব। যে স্থানে কিতাব চর্চা বা পড়া লেখা হয় তাকে আরবীতে মাক্তাব বলে। অফিসে লেখা পড়া হয়। তাই অফিসকেও আরবীতে মাক্তাব বলা হয়।

গণশিক্ষা কেন্দ্র

পাক-ভারত উপমহাদেশে ফোরকানীয়া মাক্তাবের ইতিহাস অনেক পুরনো। প্রাচীন মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে কতগুলো মসজিদ ও মাক্তাব। মাদ্রাসা এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয় – বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মসজিদ ও মাক্তাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের সর্বত্র। মুসলিম দুনিয়াতে উচ্চ শিক্ষার প্রচলন যাই থাকুক না কেন গণশিক্ষা ছিল ব্যাপক। ফোরকানীয়া মাক্তাব ছিল গণশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। মাক্তাবের মাধ্যমে মুসলমানরা জ্ঞান শিক্ষার প্রথম আলো পেতো।

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা কেন্দ্র

প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য জ্ঞান শিক্ষা ফরয। এ ফরয আদায়ের জন্য সমাজ এবং রাষ্ট্রও ছিল তৎপর। তাদের তৎপরতা প্রকাশ পেয়েছিল ফোরকানীয়া মাক্তাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তখনকার দিনে বর্তমানের প্রাইমারী স্কুলের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। সাধারণ নাগরিক, উচ্চ পদস্থ কর্মচারী, ব্যবসায়ী-দোকানদার, আমীর-উমরাহ্ এমনকি সুলতান ও বাদশাহ'র সন্তানদের শিক্ষাও শুরু হতো মাক্তাবে। সে আমলে ফোরকানীয়া মাক্তাবের যে কতটা গুরুত্ব ছিল তা বাদশাহ হারুন-অর-রশীদের জীবনের একটি ঘটনা থেকেই জানা যায়।

খলিফা-আর-রশীদের এক ছেলের নাম ছিল মামুন-অর-রশীদ। ছেলেকে কুরআন তিলাওয়াত শেখাতে হবে। খলিফা দেশের সবচেয়ে নামকরা ক্বারীকে প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন এবং ছেলেকে কুরআন শরীফ তা'লিম দেয়ার কথা বললেন। ক্বারী সাহেব ঘৃণাভরে বাদশার এই নির্দেশ উপেক্ষা করলেন। তিনি বললেন, ছাত্র শিক্ষকের কাছে যায়। শিক্ষক ছাত্রের কাছে যায় না। খলিফা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং ক্বারীর বাড়ীতে ছেলেকে পড়তে পাঠালেন।

ফোরকানীয়া পদ্ধতির অবক্ষয় শুরু

মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবময় ভূমিকা এক সময় খুবই ম্লান হয়ে পড়লো। মুসলমানদের স্বাধীনতার বিলুপ্তির পরপরই শুরু হয় এই অবক্ষয়ের পালা।

আযাদী হারিয়ে মুসলমানরা যখন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ হতে লাগল, তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও গতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন শুরু হলো। বিদেশী প্রভুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুরআন হাদীস, দ্বীনিয়াত, ইসলামী নৈতিকতাবোধ, মুনকার-মারুফ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান পছন্দ করেনি। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচী হতে এগুলো ক্রমান্বয়ে বাদ পড়ে যায়।

মুসলিম শাসনামলে মাক্‌তাবসমূহ চলতো সরকারী অর্থানুকূল্যে। সারা বাংলার মোট জমির চার ভাগের এক ভাগ ওয়াক্‌ফ ছিল মসজিদ, মাদ্রাসা, দরগার জন্য। পরবর্তীকালে জমিদারী প্রথা চালু হওয়ার পর ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বিরাট অংশ জমিদারদের দখলে চলে যায়।

সরকারী অনুদান ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে মাক্‌তাবগুলোর পক্ষে ইতিহাস, ভূগোল, অংক, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান কষ্টকর হয়ে পড়ে। সাথে সাথে প্রাইমারী স্কুল জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী অর্থানুকূল্যে গড়ে ওঠে। ফলে এক সময়ে যারা মাক্‌তাবে শিক্ষকতা করতেন, তাঁরা মাক্‌তাব ছেড়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে শুরু করেন।

দু'শত বছরের উপেক্ষার পরিণতি

বেতন-ভাতা, টাকা-পয়সা না পেয়েও মাক্‌তাবের মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন কুরআন হাদীস ও দ্বীনিয়াতের শিক্ষকরা। জনগণের কাছ থেকে দান, যাকাত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে, মাক্‌তাবগুলো কোনো প্রকারে চলতে থাকে।

আযাদী বিলুপ্তির পর সরকারী অর্থানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে মাক্‌তাবে শুধু যে বিজ্ঞান, ভূগোল, অংক শিক্ষাই বন্ধ হয়ে গেল তা নয়, কুরআন হাদীস দ্বীনিয়াত শিক্ষার মানও অনেকখানি নিচে নেমে যায়। প্রবল ধর্মপ্রাণ না হলে অপেক্ষাকৃত প্রতিভাবান শিক্ষকরা মাক্‌তাবের শিক্ষক না হয়ে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক হওয়াই পছন্দ করতেন।

প্রতিভাবান শিক্ষকদের মাক্‌তাব ত্যাগ করার ফলে প্রতিভাবান ছাত্ররাও মাকতবে অধ্যয়নে নিরুৎসাহিত বোধ করে মাক্‌তব ছেড়ে চলে যায়। এ অবস্থা চলতে থাকে প্রায় দু'শো বছর। এ দীর্ঘ সময়ের উপেক্ষা অবহেলার কারণে মাক্‌তাবের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। দেশে ইসলামী শিক্ষার প্রভাবও অনেকখানি কমে যায়।

পাকিস্তান আমল

বৃটিশ আমলে মাকতাবের প্রতি উপেক্ষা ও উদাসীনতা। ১৯৪৭ সনের পর তার পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাষ্ট্রক্ষমতা যাঁদের হাতে আসে, রাজনৈতিক স্বার্থে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে তাঁরা ইসলামকে ব্যবহার করেন। কিন্তু শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী বিধান প্রণয়নের প্রতি ছিলেন উদাসীন। শ্লোগান হিসাবে ইসলামকে ব্যবহার করে কিছুকাল পর্যন্ত মানুষকে ধোঁকা দেয়া যায়। কিন্তু, যুগ যুগ ধরে তা সম্ভব নয়। এর ফলে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তান হাসিল হয়েছিলো তা পালনে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ব্যর্থ হয়। স্বাভাবিক ভাবেই জনগণ শাসকদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়।

এই বিক্ষুব্ধতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংযুক্ত পাকিস্তানের শেষ দশ বছর। বাঙালী মুসলমানদের জন্য এই দশ বছর ছিলো অনেকটা বিক্ষোভ, অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় আচ্ছন্ন। নতুন করে ১৯৭১ সালে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্রতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পর আমাদের উচিত ছিলো সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের উপযোগী যেসব প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যগতভাবে যুগ যুগ ধরে কালজয়ী হয়ে টিকে আছে, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন, মজবুত ও জাতীয় অগ্রগতির বাহন হিসেবে সংগঠিত করা।

সরকারী অর্থানুকূল্য ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকা কষ্টকর। আমাদের দেশে যে ৪০,০০০ এর বেশি প্রাইমারী স্কুল আছে, সরকার থেকে বেতন দেয়া বন্ধ হলে দশ হাজারও টিকবে কিনা সন্দেহ। সরকারী প্রাইমারী স্কুল ছাড়া কিছু সংখ্যক বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলও আছে। এগুলো টিকে আছে এ জন্য যে ৩-৪ বছর কোনো প্রকারে চালিয়ে নিতে পারলে সরকার তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরকারীকরণের সম্ভাবনা না থাকলে এ সমস্ত স্কুলের অনেকগুলোই অকালে ধ্বংস হয়ে যেতো।

অনুভূত প্রয়োজন

তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রাইমারী স্কুলগুলোর চেয়ে মাকতাবের চাহিদা জনগণের কাছে অনেক বেশি। দু'শ বছরের সরকারী উপেক্ষা ও অবহেলার পরও বেসরকারীয়া মাকতাবগুলো টিকে থাকার ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিকল্পনা বিশারদগণ পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বলে থাকেন, যে সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজন জনগণ নিজেরা অনুভব করে থাকে এবং যার জন্যে তারা অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত, সে সমস্ত প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেয়া হয়। এই মানদণ্ডে বিচার করলে প্রাইমারী স্কুলের চেয়ে মাকতাবই অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী। তাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে মাকতাবের প্রতি দু'শ বছরের সরকারী উপেক্ষা ও বৈরীভাবের পরিবর্তন হওয়া জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন।

ফোরকানীয়া ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি

ফোরকানীয়া মাক্তাবগুলো মরে যাচ্ছে

আমি ফোরকানীয়া মাক্তাবের ছাত্র ছিলাম। ফোরকানীয়া উস্তাদ মরহুম মোহাম্মদ উল্লাহ মৌলভী সাহেবের কাছেই আমার শিক্ষার বিসমিল্লাহ্। তাঁর কাছে আংশিক কুরআন তিলাওয়াত শিখেছি। এরপর দীর্ঘদিন পর্যায়ক্রমে বহু নামকরা শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন করেছি। আজও করছি। এরপর বিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, দেশে বিদেশে জ্ঞান অর্জন করেছি। কিন্তু ফোরকানীয়ার মৌলভী সাহেবের কাছে যা শিখেছি, কোনো কিছুর সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে কি ? ফোরকানীয়া মাক্তাবের শিক্ষক মৌলভী মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেব আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করেছেন আমাকে শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত শিখাতে।

আমার সারা জীবনের সমস্ত শিক্ষা একদিকে রাখলে আর সূরা ফাতিহা অন্যদিকে রাখলে, কোন্ দিকের পাল্লা ভারী হবে ? জবাবের প্রয়োজন নেই। ফোরকানীয়া শিক্ষক মুহাম্মদ উল্লাহ্ যতটুকু শ্রদ্ধা আমার পেয়েছেন ততোটুকু কি আর কেউ পেয়েছেন ? কেন তাঁর বিশেষ স্থান ? কারণ একটি এবং অতি সহজ। তিনি তিলাওয়াত করতে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর কালাম।

যে ফোরকানীয়া শিক্ষার অতো গুরুত্ব এবং ফোরকানীয়া উস্তাদের অতো সম্মান, সে ফোরকানীয়া মাক্তাবগুলি ক্রমশ মরে যাচ্ছে। হৃদয়ে ব্যথা লাগে। শহরে, নগরে নতুন জনপদ গড়ে ওঠে। কিন্তু ফোরকানীয়া মাক্তাব প্রতিষ্ঠা হয় না। গ্রাম বাংলার উদার আকাশের নিচে উন্মুক্ত প্রান্তরে ছুটাছুটি করে যাদের শৈশব কাটে, তাদের অনেকের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় আজও ফোরকানীয়ায়। অথচ গ্রামেও ফোরকানীয়া মাক্তাব উঠে যাচ্ছে।

আজকাল শহরবাসী যারা ছেলেমেয়েকে সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্যে আধুনিক উচ্চ শিক্ষা প্রদান করতে চান, তাদের কয়জন নিজের সন্তানকে ফোরকানীয়া মাক্তাবে পাঠাতে রাজী হবেন ? অন্যের কথা নাই বা বললাম, যে ফোরকানীয়া শিক্ষার প্রতি আমার এত অনুরাগ, আমার নিজের সন্তানকে ফোরকানীয়া মাক্তাবে পাঠাতে আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করেছি ?

কিণ্ডারগার্টেন গড়ে উঠছে

এক দিকে ফোরকানীয়া মাক্তাবগুলি মরছে, অন্যদিকে কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলি গড়ে উঠছে। শুধু গড়ে উঠছে বললে হয়তো কম বলা হবে। ঢাকা শহরে কিণ্ডারগার্টেন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে। ফোরকানীয়া মাক্তাবে বেতন দিতে হয়না অথবা দিলেও নাম মাত্র। তবুও, বিনা পয়সায় বিদ্যা অর্জনের জন্য সন্তান পাঠাতে চাই না, অন্যদিকে কিণ্ডারগার্টেনে সন্তান পাঠাতে আমরা উদগ্রীব। মানারাত, হেরাল্ড প্রভৃতি কিণ্ডারগার্টেনে শিশুর মাসিক বেতন ১৫০০ টাকা বা অনুরূপ। তদুপরি আছে বহু রকমের ফি। আল হেরা স্কুলে (আবাসিক) বার্ষিক বেতন ৫০,০০০ টাকা। এতো টাকা দিয়েও

তো দেখছি লোকজন কিণ্ডারগার্টেনে সন্তান পাঠাতে আগ্রহী। অভিভাবকদের আগ্রহের কারণে প্রতি বছর ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচন্ড ভীড়। অনেক অভিভাবক ভর্তি করাতে ব্যর্থ হন। বাদশাহ ফয়সল ইনস্টিটিউটে (ইসলামী কিণ্ডারগার্টেন) ছাত্র ভূর্তি করাতে গলদঘর্ম হতে হয়, বহু তদবির করতে হয়।

পারিবারিক কিণ্ডারগার্টেন

কিণ্ডারগার্টেন এখন এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যে, কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠান স্কুলের মতো পরিবেশে হতে হবে – তেমন প্রয়োজন নেই। একটি কিণ্ডারগার্টেন প্রাইভেট হোম বা নিবাসে হলেও পিতামাতা কিণ্ডারগার্টেনে আপন সন্তানকে দিতে উদ্‌গ্রীব। বিভিন্ন মহল্লায় পারিবারিক স্কুল হিসেবে কিণ্ডারগার্টেন হোম গড়ে উঠছে।

পাঁচ কক্ষবিশিষ্ট একটি বাসগৃহের ৩টি কক্ষে সকাল বেলা কিণ্ডারগার্টেন স্কুল বসানো যায়, যার প্রধান শিক্ষয়িত্রী হলেন গৃহকর্ত্রী নিজে। অনেক ক্ষেত্রে গৃহকর্তারাও ৯টা পর্যন্ত থাকেন শিক্ষক হিসাবে। ৪০–৫০ টি ছাত্র হলেই এরূপ কিণ্ডারগার্টেন স্কুল সকাল ১১টা পর্যন্ত চলতে পারে এবং চলছে। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকদের বেতনও খুব বেশি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অথবা পাড়ার শিক্ষিতা মহিলারাই অনেক ক্ষেত্রে এ সমস্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। ৩–৪ ঘন্টা কাজ করে যা কিছু পান, তা'ই তাদের লাভ।

একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার মান অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভর করে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী বা পরিচালকের আন্তরিকতা ও পাঠদানের দক্ষতার উপর। পারিবারিক কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলো যে ভালো মডেল হতে পারে তা নয়। কিন্তু বর্তমান নাগরিক জীবনের প্রয়োজনে নিম্নমানের হলেও এগুলো চলছে এবং বেশি সংখ্যায় চলবে।

ভাঙা গড়াই নিয়তির খেলা। ফোরকানীয়া মাক্‌তাব ভাঙছে, কিণ্ডারগার্টেন গড়ছে। এটা কি নিয়তির খেলা, না ইসলাম-দরদী সমাজকর্মীদের মানসিক জড়তা ও স্থবিরতার ফল ? কেন একটি ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি ভেঙে পড়ছে এবং অন্য একটি বিদেশী ব্যবস্থা, এমন কি ইসলাম-দরদীদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়, তাদেরই প্রয়োজনে গড়ে উঠছে, তা অনুধাবন এবং বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

কেন ফোরকানীয়াগুলো মরছে ?

ফোরকানীয়াগুলো মরে যাচ্ছে, কারণ এগুলো যুগের দাবী এবং প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। ফোরকানীয়া শিক্ষা-পদ্ধতি সেকেলে, পুরানো। এর উপর কোনো গবেষণা হয়নি। আগের দিনে বয়স বেশি হলে লেখাপড়া শুরু হতো। কিন্তু আজকাল প্রতিযোগিতামূলক সমাজে লেখাপড়া শুরু করতে হয় চার বছর বয়স হতে। চার বছরের শিশুকে লেখাপড়া শেখাবার পদ্ধতি এবং ৭ বছরের ছেলে-মেয়েকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি এক হতে পারে না।

ফোরকানীয়া পদ্ধতিতে আমরা শিশুকে শিক্ষা দানের কোনো নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারিনি। ৩–৫ বছরের শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে খেলাধুলার মাধ্যমে। অথচ আমাদের মতো সনাতন ফোরকানীয়া পদ্ধতিতে প্লে-গ্রুপ কনসেপ্ট বা খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দানের কোন ধারণাই নেই।

কোনো কোনো ফোরকানীয়াতে আজও 'বেত্র' মহাশয় প্রবল প্রতাপে বিরাজমান। শিশু বেত দেখলে হয়তো ভয়ে শিখবে, কিন্তু তার অবচেতন মনে শিক্ষার প্রতি সৃষ্টি হবে ঘৃণা ও ভীতি।

ফোরকানীয়া-উস্তাদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ এস. এস. সি. পাশ প্রাইমারী শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ফোরকানীয়া-উস্তাদগণ শিশু মনস্তত্ত্ব বলে যে একটি বস্তু আছে তার হয়তো খবরই রাখেন না। যাঁরা বুদ্ধিমান শিক্ষক, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু পদ্ধতির মধ্যে শিশু মনস্তত্ত্বের কোনো কথাই নেই।

আধুনিক অডিওভিজুয়েলের (দেখাশোনার মাধ্যমে শিক্ষাদানের) তেমন কোনো বালাই নেই ফোরকানীয়া পদ্ধতিতে। কাঠ বা প্লাষ্টিকের সাহায্যে খেলার মাধ্যমে অক্ষর পরিচয় দেওয়ার যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা ফোরকানীয়ায় প্রচলিত হয়নি। সনাতন পদ্ধতিতে অক্ষর শিখাতে সময় বেশি লাগে।

শহরের ফোরকানীয়া মাক্‌তাবে যাঁরা ভালো উস্তাদ, তাঁরাও আর ফোরকানীয়া মাক্‌তাবে বেশি থাকেন না। কারণ বাড়ী বাড়ী গিয়ে ইসলামী চেতনাসম্পন্ন লোকের সন্তানদেরকে কুরআন তিলাওয়াত শেখানোর প্রাইভেট টিউশনী করলে রোজগার বেশি হয়। এসব কারণে শহরের এবং গ্রামের ভালো ফোরকানীয়া মাক্‌তাবে শিক্ষার মান অনেক নিচে নেমে গেছে।

ফোরকানীয়া-উস্তাদের লেখাপড়া সাধারণত কম, কারণ শিক্ষকের বেতন কম। ছাত্রদের থেকে বেতন তেমন নেয়া হয় না। তাই উস্তাদকেও তেমন ভালো বেতন দেয়া যায় না। সস্তার তিন অবস্থা। ফোরকানীয়াও আছে সেই তৃতীয় অবস্থায়। খুব কম ফোরকানীয়া উস্তাদই আলিম পাস। কা'রী হলেই ফোরকানীয়া-উস্তাদ হওয়ার কাবিল ধরা হয়। অন্যদিকে কিণ্ডারগার্টেনের অনেক প্রধান শিক্ষক মাস্টার ডিগ্রী-হোল্‌ডার। কম শিক্ষিত বলে ফোরকানীয়া-উস্তাদ অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

ফোরকানীয়া স্কুল বসে সকালে। আর কিণ্ডারগার্টেন স্কুলও বসে সকালে। একই সঙ্গে দু'টি স্কুলে ছেলে-মেয়ে পাঠানো সম্ভব হয় না। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার উদ্দেশ্য দুনিয়ার কল্যাণ আর ফোরকানীয়ার উদ্দেশ্য আখিরাতের কল্যাণ। যে কল্যাণ প্রত্যক্ষ করা যাবে মৃত্যুর পর। তাই ফোরকানীয়ার শিক্ষা অগ্রাধিকার পায় না।

ফোরকানীয়া মাক্‌তাব চলছে দান খয়রাত, যাকাত, ফিত্‌রা এবং কোরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ যৎসামান্য অর্থে। তাই ফোরকানীয়া ইন্তেজামিয়া কমিটির পক্ষে উস্তাদের ভালো বেতন দেয়া সম্ভবপর হয় না। যেহেতু লেখাপড়ার মান নীচু, তাই গরীবের সন্তানেরা সেখানে আসে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা মনে করেন, খারাপ পরিবেশে ছেলেমেয়ে পাঠালে তাদের মধ্যে খারাপ অভ্যাস সংক্রমিত হবে।

অভিভাবকরাই আস্থা রাখতে পারছেন না যে ফোরকানীয়া মাক্‌তাবের ছাত্ররা ভবিষ্যৎ জীবনে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ডিরেক্টর, চেয়ারম্যান ইত্যাদি হতে পারবে। অথচ কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পড়া ছাত্রদের অনেকেই যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হতে পারবে, সেটা অনেকটা নিশ্চিত।

বহু কারণে আজ শহর-বন্দরে ফোরকানীয়া শিক্ষা ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা হারিয়ে আস্তে আস্তে সীমিত হয়ে পড়েছে। ফোরকানীয়া ব্যবস্থার অনেক ত্রুটির কথাই তো বললাম। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে ফোরকানীয়া মাক্‌তাব থাকবে না বা ক্রমশ তা উঠিয়ে দিতে হবে ? তা নয়।

ফোরকানীয়া মাক্‌তাব আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্য নষ্ট করা যায় না এবং এ ব্যবস্থাকে অবশ্য আধুনিকীকরণের মাধ্যমে যুগোপযোগী করতে হবে। যেমন করতে হবে কিণ্ডারগার্টেন ব্যবস্থার ইসলামীকরণ।

ফোরকানীয়া মাক্তাবের অবদান

যে প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু নেই

দু'শ বছরের সরকারী বৈরীতা এবং উপেক্ষার পরও ফোরকানীয়া মাক্তাব টিকে আছে। পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এর ভূমিকা সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মাক্তাবগুলো একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতেও সকল প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে নিজস্ব স্বকীয়তা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

মসজিদে শিক্ষা শুরুর হাজার বছরের ঐতিহ্য আমাদের আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা এই ঐতিহ্য কেন আমরা ছাড়ব? ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা খুব সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট সময় ও বহুজনের সাধনা। শিক্ষার এই ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন সরকার এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আন্তরিক সহযোগিতা।

নিজের ঘর

আমাদের দেশে অনেক গ্রাম ও মহল্লায় স্কুল নেই। স্বাভাবিক কারণেই দূরের স্কুলে শিশুদেরকে পাঠাতে অভিভাবকেরা ভয় পায়। কিন্তু মসজিদ কেন্দ্রিক মাক্তাব শিশুদের আপন ঘর। পিতার কোলে বসে, ভাইয়ের হাত ধরে বাচ্চারা মসজিদে যেতে পারবে। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষককে অনেক ছেলে ভয় করে। কিন্তু ইমামকে শিশু মনে করে আপনজন হিসেবে। সালামের মাধ্যমে শিশুর সঙ্গে পরিচয় হয় ইমামের। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে স্বর শিশু শোনে তাও ইমামের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে।

পরিচিত স্থান

মসজিদ মাক্তাব শিশু শিক্ষার হাতে খড়ি নেয়ার পবিত্র ও উৎকৃষ্ট স্থান। মসজিদ আল্লাহর ঘর। এর দ্বার সবার জন্য অবারিত। নিজের ঘর ছাড়া একমাত্র এই গৃহেই শিশু প্রবেশ করে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে। তাকে কারো অনুমতি নিতে হয় না। এ ঘরে প্রবেশ করলে কেউ বিরক্ত হয় না। অনুন্নত দেশের পল্লী অঞ্চলে বহু শিশুরই পাকা বাড়ী বা ইমারতের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় মসজিদে।

গ্রামের স্কুলও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কিন্তু এরও একটা প্রাইভেট রূপ আছে। এখানে গতিবিধি শুধু ছাত্র শিক্ষকদের। অন্যেরা এখানে আগন্তুক; কতকটা মুসাফিরের মতো। কিন্তু মসজিদ হলো সকলের গৃহ। সকাল-বিকাল, দুপুর-সন্ধ্যা, ভোর অথবা রাত্রি যে কোনো সময় যে কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। তাই মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মাক্তাবকে শিশুরা সহজে আপন করে নেয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য কি ? একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়নই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আদর্শ ও নৈতিক দিকটি সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। আমরা প্রতিনিয়ত তার মারাত্মক পরিণতি চোখের সামনেই দেখছি। বস্তিবাসী অশিক্ষিত পিতা-মাতার সন্তান নয়, গুলশান, বনানী ও ধানমন্ডির বিদগ্ধ বাপ-মার ছেলে-মেয়েরাই হয়ে উঠেছে হাইজ্যাকার, ব্যাংক লুঠকারী, চোর-ডাকাত। নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের অভাবেই এমনটি হচ্ছে। তাই নিকট অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

শুধুমাত্র ফোরকানীয়া শিক্ষা দ্বারা হয়তো আধুনিক ও যুগোপযোগী নাগরিক তৈরী হয় না এবং তা সম্ভবও নয়। ফোরকানিয়া মাক্তাবের শিক্ষার উদ্দেশ্য ভাল মানুষ সৃষ্টি করা – যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিনের বেলায় সংগ্রাম করবে, রাতের বেলায় আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদবে।

স্রষ্টায় বিশ্বাসের বুনিয়াদ স্থাপন

ফোরকানীয়া মাক্তাব আমাদের সমাজের একটি গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। এখানে স্রষ্টার উপর শিশুর বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপিত হয়। নবীদের কাহিনী, সাহাবা কাহিনী, পীর-দরবেশ ও আউলিয়াদের কাহিনী, শবে-মে'রাজ, শবে-কদর, শবে-বরাত, কবর আযাব, পুলসিরাত ইত্যাদির ঐতিহাসিক তাৎপর্য, ধর্মীয় গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা শিশুর কোমল মনে যে দাগ কাটে, জীবনে কোনোদিন তা মুছে যায় না।

প্রতিটি মুহূর্তে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। কে দিয়েছেন এই জীবন, শ্বাস নেয়ার এই শক্তি ? যিনি দিয়েছেন জীবনের এই স্পন্দন, তাঁকে বুঝতে এবং অনুসন্ধান করতে না শিখলে তাঁকে অস্বীকার করাই তো স্বাভাবিক। যে শিক্ষায় স্রষ্টার চেতনা সৃষ্টি হয় না, সে শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন। 'মহব্বতে ইলাহী' বা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা এবং 'খাউফে ইলাহী' বা স্রষ্টার প্রতি ভীতি শিশুর মনে প্রথম থেকেই সৃষ্টি করতে হবে। যে শিক্ষায় আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে – এ ধারণা দেয়া হয় না, সে শিক্ষা কোনো শিক্ষাই নয় এবং এরূপ শিক্ষা ছাড়া আদম সন্তানের জন্য মূর্খ থাকাই হয়ত বেহতর।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর নির্দেশিত কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে নিজেকে জানা এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া মাক্তাবের শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য। মাক্তাবে শিক্ষিত ছাত্রদের পরবর্তীকালে ধর্মপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, শিশুর অবচেতন মনে নিজের অজান্তেই ধর্ম সম্পর্কে গভীর রেখাপাত ঘটে। মাক্তাবের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি শিক্ষা দেয়া হলেও এর একটা ধর্মীয় প্রভাব থাকবে। কারণ মাক্তাবের শিক্ষার মাধ্যমে শুধু শিক্ষিত মানুষ নয়, ভাল মানুষ সৃষ্টির দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য থাকে। বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিত মানুষের চেয়ে জ্ঞানী মানুষের প্রয়োজনই বেশি।

একজন মুসলমানের জীবনের চরম এবং পরম কাম্য কি হতে পারে? তা হলো পরকালের নাজাত এবং আল্লাহ্‌র দীদার লাভ। বারবার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, সর্বোচ্চ সরকারী কর্মচারী, প্রধান বিচারপতি বা প্রধান সেনাপতি যাই হোন না কেন, নীতি ও

আদর্শবোধ, ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান ও চরিত্র না থাকলে পার্থিব জীবনে উন্নতির কোনো মূল্যই নেই। জীবনে অত বড় কিছু না হয়ে অফিসের কেরানী-পিয়ন বা সাধারণ সৈনিক হলেও জীবন সফল এবং স্বার্থক হবে যদি তিনি সিরাতুল মুস্তাক্বীমে থাকতে পারেন।

মাক্তাব শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

আদর্শ শিক্ষা শিশু কোথা থেকে পাবে ? কে তাকে কুরআন তিলাওয়াত শেখাবে? কে তাকে বলে দেবে রোযা-নামাযের নিয়ম-কানুনের কথা ? বস্তুত মাক্তাব অতি সহজেই এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারে। ৫০ বছর পূর্বে জনগণ যেমন মাক্তাব থেকে এই শিক্ষা পেয়েছিল, বর্তমান কালের লোকেরাও মাক্তাব থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ভাল মানুষ সৃষ্টির তাগিদে পুরানো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য পরিহার করে মাক্তাব শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেয়া খুবই প্রয়োজন। মাক্তাব শিক্ষার বিলুপ্তি না ঘটিয়ে বরং মাক্তাব শিক্ষাকে প্রয়োজনের সঙ্গে মিল রেখে সংস্কার সাধনই হওয়া উচিত আমাদের মূল লক্ষ্য।

যুগের সাথে তাল রাখতে পারছে না

ফোরকানীয়া মাক্তাব বাংলাদেশের গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ফোরকানীয়া মাক্তাব কতকগুলো বাস্তব অসুবিধার জন্য শহরের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। শহরে জনসংখ্যা বাড়ছে প্রচণ্ড গতিতে। কিন্তু, শিক্ষার সুযোগ সে হারে বাড়ছে না। কোনো অফিসারের পক্ষে পরিচালক, মহাপরিচালক, যুগ্ম-সচিব বা উপ-সচিব হওয়া যত কষ্টকর, তার চেয়েও বেশি কষ্টকর ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করানো। এ জন্য প্রত্যেক শিশুর অভিভাবকের উপর সৃষ্টি হয় প্রচন্ড মানসিক চাপ। কারণ, ভাল স্কুলে পড়তে না পারলে বা প্রথম বিভাগে কয়েকটি লেটার নিয়ে পাস করতে না পারলে কোনো ভাল কলেজে ভর্তি করানো সম্ভব নয়। এজন্য শহরের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয়, বাবা-মাকে খাটতে হয়।

শিশু-কিশোরদের স্কুলগুলো বসে সকাল বেলা। বিকালে বা সন্ধ্যায় আসে গৃহশিক্ষক। এরপর পাঠাতে হয় নৃত্য-সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রে। এছাড়া খেলাধুলা এবং হোম ওয়ার্ক তো আছেই। এতসব কিছু করার সময় হলেও ফোরকানীয়া মাক্তাবে শিশুকে পাঠাবার জন্য পিতামাতার হাতে কোনো সময় থাকে না। ফলে রোযা, নামায বা ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা শিশুরা পায় না।

আর্থিক সংকট ও নিম্নমান

আমাদের দেশের অধিকাংশ ফোরকানীয়া মাক্তাব বেতনের টাকায় চলে না – চলে যাকাত ফিত্‌রার অর্থে। বিনা বেতনে প্রদত্ত ফোরকানীয়া মাক্তাবের শিক্ষার মান থাকে শহরের প্রিপারেটরী স্কুল বা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মান অপেক্ষা অনেক নিম্নে। সে জন্য অনেক পিতামাতা ছেলে-মেয়েকে ফোরকানীয়া মাক্তাবে পাঠাতে চাননা। কিন্তু ফোরকানীয়া মাক্তাবে না পাঠিয়ে পিতামাতা কি স্বস্তি অনুভব করেন ?

যে পিতামাতা নিজের সন্তানকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দিতে পারেননি, মনে হয় না মৃত্যুর সময়ে তাঁর পাপবোধ থেকে মুক্ত হয়ে মরতে পারেন। সন্তান কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না বলে গৌরববোধ করে – এমন কোন পিতামাতা পাওয়া যাবে না।

পাঠ্যসূচী সংস্কার

শহরে ফোরকানীয়া মাক্তাবের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তবুও যুগের দাবীতে এই প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রাইমারী বা প্রিপারেটরী স্কুলে যা কিছু শিক্ষা দেয়া হয়, তার সবগুলো যদি ফোরকানীয়া মাক্তাবের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করে ফোরকানীয়া শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করা যায়, তবে ফোরকানীয়া শিক্ষাব্যবস্থা যুগের প্রয়োজন মিটিয়ে শহরের সভ্যতার জৌলুশের মধ্যেও টিকে থাকবে। তাছাড়া অন্ততঃ শহরে ফোরকানীয়া মাক্তাব বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

মানোন্নয়ন

বর্তমানে ফোরকানীয়া মাক্তাবে যে পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষার মান তাতে খুব কম মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত নাগরিক সেখানে নিজের সন্তানদিগকে পাঠাতে চান। ফোরকানীয়া মাক্তাবকে অবশ্যই পুনর্গঠন করতে হবে। আমাদের এই হাজার বছরের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

যে কারণে পিতামাতা প্রিপারেটরী বা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সন্তান পাঠাতে পাগল, ফোরকানীয়াতে সে অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। যেহেতু বর্তমানে ভাল প্রিপারেটরী বা কিন্ডারগার্টেন স্কুলসমূহে ছাত্র ভর্তি করা দুরূহ ব্যাপার, তাই সমস্যার বাস্তব সমাধান হিসাবে ফোরকানীয়া মাক্তাবগুলোর উন্নয়ন প্রয়োজন।

প্রিপারেটরী স্কুলে বা কিন্ডারগার্টেনে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে তাদেরকে সাধারণত দেখা যায় সদা প্রফুল্ল, হাসি-খুশী, অনুসন্ধিৎসু এবং আত্মবিশ্বাসী। পাঠ্যসূচীর মধ্যে খেলাধুলা এবং ড্রীল থাকায় শুধু কথাবার্তায় নয়, চলা-ফেরায়ও তাদেরকে স্মার্ট মনে হয়। অপরপক্ষে ফোরকানীয়া মাক্তাবে শিশুদেরকে দেখা যায় মলিন বদন, জুব্বা এবং গোল টুপীর চাপে বিমর্ষ ও অসহায়। কিন্তু কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিশুর মাথায় গোল টুপি পরিয়ে দিলে তার চেহারার জৌলুশ ও পবিত্রতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এর সামগ্রিক তাৎপর্য আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

ফোরকানীয়া মাক্তাব শিক্ষকের অবদান

কুরআন শিক্ষা

পঞ্চাশ বছর আগেও এ দেশে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের অনেকেই বাংলা পড়তে পারতেন না। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। তখনকার দিনে কুরআন তিলাওয়াতকারীর সংখ্যা বাংলা পুস্তক পাঠকারীর সংখ্যা থেকে বেশি ছিল। কিন্তু বর্তমানে মাক্তাব শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

কোনো দরিদ্র এলাকার কথা নয়; ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানীর মতো অভিজাত এলাকায় বসবাসকারী বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান আছেন, যারা অনেক বিদ্যাই অর্জন করেছেন, কিন্তু নামায পড়তে শেখেন নি। কুরআন তিলাওয়াত করতেও জানেন না। কোনো মুসলমান শিশু যদি একটি মাত্র পুস্তক পড়তে শেখে, তা হওয়া উচিত শুধুমাত্র কুরআন মজীদ, অন্য কিছু নয়। ফোরকানীয়া মাক্তাবের শিক্ষকগণই সাধারণতঃ ব্যাপক ও বহুলভাবে আজও কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

ইসলামী আখলাক ও মূল্যবোধ

মাক্তাবের শিক্ষককে করুণা বা উপেক্ষা যাই করা হোক না কেন, সমাজের প্রতি তাঁর অবদানকে অস্বীকার করা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আখলাক ও মূল্যবোধ কম বেশি যতটুকুই অবশিষ্ট থাকুক না কেন, এ জন্য বড় অবদান মাক্তাবের শিক্ষক, হাফেজ, ক্বারী, মৌলভী-মাওলানা সাহেবদের। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বহু পাশ্চাত্য শিক্ষিত ইসলাম – দরদীদের সময় কাটে ইসলাম প্রচারে নয়; মুন্সী-মৌলভীদের ত্রুটির সন্ধানে এবং অহেতুক সমালোচনায়।

যখন ইসলামী সমাজ ও মূল্যবোধ প্রায় বিলুপ্ত হতে যাচ্ছিল, তখন আলেম সমাজ নিজেদের পারিবারিক স্বার্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা সব কিছু ত্যাগ করে ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম সমাজকে যতটুকু সম্ভব রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তা না হলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বহুমুখী ষড়যন্ত্র এবং অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের চাপে ইসলামের সূর্য অনেক আগেই স্তিমিত হয়ে পড়তো। ঔপনিবেশিক পরিবেশে ইসলামের আদর্শ-আকীদা সংরক্ষণের চাহিদা তারা মিটিয়ে ছিলেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের অবদান হয়তো কম, কিন্তু অতীত দ্বীনি অবদানকে উপেক্ষা করা যায় না।

কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদানের দায়িত্ব কার ?

ধর্মীয় আদর্শ, তাহ্জীব তমদ্দুন রূপায়নের জন্য এদেশের মানুষ বৃটিশ শাসন হতে মুক্তি চেয়েছিল। পরাধীন বৃটিশ ভারতে অন্ততঃ স্কুলগুলোতে আরবী অথবা উর্দু যে কোনো একটি বিষয় দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য ছিল। ইসলামের নামে পাকিস্তান অর্জিত হলেও সেই ইসলামী রাষ্ট্রে ঐ অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। ভেদনীতির অবশ্যম্ভাবী এবং

স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে পাকিস্তানের অবলুপ্তি ঘটেছে। সেই পাকিস্তান থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত কোনো সরকারই জনগণকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদান করাতে এতটুকু নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব বলে স্বীকার অথবা পৃষ্ঠপোষকতা করেননি যতটুকু তাঁরা বাংলা ভাষাকে শিক্ষা দেয়া এবং নিরক্ষরতা দূর করার ক্ষেত্রে করেছেন।

ফোরকানীয়া মাক্তাবের পৃষ্ঠপোষক এবং শিক্ষকগণ আরবী ভাষা এবং কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়াকে ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব মনে করেছেন। অপরদিকে সরকার বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়াকে গ্রহণ করেছেন নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে। সে জন্য সরকারের সাথে ফোরকানীয়া মাক্তাবগুলোর কোন সম্পর্ক আজও গড়ে ওঠেনি।

এ সমস্যা সমাধানের দু'টি পথ খোলা আছে। ফোরকানীয়া মাক্তাবের শিক্ষক, পৃষ্ঠপোষকদের সরকারের ভাবধারা গ্রহণ করে ফোরকানীয়াতে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে হবে এবং তা দেয়া হলে সরকারেরও সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ফোরকানীয়া মাক্তাব পাবে।

দ্বিতীয় পথ হলো সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে এবং জনগণকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া সরকারী দায়িত্ব বলে স্বীকার করতে হবে। যেহেতু এদেশে সত্যিকার অর্থে কখনও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই কোনো সরকারই জনগণের এই মৌলিক চাহিদা স্বীকার করেননি। ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থে সরকার চালাচ্ছে স্কুল; আর চাঁদার অর্থে জনগন চালাচ্ছে ফোরকানীয়া মাক্তাব।

জনগণের প্রয়োজন এবং সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সংযোগ প্রয়োজন। এ সংযোগ ঘটলে সরকারেরই উদ্দেশ্য সফল হবে।

মাক্তাব শিক্ষক কারা ?

এতকাল মাদ্রাসা শিক্ষিত মৌলভী ও মুন্সীগণই মাক্তাবের শিক্ষক হিসেবে কাজ করে এসেছেন। ইংরেজী শিক্ষিতগণ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন না বলে মসজিদে ইমামতি করতে পারেন না। বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজী শিক্ষিতদেরকে মসজিদের ইমাম না হলেও অন্তত মাক্তাবের শিক্ষক হতে হবে।

চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর বহু সরকারী কর্মচারী মাক্তাবের শিক্ষক হতে পারেন। কুরআন তিলাওয়াত শুদ্ধ করে নিলে তাঁরা মসজিদের ইমামও হতে পারেন।

মাক্তাবের মধ্যে প্রাইমারী এবং কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হলে মাদ্রাসায় শিক্ষিত মাক্তাব শিক্ষককে আধুনিক শিক্ষা নিতে হবে অথবা ইংরেজী শিক্ষিতদেরকে শুদ্ধভাবে কিরাত পাঠ এবং মাক্তাবে পড়াতে হলে যতটুকু বিদ্যার দরকার, ইসলামিয়াত সম্পর্কে অন্ততঃ পক্ষে ততটুকু জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ফোরকানীয়া শিক্ষা উন্নয়নের জন্য বহু প্রস্তাব, নতুন নতুন ধ্যান ধারণা পেশ করা যায়। কিন্তু এগুলোর বাস্তবায়ন কিভাবে এবং কার মাধ্যমে হবে ? যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নই শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক হলে শিক্ষার মান অবশ্যই উন্নত হবে। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং কলেজ আছে। কিন্তু মাক্তাব শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর কোনো ব্যবস্থা নেই। তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক ভাতা বৃদ্ধি

ভাল শিক্ষক পাওয়ার প্রথম শর্ত হলো শিক্ষকের বেতন ভাতা বৃদ্ধি। বর্তমানে ফোরকানীয়া মাক্তাবের শিক্ষকেরা যে বেতন পান, তাতে দু' শ্রেণীর শিক্ষকই এখানে

আসেন। প্রথমত, যারা টাকা পয়সা পান বা না পান পরকালের কল্যাণের আশায় দ্বীনি ইলম প্রচারের কাজে নিবেদিত প্রাণ হয়ে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বিতীয়ত, যাদের অন্য কোনো ভালো উপার্জনের সুযোগ নেই। তাদের ধ্যান-ধারণা অনেকটা সেকেলে। শিক্ষাদানেও তারা অদক্ষ। তা সত্ত্বেও সূরা, ক্বিরাআত শেখার জন্য অভিভাবকগণ তাঁর কাছে ছেলে-মেয়ে পাঠান। এই সব শিক্ষকের বেতন কম; তাই আর্থিক দীনতার কারণে তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবন-যাত্রার মানও খুব অনুন্নত। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা করুণার পাত্র। আত্মমর্যাদা ও উন্নত ব্যক্তিত্ব নিয়ে তাঁরা সমাজে চলতে পারেন না। শিক্ষকগণের বেতন বাড়ালে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এ শিক্ষকতা পেশায় আসতে উৎসাহিত হবে। ফলতঃ শিক্ষার মানও উন্নত হবে।

মাক্‌তাব পরিচালনা ব্যয়ের উৎস

ফোরকানীয়া মাক্‌তাবের জন্যে অর্থ আসছে কোথা থেকে ? যে পর্যন্ত কোনো মুসলিম অধ্যুষিত দেশের সরকার নামায ও কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া সরকারী দায়িত্ব মনে না করেন এবং এ জন্য অর্থ ব্যয় করতে সম্মত না হন, সে পর্যন্ত জনগণের সাহায্য, চিরাচরিত পদ্ধতিতে দান, সাদ্‌াকাহ্, ফিত্‌রা, যাকাত, কুরবানীর পশুর চামড়া ইত্যাদির মাধ্যমেই ফোরকানীয়া শিক্ষা চলবে। সরকারী সাহায্য না পেলেও ফোরকানীয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে সংস্কার করার প্রয়োজন রয়েছে। এই শিক্ষা আমাদের ধর্ম এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

শুধু বাংলা নয়, ইংরেজী, বিজ্ঞান ও অংক শিক্ষা প্রদান করাকে সরকার নিজ দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফোরকানীয়া মাক্‌তাবে যদি বাংলা, ইংরেজী, অংক এবং বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই মাক্‌তাব পরিচালনার দায়িত্ব সরকারেরই গ্রহণ করা উচিত।

ফোরকানীয়া মাক্‌তাবগুলো ইসলামী শিক্ষা দিচ্ছে – এই অজুহাতে তাদেরকে সাহায্য না করার কোনো যুক্তি নেই। কারণ শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে মাক্‌তাব শিক্ষাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একই ধরনের কাজের জন্য মাক্‌তাব শিক্ষককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে এবং অর্থ ব্যয় করতে সরকারের অনীহা দুঃখজনক।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটুকু বলা যেতে পারে, যে পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ না করবে, ততদিন না হয়, জনগণই তা বহন করলো। কিন্তু মাক্‌তাবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা বাংলা, অংক ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যয় সরকার গ্রহণ করতে পারেন।

বিদেশী সাহায্য গ্রহণ

ফোরকানীয়া মাক্‌তাব পুনর্গঠিত এবং আধুনিক করার জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। জনগণের স্বেচ্ছাকৃত দানে ফোরকানীয়া মাক্‌তাবগুলো টিকে আছে, কিন্তু ভালোভাবে চলছে না। সরকারী সাহায্য পেলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে। ফোরকানীয়া শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্যে মুসলিম বিশ্ব হতে সাহায্যের সম্ভাবনা আছে। আরব বিশ্বের কতগুলো দেশ আমাদের শিক্ষাকে ইসলামীকরণের জন্যে অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত। এ সাহায্য সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রহণ এবং ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফোরকানীয়া মাক্‌তাবের পাঠ্যসূচী

সিলেবাস

মাক্‌তাবের সিলেবাস-এর মধ্যে বাংলা, অংক, প্লে-গ্রুপ, নার্সারী কিণ্ডারগার্টেন প্রথম মান (কেজি-১) ও কিণ্ডারগার্টেন দ্বিতীয় মানের (কেজি-২) ইংরেজী অন্তর্ভূক্ত করতে না পারলে শহরের আধুনিক নাগরিকদের কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন মাক্‌তাব মেটাতে পারবে না। যে প্রতিষ্ঠান সমাজের যা প্রয়োজন তা মেটাতে পারে না; সে প্রতিষ্ঠান ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকে ঠিকই; কিন্তু ভালোভাবে বেঁচে থাকে না।

ফোরকানীয়া মাক্‌তাবকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শুধুমাত্র ফোরকানীয়া মাক্‌তাবের উপকারিতার উপর সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে অথবা ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে আন্দোলন করলেই ফোরকানীয়া মাক্‌তাবকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। ফোরকানীয়া মাক্‌তাবকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে তা সমাজের ও যুগের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

যুগোপযোগী হলে মাক্‌তাবে প্রদত্ত শিক্ষা অভিভাবকরা পয়সা দিয়েও গ্রহণ করবে। কিন্তু প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হলে বিনা পয়সায় পাওয়া গেলেও তা গ্রহণের জন্য কেউ আগ্রহী হবে না।

কুরআনের তরজমা পাঠ

ফোরকানীয়া মাক্‌তাবের প্রধান পাঠ্য বিষয় হলো কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া। একটি আরব শিশু কুরআনের আয়াত বারবার পাঠ করেও হয়তো তত্ত্বকথা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু যেহেতু তার মাতৃভাষা আরবী সে কিছু কিছু শব্দ বোঝে এবং বয়সের সাথে সাথে আল-কুরআনের মর্মকথাও ক্রমশঃ বুঝতে শেখে।

বাংলাদেশের শিশুর পক্ষে শুধুমাত্র আল-কুরআন তিলাওয়াত শিখলেই আল-কুরআনে কী আছে তা সে বুঝতে পারবে না। কুরআন তিলাওয়াত করে কুরআন শরীফে চুমু দিয়ে বুকে লাগিয়ে নেকী হাসিল করা ব্যতীত হেদায়াত পাওয়া তার পক্ষে কষ্টকর হয়।

এজন্য প্রয়োজন শিশুর মাতৃভাষায় আল-কুরআনের একটি তরজমা। এ তরজমা শিশুকে কুরআন পাঠে অনুপ্রাণিত করবে। সাবেক শিক্ষা সচিব ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব ফেরদাউস খান এরূপ একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং আল-কুরআনের প্রথম ও শেষ পারার বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল। তরজমাটি অবশ্যই সহজ সরল হতে হবে কিন্তু সাথে সাথে ছন্দময় হওয়া উচিত। সুর করে আল-কুরআন তিলাওয়াত করতে ভালো লাগে। মন আনন্দে ভরে ওঠে।

আল-কুরআনের একটি সহজ সরল তরজমা ফোরকানীয়া মাক্‌তাবের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। তা করতে হলে অবশ্যই ফোরকানীয়া মাক্‌তাবে বাংলা অক্ষর পরিচয় ও বাংলাপাঠ আবশ্যিক করতে হবে।

যদি মনে করা হয় যে, কুরআনের সম্পূর্ণ তরজমা পাঠ ফোরকানীয়া শিক্ষাবাসকে অতি দীর্ঘ করে তুলবে তবে দশটি সূরার তরজমা নামাজের জন্য পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আমপারার তরজমা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হলে অনেকগুলো সূরাই এসে যায়। মোটকথা, ফোরকানীয়া মাক্তাবে শুধু আরবী ভাষায় কুরআন তিলাওয়াত নয়, বাংলা ভাষায় তরজমা পাঠও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা বর্তমানে নেই।

দ্বীনিয়াত

দ্বীনিয়াত মাক্তাবের একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়। কিন্তু সুন্দর করে রচিত ও প্রকাশিত দ্বীনিয়াত পুস্তক বাংলায় নেই। আকর্ষণীয় করে দ্বীনিয়াত পুস্তক রচনার প্রয়োজন আছে। শিশু মনস্তত্ত্ব বিবেচনা করে দ্বীনিয়াত রচিত হলে পড়া সহজ হয়।

হাদীস

ফোরকানীয়া মাক্তাবের পাঠোপযোগী কোনো হাদীসের পুস্তক সংকলিত হয়নি। কী কী হাদীস শিশুদেরকে পড়াতে হবে, জানাতে হবে তাও সম্ভবত কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বসে এক সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করেন নি। শিশুদের বোঝার উপযোগী অন্ততঃ দু'শটি হাদীসের একটি সংকলন হতে পারে। ছন্দবদ্ধ করে যদি প্রণয়ন করা যায়, তা হলে আরও ভাল।

ছবি ও রং

দু'যুগ পূর্বে প্রাইমারী স্কুলে পঠিত আদর্শ লিপি ও বাংলা শিক্ষায় ছবির ব্যবহার তেমন ছিল না। বহু বর্ণে মুদ্রিত বই পাওয়া যেত না। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'একটি ছবি থাকতো, তাও ছিল শুধুমাত্র কালো কালি দিয়ে এক রঙে মুদ্রিত। ছবিগুলো শিশুদের জন্য খুব আকর্ষণীয় ছিল না। বর্তমানে প্রাইমারী স্কুল ও কিণ্ডারগার্টেন সমূহে দু'তিন অথবা চার রঙের ছবি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। রঙিন ছবি থাকলে বইয়ের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ বাড়ে। পড়া ছাড়াও ছবি দেখার জন্য শিশুরা বইয়ের পাতা উল্টায় এবং ছবি দেখতে দেখতেই অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে।

ক, খ, গ, ঘ – এই অক্ষরগুলো শিশুর কাছে কোনো ইমেজ বা ধারণা সৃষ্টি করে না। কিন্তু 'ক' অক্ষরের সামনে যদি কলা, কলম, কমলার ছবি থাকে, শিশু সঙ্গে সঙ্গেই 'ক' অক্ষরটি আয়ত্ত্ব করে নিতে পারে।

মাক্তাবের পাঠ্যসূচীতে এখনও ছবির মাধ্যমে বাংলা বা আরবী অক্ষর পরিচয়ের প্রচলন নেই। অল্প সময়ে বেশি শিক্ষাদানের জন্য এটা খুবই জরুরী।

প্রাইমারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হলে মাক্তাবের পাঠ্যসূচী ও পুস্তকের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কার প্রয়োজন। মাক্তাবের শিক্ষার উপযোগী করে পাঠ্য পুস্তক রচনা করাও জরুরী হয়ে পড়েছে।

মসজিদ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও মহাপরিচালক – এ. জেড. এম. শামসুল আলম 'বর্ণ পরিচয়', নামে ছবিসহ বাংলা অক্ষর পরিচয়ের একটি বই রচনা করেছিলেন। এ বইটির প্রায় দু'কোটি কপি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তিতে অন্যেরা এ ধরনের পুস্তক রচনা করেছেন। এই বইগুলো মাক্তাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

ছন্দ ও ছড়া

ছড়া শিশুরা খুবই ভালবাসে। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" যখন শিশু মুখস্থ করে সে কিন্তু অর্থ খোঁজে না। শুধুমাত্র তোতা পাখীর ন্যায় আবৃত্তি করেই শিশু

আনন্দ পায়। ইংরেজী ছড়াও শিশুরা মুখস্থ করে অর্থ না বুঝে। প্রবন্ধ মুখস্থ করা যায় না, ছোট ছোট গল্প হলেও মুখস্থ করা কষ্টকর। কিন্তু বড় কবিতা অনেকেই মুখস্থ করতে পারে। এর কারণ হলো ছন্দ।

আল-কুরআন দুনিয়ার একমাত্র গ্রন্থ যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করা যায়। এর মূলে রয়েছে আল-কুরআনের ছন্দ-মাধুর্য্য। একজন সাধারণ মুসলমান যতগুলো সূরা-কিরাত মুখস্থ রাখতে পারেন তার অর্ধেক কবিতাও তিনি মুখস্থ রাখতে পারেন না। ছন্দবদ্ধ বলে সূরা মুখস্থ রাখা সহজতর।

ফোরকানীয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় ছড়ার ব্যবহার খুব কম। শিশুদের মুখস্থ করার উপযোগী ইসলামী ছড়া খুব বেশি পাওয়া যায় না। "বৃষ্টি এলো টাপুর টুপুর নদে এলো বান। শিব ঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান" এ জাতীয় ছড়ায় মাক্তাব শিক্ষক উৎসাহী নন। মাক্তাবের শিক্ষার উপযোগী ইসলামী ছড়ার কয়েকটি বই ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যেই প্রকাশ করেছে। এ জাতীয় বই আরো অনেক প্রকাশিত ও রচিত এবং মাক্তাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হলে এ বিষয়ে একটা বিরাট অভাব দূর হতো।

অডিওভিজুয়েল পদ্ধতি

বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে পদ্ধতি বা প্রতিষ্ঠান মানুষের প্রয়োজন সফলভাবে মেটাতে পারে, সে প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি টিকে থাকে। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ বা মায়াকান্নার জন্য কোনো পদ্ধতি বা প্রতিষ্ঠানকে কালজয়ী করা সম্ভব নয়।

কিণ্ডারগার্টেন স্কুলসমূহে এমনকি প্রাইমারী স্কুলেও অডিওভিজুয়েল ম্যাটেরিয়েল (একই সঙ্গে শোনা ও দেখার সামগ্রী) দ্বারা শিক্ষাকে শিশুর নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। একটি ছোট ছেলে শুধুমাত্র দেখে শেখে না। শিক্ষাকে দ্রুত, আকর্ষণীয় এবং ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে শোনা এবং দেখা এ দুটোর সংযোগ ঘটাতে হবে।

শিক্ষকের কণ্ঠ বারবার শুনতে শুনতে শিশু উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। টেপ বা ক্যাসেট থেকে নতুন কণ্ঠ, নতুন সুর বেরিয়ে এলে শিশু তা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। মনেও রাখতে পারে বেশি। এক কালির লেখাতে শিশুর চোখ আড়ষ্ট হয়। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন রংয়ের কালির ব্যবহার করে অক্ষরকে ছবির সাহায্যে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। কিন্তু বর্তমানে ফোরকানীয়া মাক্তাবে ব্যবহৃত শুধুমাত্র কালো কালির লেখা শিশুর কাছে আকর্ষণীয় নয়। সে তৃপ্ত হতে পারে না।

ক্লাস সিস্টেম

ফোরকানীয়া মাক্তাবের বিভিন্ন মানের ছাত্ররা এক সঙ্গে বসে লেখাপড়া করে। শিক্ষক একজন করে ছাত্রকে তালিম দেন। এতে করে যদি কোন ক্লাসে ৩০ জন ছাত্র থাকে, দু'ঘন্টা পড়ালেও প্রতিজন ছাত্র গড়ে চার মিনিটের বেশি শিক্ষকের মনোযোগ পান না।

কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষার অগ্রগতি অনুসারে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন ক্লাসে ভাগ করা হয়। যেমন প্লে-গ্রুপ, নার্সারী, কেজি-১, কেজি-২, ইত্যাদি। ফলে একজন শিক্ষক এক সঙ্গে কয়েকজনকে পড়াতে পারেন। এতে সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। ফোরকানীয়া মাক্তাবে অবশ্যই ক্লাস সিস্টেম প্রবর্তন করতে হবে। যেমন মুখস্থ সূরা ক্লাস, কায়দা ক্লাস, আমপারা ক্লাস, কুরআন ক্লাস। সূরা ক্লাসে সূরার নামে গ্রুপ হতে পারে। যেমন - আল-ফাতিহা গ্রুপ, না'ম গ্রুপ, ফালাক গ্রুপ, ইখলাছ গ্রুপ ইত্যাদি।

কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে যে শুধু ছাত্রদেরকে বিভিন্ন গ্রুপেই ভাগ করা হয়, তা নয়। সম্ভব হলে অনেক ক্ষেত্রেই বসার কক্ষ আলাদা করে দেয়া হয়। মাক্‌তাবে হয়তো আপাতত তা সম্ভব হবে না, কিন্তু বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

শিশুরা এক জায়গায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারে না। তারা অল্পতেই চঞ্চল হয়ে পড়ে। কিণ্ডারগার্টেন সিস্টেমে ক্লাসরুম ছাড়াও অতিরিক্ত কক্ষ রাখা হয়। যেমন খেলা কক্ষ, গল্প বলা কক্ষ, শিল্প সামগ্রী রাখার কক্ষ। এক কক্ষে কিছুক্ষণ বসে শিশুরা অধৈর্য হয়ে পড়লে অন্য কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় এবং হাসি-খুশী ও খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

পূর্ব পরিকল্পিত স্থান পাঠ্যসূচী গবেষণা

প্রত্যেক মসজিদেই ফোরকানীয়া মাক্‌তাব প্রতিষ্ঠা করা উচিত। মসজিদ নির্মাণের সময়ই মাক্‌তাব কোথায় বসবে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। নামায আদায় করার জন্য দরকার মসজিদ। নামায কিভাবে পড়তে হবে তা শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মাক্‌তাবের। ইসলামী আখলাক শিক্ষার প্রাথমিক ও মৌলিক ক্ষেত্র হবে মাক্‌তাব।

অতীতে লেখাপড়া শুরু হতো দেরীতে, ৯-১০ বছর বয়সে। এখন শুরু হয় ৪-৬ বছরে। ১০-১১ বছরের শিশু যা বুঝতে পারে ৫-৬ বছরের শিশু তা পারে না। শিশুকে পড়াতে হলে পড়াবার পদ্ধতি এবং পাঠ্য বিষয় একটু ভিন্নতর হবে এবং তা হতে হবে শিশুদের বয়স ও মেধা অনুযায়ী। যদিও দেশে ৫০–৬০ হাজার ফোরকানীয়া মাক্‌তাব আছে। কিন্তু এ সম্পর্কে গবেষণা হয়নি এবং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য কখনও সরকারী কমিশন গঠিত হয়নি অথবা কোনো প্রকার সংস্কার বা উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়নি। তা করা সঙ্গত এবং তা করার জোর সুপারিশ করছি।

শিশুদের অক্ষর পরিচয়

বর্ণমালা শিক্ষাক্ষেত্রে পোষ্টার ও ব্লকের প্রয়োজনীয়তা

শিশুরা চঞ্চলমতি। কোনো বস্তুর প্রতি দীর্ঘক্ষণ মনোনিবেশ তারা করতে পারে না। এক জায়গায় কোনো শিশু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না। এমন একটি শিশুর কথা ধরুন – যার জন্ম গ্রামে। সে কখনও ট্রাম বাস দেখেনি। বাবা তাকে নিয়ে এলেন শহরে। বাস দেখে সে জিজ্ঞাসা করলো এটা কি ? তাকে বলা হলো এটি এমন একটি বাহন যার মধ্যে উঠে মানুষ এক জায়গা থেকে বহুদূর যেতে পারে। এর মধ্যে একসঙ্গে ৫০-৬০ জন উঠতে পারে। এ বাসগুলো চট্রগ্রাম প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ থেকে তৈরী হয়। বিদেশ থেকেও এরূপ বাস আমদানী করা যায় ইত্যাদি।

এত সব বর্ণনায় ৫-৬ বছরের শিশু উৎসাহিত হবে কি ? সে তো প্রথম দু'একটি বাক্যতেই সন্তুষ্ট। একটি বাক্যের পর সে যদি রাস্তায় নতুন একটা কিছু দেখে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করবে – এটা কি ? ট্রাক দেখলে জিজ্ঞাসা করবে এটা কি ? ট্রাকের বহন ক্ষমতা, মূল্য, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদিতে তার আগ্রহ হবে না। কারণ তার চঞ্চল মন অত কিছু শুনতে চায় না।

যে মুহূর্তে একটি বাড়ী শিশুর দৃষ্টিতে আসবে সে জিজ্ঞাসা করবে এটা কি ? তাকে বলতে শুরু করা হলো এটা একটা বাড়ী। এর মধ্যে বহুলোক থাকে, তোমার মতো শিশুও আছে। এরূপ দু'তিনটি কথা শোনার পর সে একটি বেবী টেক্সী দেখলে সে জিজ্ঞাসা করবে এটা কি ? বেবী টেক্সী সম্বন্ধেও তিন মিনিট বক্তব্য শুনতে শিশু রাজী হবে না। বরং রাস্তার অন্য কিছু দেখলে ঐটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে।

মূলকথা হলো শিশুর শরীর, মন, চোখ, হস্ত-পদ চির সঞ্চরণশীল। কোন শিশুর পক্ষেই বর্ণপরিচয়ের 'ক' 'খ' 'গ' ইত্যাদি অক্ষরের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। তার চোখ অক্ষর থেকে অক্ষরান্তরে অতি দ্রুত চলতে থাকে।

প্রখর স্মৃতি শক্তি

শিশুর স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর। কোন কথা কয়েকবার শুনেই সে অতি সহজে স্মরনে রাখতে পারে। 'ক' 'খ' 'গ' থেকে 'ট' 'ঠ' 'ড' ইত্যাদি দু'তিন বার ছন্দের মতো করে পড়েই সে মুখস্থ করতে পারে। কিন্তু 'ক' 'খ' 'গ' অথবা 'চ' 'ছ' 'জ' চিনে নেয়া তার পক্ষে বড় কষ্টকর। পুস্তকে তার হাত 'ক' থেকে 'খ'-তে পৌঁছতে যে সময় লাগে সে সময়ের মধ্যে সে 'ঞ' পর্যন্ত হয়তো মুখে বলে ফেলতে পারে। তার জিহ্বা অক্ষরের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন হতে অনেক দ্রুত চলে।

'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে আকারে কী পার্থক্য তা একটি চার বছরের শিশুর চোখে সহজে ধরা পড়ে না। যেমন ধরা পড়ে না একজন ৪০ বছর বয়স্ক ব্যক্তির চোখে কিউলেক্স এবং এ্যানোফিলিস মশার পার্থক্য। এ্যানোফিলিস মশা বসার সময় পেছন দিকটা একটু বেশি উঁচু করে থাকে কিন্তু কিউলেক্স মশার মাথা এবং পেছনের দিক সমান

উঁচু থাকে। কিন্তু পিঠ একটু উঁচু থাকে। মনে হয় কুঁজো হয়ে বসে। কিন্তু এ পার্থক্য আগে বলে না দেয়া হলে সহজে ধরা পড়ে না। তেমনিভাবে 'ঘ' এবং 'জ' এর পার্থক্য বর্ণ পরিচয়ের ছোট পুস্তক হতে শিশু ধরতে পারে না।

এ্যানোফিলিস এবং কিউলেক্স মশার ছবি একটি পাখির মতো বড় করে যদি কোনো পোষ্টারে দেখানো হয়, তবে উহার পার্থক্য বহু লোকের চোখে সহজে ধরা পড়তে পারে। অনুরূপভাবে 'ক' 'খ' 'গ' 'ট' 'ঠ' 'ড' ইত্যাদি অক্ষরগুলো আম বা কমলার মত বড় করে পোষ্টারে দেখান হলে ওগুলোর পার্থক্য অপেক্ষাকৃত সহজে শিশুদের চোখে পড়ে। অক্ষর পরিচয় সংক্রান্ত শিশু শিক্ষা পোষ্টারের গুরুত্ব অপরিসীম।

কাঠের অক্ষর

পোষ্টারে অক্ষর বড় করে দেখালে শিশু যত সহজে একটি অক্ষর থেকে আরেকটি অক্ষরের পার্থক্য বুঝতে পারে, তার থেকে অনেক সহজে বুঝতে পারে যদি সম আকারের অক্ষর কাঠ দিয়ে তৈরী করে শিশুকে দেখানো যায়।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলে কিছুটা শিশু মনস্তাত্ত্বিক ও বিজ্ঞান পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়। কাঠ দিয়ে শিশুদের সমসাইজের অক্ষর তৈরী করে রাখা হয়। মনে করুন – বছরের শুরুতে প্রথম দিনে পনেরটি শিশু বেবী ক্লাসে ভর্তি হলো। তাঁদের প্রত্যেককে ডেকে ডেকে নাম জিজ্ঞাসা করা হলো। সবাই তাদের নাম জোরে বললো। এরপর কামাল নামের ছেলেটিকে ডেকে অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো এর নাম কি? যদি এমন হয় কেউই তার নাম মনে রাখেনি, তাকে পুণরায় তার নাম জিজ্ঞাসা করা যায়। সে বলবে আমার নাম কামাল।

কাঠের অক্ষরের নাম জিজ্ঞাসা করা

তারপর কাঠের একটি 'ক' অক্ষর হাতে নিয়ে শিক্ষক শিশুদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন "তোমরা কি এর নাম জান? তোমাদের মধ্যে কে কে জানো হাত তোলো।" যদি কেউ আগে 'ক' না দেখে থাকে এবং নাম না বলতে পারে তখন শিক্ষক বলে দেবেন এর নাম হলো 'ক'। কাঠের 'ক' অক্ষরটিকে কামালের হাতে দিয়ে শিক্ষক বলবেন কামাল "এই 'ক' অক্ষরটি তোমার বন্ধু। তুমি তাকে ধরে থাক।

অতঃপর শিক্ষক খলিল বা খোকন নামের কোন শিশুকে ডাকতে পারেন এবং কাঠের 'খ' অক্ষরটি তুলে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন ওটার নাম তারা জানে কিনা। যদি না জানে তবে শিক্ষক বলে দেবেন এর নাম হলো 'খ'। শিক্ষক 'খ' অক্ষরটিকে খলিলের হাতে দিয়ে বলবেন 'খ' হলো তোমার বন্ধু। তুমি তার নাম ভুলে যেয়োনা। এভাবে গনি নামের ছেলের হাতে কাঠের 'গ' অক্ষর, ঘোরীর হাতে 'ঘ' অক্ষর সোয়েবের হাতে 'ঙ' অক্ষর ইত্যাদি এক একটি অক্ষর দিয়ে দিতে পারেন।

কাঠের অক্ষর পরিচিতি মূল্যায়ন

পাঁচটি শিশুর হাতে পাঁচটি অক্ষর দিয়ে অক্ষর পরিচিতির মূল্যায়ন চলতে পারে। তাঁদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর নাম বলতে পারে কি না। যদি তারা বলতে পারে তবে কামালকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে গনির বন্ধুর (গ) নাম কি? শোয়েবকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে খলিলের বন্ধুর (খ) নাম কি? এভাবে অনুশীলনটির মহড়া পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

পরবর্তীতে অন্যান্য শিশুদেরকে একজন একজন করে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। কামাল, গনি, শোয়েব ও বন্ধু ঘোরীর অক্ষরগুলোর নাম তারা বলতে পারে কি-না। যদি কেউ না পারে, ক্লাসের অন্য যারা পারে তারা বলে দেবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেখা যাবে ক্লাসের ১৫টি শিশুই ৫টি কাঠের অক্ষর চিনে নিতে পেরেছে।

কাঠের অক্ষরগুলি কক্ষের এক পাশে এক জায়গায় রেখে একজন একজন করে শিশুদেরকে বলা যেতে পারে 'ক' বা 'খ' বা যে কোনো অক্ষর তুলে নিতে। যদি সঠিক অক্ষরটি তুলে নিতে পারে, তবে বোঝা গেল তার অক্ষর পরিচিতি হয়ে গেছে।

কাঠের অক্ষর নিয়ে খেলা

কাঠের বড় অক্ষরগুলি নিয়ে নানা প্রকার খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' 'ঙ' ইত্যাদি অক্ষরগুলো দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে রেখে শিক্ষক শিশুদেরকে বলবেন – 'ঙ' ছুঁয়ে আসতে, কে কে পারবে। যারা হাত তুললো তাদের একজনকে বলবেন 'ঙ'কে ছুঁয়ে এসো। এভাবে অন্যান্য অক্ষরগুলি কে কে স্পর্শ করে আসতে পারে জিজ্ঞাসা করে যারা হাঁ সূচক জবাব দেয়, তাদের একজনকে এক একটি অক্ষর স্পর্শ করে আসতে বলা যেতে পারে।

শিশুরা অনেক সময় একজন আর একজনকে থাপ্পড় দিতে আনন্দ পায়। শিক্ষক হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন তোমাদের মধ্যে জামালের বন্ধু অক্ষরটিকে কে থাপ্পড় দিতে চাও, (অবশ্য যদি কাঠের অক্ষরগুলো বেশ শক্ত হয় এবং ভাঙ্গার সম্ভাবনা না থাকে)। যারা হাত তুললো তাদের একজনকে বললেন – যাও জামালের বন্ধুর নাম চিৎকার করে ডেকে তাকে আস্তে একটা থাপ্পড় দিয়ে এসো।

তারপর হয়ত শিক্ষক বললেন – গনির বন্ধুকে কে থাপ্পড় দিতে পারবে? এভাবে বারবার শিশুদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাঠের সঠিক অক্ষরটির দিকে নিয়ে আসতে হবে। এরূপ খেলার মাধ্যমে দেখা যাবে যে এক দিনেই শিশুরা হয়তো পাঁচটির বেশি অক্ষর চিনে ফেলেছে। কাঠের অক্ষরগুলোর গায়ে হাত বুলোতে শিশুদেরকে বলা যেতে পারে যাতে অক্ষরের সাইজ সম্বন্ধে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়।

কাঠের অক্ষরের তুলনামূলক কার্যকারিতা

পোষ্টার অপেক্ষা কাঠের অক্ষর বর্ণ পরিচয় শিক্ষা দেয়ার জন্যে অনেক বেশি কার্যকরি। কারণ কাঠের অক্ষর হাত দিয়ে ধরা যায়। অক্ষরটির গায়ে হাত বুলিয়ে অক্ষরের আকার সম্বন্ধে শিশু অধিকতর সচেতন হয়। বই বা পোষ্টার শিশু শুধু চোখ দিয়ে দেখে। কাঠের অক্ষরের ক্ষেত্রে চক্ষু এবং ত্বক (হাত) – দু'টির ব্যবহার হয়।

অক্ষর যে কাঠের হতে হবে এমন নয়। টিন বা বাঁশ দিয়ে অক্ষর তৈরী করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এবং আমাদের দেশেও প্লাষ্টিকের বিভিন্ন সাইজের অক্ষর কিনতে পাওয়া যায়।

কাঠের বা টিনের অক্ষর বিভিন্ন সাইজের হতে পারে। শিশুকে দেখাবার সময় ক্রমশঃ বড় অক্ষর হতে ছোট সাইজের অক্ষর দেখাতে হবে। যদি শিশু কাঠের ছোট অক্ষরটি সঠিকভাবে চিনতে পারে, তখন পোষ্টারের অক্ষর দেখাতে হবে।

পোষ্টারে অক্ষর পরিচয়

পোষ্টারের দিকে শিশুকে তাকাতে বলে জিজ্ঞাসা করতে হবে, 'এই পোষ্টারে 'খ' অক্ষরটিকে দেখাতে পারবে? যারা হাত তুলবে তাদের একজন দু'জনকে তা দেখাতে

পোষ্টারের কাছে আসার জন্য বলতে হবে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে 'চ' অক্ষরটি ক'জনে বার করতে পারবে ? 'ট' অক্ষরটি কতজনে বার করতে পারবে।

যদি শিশুরা পোষ্টারের সকল অক্ষরগুলো বের করে বলতে পারে, তবে বুঝতে হবে তারা অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষর দেখেও চিনতে পারবে। তারপর তাদেরকে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের অক্ষরের চার্ট দেখানো যেতে পারে এবং তারা চার্ট হতে অক্ষরগুলোর নাম বলতে পারে কিনা – তা পরীক্ষা করতে হবে।

চার্টের মাধ্যমে অক্ষর পরিচয় হয়ে গেলে তখন শিশুর হাতে বই দিতে হবে। বই দিয়ে তাকে বলতে হবে, "তোমরা দেখতো তোমাদের বইতে 'ঘ' অক্ষরটি আছে কিনা। যে শিশু পেয়েছি বলে প্রথম হাত তুলবে তাকে বলতে হবে সবাইকে তার বই এর 'ঘ' অক্ষরটি দেখিয়ে দেয়ার জন্যে।

যারা অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্র তারা হয়তো অন্যদের আগে বর্ণ পরিচয়ের কোনো বই হতে সবগুলো অক্ষর দেখিয়ে দিতে পারবে। যারা অত মেধাবী নয়, তাদেরকে শিক্ষকের ভুলে গেলে চলবে না।

অক্ষরের নাম উল্লেখ করে তাদের বলতে হবে অক্ষরটি খুঁজে বের করে দেয়ার জন্যে। তাদেরকে অধিকতর বেশি সময় দিতে হবে। এবং তারা যাতে অক্ষরগুলো চিনে নিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মাটির অক্ষর

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাটি দিয়ে খেলতে ভালোবাসে। শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও ছেলেমেয়েরা মাটি জাতীয় বস্তু নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। সেখানে রাবার বা অনুরূপ বস্তু দিয়ে কাই বা আটা তৈরী করে বাক্সে পুরে বিক্রি করে। এগুলো দিয়ে শিশু বিভিন্ন জিনিস এবং অক্ষর বানায়।

পল্লী অঞ্চলে শিশুদেরকে মাটি দিয়ে অক্ষর বানাতে উৎসাহিত করতে হবে। ক্লাসে তাদেরকে মাটির অক্ষর বানাতে বলা যেতে পারে। 'ক', 'খ', 'গ' ইত্যাদি অক্ষর মাটি দিয়ে বানাতে বানাতে তারা অক্ষরের আকার সম্বন্ধে সচেতন হবে। যে শিশু প্রথমে সুবিধা করতে পারবে না, শিক্ষক তাকে মাটি দিয়ে অক্ষর বানিয়ে দেখাবেন। তারপর অক্ষর ভেঙ্গে দিয়ে শিশুকে সাহায্য করে তাকে দিয়ে অক্ষর বানিয়ে নিবেন।

যখন দেখা যাবে কোন শিশু অক্ষরটি মোটামুটি ভালোভাবে মাটি দিয়ে বানাতে পেরেছে তখন তার অক্ষর স্কুল বা মক্তব্যের এমন জায়গায় রাখার জন্যে বলা যেতে পারে যাতে অক্ষর শুকিয়ে শক্ত হয়। অক্ষর শুকিয়ে শক্ত হলে তাকে অক্ষরগুলো একটি দু'টি বা কয়েকটি করে বাড়ী নিয়ে চুলার মধ্যে ফেলে পুড়ে শক্ত করে আনতে বলা যেতে পারে।

মসজিদের দেয়ালে আরবী অক্ষর

মসজিদের দেয়ালে কুরআনের আয়াতের নক্শা খোদাই হয়। কুমিল্লা জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলা সদরে একটি বিরাট মসজিদ আছে। এর পশ্চিম দিকের দেয়ালে কুরআনের আয়াত সুন্দরভাবে খোদাই করা আছে। দেয়ালে সূরা ইয়াসিন-এর আয়াতগুলো খোদাই করে রাখা যায়। কিন্তু খোদাই করা আয়াত শিক্ষা বা তিলওয়াত করা যায় না। এগুলো রাখা হয় বরকত এবং সৌন্দর্য্যের প্রতীক হিসেবে। আয়াতুল কুরসী বা অন্যান্য আয়াত খোদাই করা হয় মসজিদের দেয়ালে এবং তা করা সাধারণতঃ পশ্চিম দিকের দেয়ালে।

অন্যান্য দেয়ালগুলোতে আরবী বর্ণমালার অক্ষর বড় আকারে খোদাই করে রাখা যেতে পারে। যে যে অক্ষর শব্দের প্রথমে, মাঝখানে বা শেষ দিকে এলে পরিবর্তন হয়, সেগুলোর বিভিন্ন আকৃতি খোদাই করে রাখা যেতে পারে। এই অক্ষরগুলোর উপর চোখ পড়লে যারা আরবী কুরআন কোনো ভাবে শিখেছেন, পরে নানা কারণে তিলাওয়াত ছেড়ে দেয়ার ফলে – এখন তিলাওয়াতও করতে পারছেন না, তাদেরও কিছু সুবিধা হয়। পৃথক পৃথক বড় অক্ষরের ব্লক খোদাই করা থাকলে ওগুলোর উপর দৃষ্টি পড়লে অক্ষরগুলো অন্তত চিনে রাখতে সুবিধা হয়।

প্রত্যেকটি মসজিদেই আরবী বর্ণমালার বিভিন্ন সাইজের প্রচুর পরিমাণ অক্ষর কাঠ, টিন, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি দিয়ে তৈরী করে রাখা যেতে পারে। এই অক্ষরগুলো দেখতে দেখতে এবং উস্তাদের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন – উচ্চারণ করতে করতেই অনেকের অক্ষর পরিচয় সুষ্ঠু হবে এবং তিলাওয়াত ভালো হবে। মসজিদে এবং মক্তবের জন্যে আরবী বর্ণমালা তৈরীর কাঠ পেতে এবং এ জন্যে অর্থ সাহায্য পাওয়া হয়তো কঠিন হবে না।

অনেকেই বয়স বাড়ার পর নামাজ পড়তে চান। কিন্তু সূরা কিরাত আরবী পড়ার অভ্যাস না থাকার ফলে ভালোভাবে পড়তে পারেন না। মসজিদে রক্ষিত কাঠ, টিন, প্লাষ্টিক, হার্ডবোর্ড ইত্যাদির আরবী অক্ষর তাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে।

মাক্‌তাবে বয়স্ক শিক্ষা

স্বাক্ষরতার হার

ভারত বিভক্তির পর আমরা দু'দু'বার স্বাধীন হয়েছি। দু'পতাকার তলে আমরা দীর্ঘ ৫২টি বছর অতিবাহিত করেছি। এই ৫২ বছরে অনেক সরকার এসেছে। এইসব সরকারের আমলে অনেক জাদরেল শিক্ষামন্ত্রী নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অনেক চটকদার কথা শুনিয়েছেন। কোটি কোটি টাকার বিভিন্ন ব্যয়বহুল পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই ৫২ বছরে জাতির আশানুরূপ স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায়নি।

পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ১৬% ভাগ স্বাক্ষরতার হার নিয়ে। দীর্ঘ সাতাশ বছরে স্বাক্ষরতার হার দাঁড়ায় ২১% ভাগ। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে সমাজ সেবা ও শিক্ষা বিস্তারের অবদান আমরা রেখেছি – প্রথম ১০ বছরে স্বাক্ষরতার হার ২১% ভাগ হতে ২২% ভাগ-এ উন্নীত হয়। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে বিগত দু'শ বছর ধরে, প্রধানত প্রাইমারী শিক্ষালয়, বক্তৃতা মঞ্চ এবং গণশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে।

বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে প্রাইমারী শিক্ষা ও গণশিক্ষার জন্য সরকারের বার্ষিক ব্যয় সব কিছু মিলিয়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। পূর্বে এ টাকার পরিমাণ অনেক কম ছিল। কিন্তু এ ব্যয় চলছে বহু যুগ ধরে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বছরের পর বছর এই বিরাট বিনিয়োগের সার্বিক ফল ২২% ভাগ স্বাক্ষরতা। শতাব্দীর শেষ দশকে স্বাক্ষরতার হার অনেক বেড়েছে।

মাক্‌তাব শিক্ষকের প্রভাব

শতাব্দীর আশি দশকে শতকরা ২২ জনই যে বই পড়তে পারতো, তা নয়। যারা শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে কলম ভেঙ্গে ফেলতো, তারাও এর অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিরাট অংশের অক্ষর পরিচয় নেই। সরকারী শিক্ষা কার্যক্রমের কোনো হাওয়া এদের গায়ে লাগেনি। কিন্তু   গ্রাম-বাংলার শতকরা ৯৫ জন মুসলিম যে নামায পড়ে এবং সূরা, দু'য়া দরূদ কিছু কিছু জানে তা অস্বীকার করা যায় না। এই বিরাট জনসমষ্টিকে, আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌, কুল আউজু, নাওয়াইতুয়ান কে শেখাল ? এটা কাদের অবদান ? বস্তুতপক্ষে মাক্‌তাব শিক্ষকদের প্রভাব বাংলাদেশের গাঁয়ের প্রতিটি মুসলমানের জীবনে ও মনে কিছু না কিছু পড়েছে।

গ্রাম-বাংলায় যত লোক বাংলা বই পড়তে পারে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক লোক কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে। এটা কার অবদান ? প্রাইমারী ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য বছরে দু'শ কোটি টাকা সরকার খরচ করেন। কিন্তু মাক্‌তাব শিক্ষার জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ব্যয় করেন না। যারা কোনরূপ সরকারী সাহায্য ছাড়া

এদেশের মানুষকে আরবী ভাষায় স্বাক্ষরতা দান করিয়েছেন এবং কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে স্বাক্ষরতা ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে আনা হলে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার যে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নীত হবে -- তা আশা করা হয়তো অযৌক্তিক হবে না।

মসজিদে বয়স্ক শিক্ষা

নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সরকার প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ করেছেন, গ্রাম-গঞ্জে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এগুলোর সংখ্যা সীমিত। যেমন, বাংলাদেশে ৮৫ হাজার গ্রাম আছে, কিন্তু প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা মাত্র ৪০ হাজার। অর্থাৎ বড় বড় গ্রামে একাধিক প্রাইমারী স্কুল আছে। তাই প্রাইমারী স্কুলহীন গ্রামের সংখ্যা ৫০ হাজারও হতে পারে। অপরদিকে, মসজিদ তো শুধু গ্রামে নয়, বলতে গেলে প্রায় প্রতি মহল্লাতেই আছে। আনুমানিক হিসাবে ৫০ হাজার স্কুলহীন গ্রামে কম করে হলেও ৬০ হাজার মসজিদ আছে। এর মধ্যে অনেকগুলো পাকা বা ভাল টিনের ঘর।

প্রাইমারী স্কুল বা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র অপেক্ষা এসব মসজিদে লোকজনের আসা-যাওয়া বেশি। প্রাইমারী স্কুল অপেক্ষা মসজিদে যাতায়াতের ব্যবস্থা অনেক ভাল। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে যেতে লোকের সংকোচ হয়, লজ্জাবোধ করে। কিন্তু মসজিদে যেতে কারও কোনো সংকোচ নেই। বরং আগ্রহ থাকে। তাই প্রতিটি মসজিদে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হলে অনেক কম ব্যয়েই গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে পারে।

আগামী ৫০ বছরেও হয়তো সরকারের পক্ষে প্রতি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। বিশেষ কতগুলো ক্রটির কারণে এখানে সেখানে গড়ে ওঠা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমেও তেমন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। সে কারণেই জনগণের প্রচেষ্টায় নির্মিত বাড়ীর কাছের এই মসজিদসমূহকে সহজেই বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের কাজে ব্যবহার করা যায়।

সবচেয়ে কম ব্যয়ে শিক্ষা

মাক্তাব শিক্ষকের জন্য মাথাপিছু ব্যয় হবে সবচেয়ে কম। অন্য কোনো বিভাগের নিম্নতম সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় মাক্তাব শিক্ষকদের চাহিদা আজও কম। তাঁরা সরল জীবন যাপন করেন। একটি সরকারী অফিসের পিয়ন চাপরাশীর বেশ-ভূষায় যতটুকু বাবুয়ানার ছাপ আছে, মাক্তাব শিক্ষকের জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই সে প্রভাব পড়েনি। তাঁরা অল্পতেই তুষ্ট।

একজন প্রাইমারী শিক্ষকের জন্য রেশন ও অন্যান্য সুবিধাসহ প্রতি মাসে সরকারের প্রায় ৬০০ টাকা খরচ হয়। এই টাকা দিয়েই অন্তত তিনজন মাক্তাব শিক্ষক নিয়োগ করা যায়। কারণ মাক্তাবে শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি মসজিদের ইমাম। সেই হিসেবে তিনি সেখানেও কিছু বেতন-ভাতা ও সুবিধা পান। সরকারের চার হাজার নতুন প্রাইমারী স্কুল করার পরিকল্পনা আছে। যে ব্যয়ে চার হাজার নতুন প্রাইমারী স্কুল পরিচালনা করা হবে ঐ ব্যয়েই কম করে হলেও বার হাজার মাক্তাব পরিচালনা করা যায়।

বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়াকে সরকার যখন নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন, তাই এটা স্বাভাবিক যে যত কম ব্যয়ে এই দায়িত্ব পালন করা যায় সেদিকে

লক্ষ্য রাখা হবে। অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে মাক্তাব শিক্ষকদিগকে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত করা যায়।

বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের কয়েকটি ত্রুটি

আমাদের দেশে গ্রামগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হচ্ছে। সরকারও এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ উৎসাহ ও সাহায্য দিচ্ছেন। এরপরও স্বাক্ষরতার হার বাড়ছে না। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলো বয়স্কদেরকে কেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হচ্ছে। যে সমস্ত বয়স্করা একবার ভর্তি হন, তাদেরকেও কেন্দ্রে বেশি দিন ধরে রাখা যায় না। বস্তুতপক্ষে এর মূলে রয়েছে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের কতগুলো সাধারণ ত্রুটি। যেমন –

১. অধিকাংশ স্থানেই বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলো গড়ে ওঠে মোড়ল-মাতব্বরদের বাড়ীর দহলিজে বা বৈঠকখানায়। গ্রামে এমন অনেক লোক আছে যারা অন্য কারও বাড়ীতে গিয়ে পড়াশুনাকে খুব একটা ভাল নজরে দেখেন না। ফলে অনেক সময় মোড়ল-মাতব্বরদের বাড়ীতে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু হলেও শিক্ষার্থী সংগ্রহ করা যায় না।

২. বয়স্ক স্কুলের শিক্ষকদের বয়স নিয়েও একটি সমস্যা আছে। বয়স্ক স্কুলগুলোতে সাধারণত কম বয়সী যুবকেরাই শিক্ষক হিসাবে কাজ করে থাকেন। বয়স্করা সাধারণত কম বয়সী এসব যুবকদের কাছে লেখাপড়া করতে বেশ কিছুটা সংকোচ বোধ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ছোট ভাইয়ের বন্ধুর কাছে বড় ভাই পড়াশুনা করবে – এটা কেমন যেন একটু বেমানান মনে হয়। ফলে যাদের উদ্দেশ্যে এই বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়, তারা দিনে দিনে কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে।

৩. কোনো বয়স্ক লোককে খাতাপত্র হাতে নিয়ে হাইস্কুলে বা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষাকেন্দ্রে যেতে দেখলে গ্রামীণ পরিবেশে তা বেমানান মনে হয় এবং এ নিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। বই পুস্তক শিক্ষাকেন্দ্রে রেখে আসারও তেমন সুযোগ নেই। তাতে বই-পুস্তক হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৪. অনেক সময় হয়তো দেখা যাবে যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের স্মৃতিশক্তি কমে আসে। মুখস্থ করার বিষয় শিক্ষা করা বয়স্কদের জন্য খুবই কষ্টকর। তা ছাড়া রয়েছে উচ্চারণ বিভ্রাট। শিশুরা যেমন শোনে তেমনি উচ্চারণ করতে পারে, কিন্তু বয়স হয়ে গেলে তা সম্ভব নয়।

বয়স্করা যখন কোনো বাড়ীর দহলিজে বা বৈঠকখানার নৈশ স্কুলে বাংলা পাঠ শুরু করে, তখন চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুদের হাসি চেপে রাখা কষ্টকর হয়। অনেক সময় বয়স্কদের ভুল উচ্চারণ গাঁয়ের শিশুদের কণ্ঠে পথে-ঘাটে উচ্চারিত হতে থাকে। বয়স্করা অবশ্যই বুঝতে পারেন – কাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে। তখন ব্যাপারটা তাদের কাছে দারুণ লজ্জার কারণ হয়ে ওঠে। এটা ভাল কি মন্দ তা সুস্পষ্ট। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

৫. অনেক সময় বয়স্কদের শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রামের বালকেরা স্মৃতি সুখকর ছড়া কাটে। নানারূপ রসালো মন্তব্য করে, যা অন্যদের কাছে যতই রসাত্মক হোক না কেন যার সম্বন্ধে বলা হয় তার জন্য বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বস্তুতপক্ষে এ সব কারণে বয়স্ক লোকেরা নৈশ বিদ্যালয়ে বা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে যেতে উৎসাহবোধ করে না।

মসজিদ মাক্তাবের প্রতি আগ্রহ

মাক্তাবে পাঠ করাটা কখনও লজ্জার ব্যাপার নয়। কারণ, সম্মানিত সাহাবিগণ সকলেই মধ্যবয়সে লেখাপড়া শুরু করেছেন। মসজিদ মাক্তাবে কেউ সূরা কিরাতে ভুল উচ্চারণ করলে তা নিয়ে তামাশা করার উদ্দেশ্যে আরো বিকৃত উচ্চারণ করা হয় না। কারণ, তা কবিরা গুনাহ্। মাক্তাবে বই পুস্তক হাতে নিয়ে যেতে হয় না। সেখানে বই খোলামেলা রেখে প্রাইমারী বা হাইস্কুলের তুলনায় চুরির আশংকা তেমন একটা নেই।

তাছাড়া, কাউকে কোনো সময় মসজিদে যেতে দেখলে কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন – সে প্রশ্ন জাগে না, যেমন জাগে কোনো বয়স্ককে স্কুলস্থিত বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে যেতে দেখলে। কারণ, মসজিদ তো সকলেরই ঘর। রাতদিন, সকাল-বিকাল, সব সময়ের জন্যই মসজিদের দ্বার উন্মুক্ত। যে কেউ যে কোনো সময় এখানে আসতে পারে। তাছাড়া ইমামের কাছ থেকে পাওয়া যায় যে শিক্ষা, তাতে লজ্জা নেই বরং আছে সীমাহীন সওয়াব এবং নেকী।

তার চেয়ে বড় কথা এই যে মাক্তাব শিক্ষার প্রতি বয়স্ক লোকের একটা সাধারণ আকর্ষণ আছে। যে কোনো ওয়াজ মাহফিলে শিশুদের অপেক্ষা বয়স্কদের উপস্থিতি থাকে বেশি। মাক্তাব কেন্দ্রিক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শুধুমাত্র অ, আ, ক, খ, বা ১, ২, ৩, ৪ পড়ানো হয় না। সে সঙ্গে রোযা, নামায, মাসআলা মাসায়েল ও বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কেও জ্ঞান দেয়া হয় এবং সে কারণেই মাক্তাবকে কেন্দ্র করে বয়স্ক শিক্ষা চালু করা হলে বেশি কার্যকর হবে। বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্রে ধরে রাখা সহজ হবে।

ব্যবহারিক কর্মশালা

আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, তা শিক্ষা দেয়ার জন্য ধর্মীয় কর্মশালা মাক্তাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিদের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থানে কর্মশালা, ক্লাব, হল, সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র অনুষ্ঠিত হয়। কয় হাজার লোককে এ সব কর্মশালায় আনা সম্ভব ? হাজার চেষ্টা করেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোককে কর্মশালায় ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন মূল্যবোধ ও প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে ট্রেনিং দেয়া সম্ভব হবে না।

পল্লী অঞ্চলের নাগরিকের বাস্তব জীবনমুখী ট্রেনিং বা কর্মশালা হতে পারে মসজিদ বা মাক্তাবে। এর পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারেন একজন প্রশিক্ষিত ইমাম। ইমাম সাহেব তো প্রতি সপ্তাহেই মসজিদে ধর্মীয় কর্মশালার অনুষ্ঠান করছেন। দুনিয়াবী জীবনে কি করতে হবে এবং কি করা উচিত নয়, তা তিনি বুঝাচ্ছেন। 'ফিল আখিরাতে হাসানাতাও'-এর ছবক তিনি দিচ্ছেন। 'ফিদদুনিয়া হাসানাতাও' কি তা তিনি ভাল করে জানেন না। কি ভাবে গ্রামের মানুষের অবস্থার উন্নতি করা যাবে সে শিক্ষা ও জ্ঞান ইমাম সাহেবকে দেয়া হলে তিনি দুনিয়ার কল্যাণের ওয়ার্কশপ মসজিদ মাক্তাবেই পরিচালনা করতে পারেন।

সিলেবাস

বয়স্কদের ভালমন্দ, মারুফ-মুনকার, নাগরিক কর্তব্য-দায়িত্ব গ্রাম উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে হেদায়েত দানের জন্য একটি সিলেবাস ও ম্যানুয়েল তৈরী করে ইমাম এবং মাক্তাব শিক্ষকদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা যায়। সুচিন্তিত হলে এরূপ একটি কোর্স অর্থবহ এবং জনগণের জন্য কল্যাণকর হবে।

নবায়ন বা রিফ্রেসার কোর্স

বয়স্কদের জন্যে বাংলা শিক্ষা ছাড়াও চিরাচরিত মাক্তাব শিক্ষা সম্পর্কে মাঝে মাঝে পুনরালোচনা প্রয়োজন। ছোট বেলা একবার নামাযের সূরা-দরূদ মুখস্থ করলেই চলে না। কতটুকু হারিয়ে গেল, কতটুকু মনে থাকল – তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে নিতে হয়।

অনেক টেস্ট এবং অনেক পরীক্ষায় পাস করে চাকুরীতে ঢুকলাম। তাই বলে সব কিছু জানি, এটা ঠিক নয়। বড় বড় অফিসারদের জন্যও নবায়ন কোর্স বা রিফ্রেসার কোর্স হয়।

নামায-রোযা এবং ইসলামী আখলাকের ব্যাপারেও অনুরূপ কোর্সের প্রয়োজন। বিশেষ করে কুরআন তিলাওয়াত এবং সূরা কিরআত শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য বারবার অনুশীলন করতে হয়। নামায পড়ে মনে মনে ভাবি – সব কিছু ঠিক আছে। কিন্তু পরীক্ষা দিতে গেলে দেখা যাবে যে, নিজের পড়ার মধ্যে অনেক গলদ রয়ে গেছে।

দেখা যাবে, মুখস্থ দোয়া দরূদের শুধু দু'একটি শব্দই নয়, মাঝে মধ্যে গোটা বাক্য বাদ পড়ে যায়। তাই শিক্ষিত এবং বড়দের জন্য বয়স্ক মাক্তাব প্রয়োজন। এখানে বড়রা শিক্ষকের নিকট নিজেদের দোয়া-দরূদ, সূরা কিরআত শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

বয়স্ক মাক্তাব এবং শিশু মাক্তাব একই মসজিদে এবং একই সময়ে হতে পারে। বয়স্ক মাক্তাব বসবে মসজিদের ভেতর এবং শিশুদের মাক্তাব মসজিদের বারান্দায়। দ্বীনি শিক্ষায় লজ্জার কিছু নেই। সাহাবায়ে কিরাম অনেকেই মুসলমান হয়েছেন ৪০-এর উর্ধ্ব বয়সে এবং দ্বীনি তালিম গ্রহণ করেছেন মসজিদ মাক্তাবেই।

একটি প্রস্তাব

সরকার পরীক্ষামূলকভাবে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন। যে সমস্ত গ্রামে প্রাইমারী স্কুল আছে, সে সব গ্রামকে বেছে নিতে পারেন। ঐ সমস্ত স্কুলের শিক্ষকগণ প্রাইমারী স্কুলে পড়ানো ছাড়াও গ্রামের লোকদের বয়স্ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন। গ্রামের বয়স্করা অক্ষর জ্ঞান না পেলে সেজন্য প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ দায়ী থাকবেন। অপরদিকে, যে সমস্ত গ্রামে কোনো প্রাইমারী স্কুল নেই, সে সমস্ত গ্রামের ইমাম বা মাক্তাব শিক্ষককে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য দায়িত্ব দিতে পারেন।

এ দায়িত্ব পালনের জন্য একজন মাক্তাব শিক্ষককে একজন প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকের জন্য যা ব্যয় হয়, তার এক-তৃতীয়াংশ ভাতা হিসাবে দেয়া যেতে পারে এবং ঐ গ্রামের কোনো লোক অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন না হলে সেজন্য মাক্তাব শিক্ষক দায়ী থাকবেন। এছাড়া প্রতিটি গ্রামে শিশু জন্ম হলে মাক্তাব বা প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রেজিস্ট্রেশন করবেন। শিশুর জন্মের ৪ বছর পর শিশুটি কেন স্কুল বা মাক্তাবে ভর্তি হয়নি এর অনুসন্ধান করবেন এবং শিশুটির শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নতুবা এর জন্য প্রধান শিক্ষক দায়ী থাকবেন। এভাবে পরীক্ষা চালিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাক্তাব শিক্ষক যে কতটুকু অবদান রাখতে পারেন, তা দেখা যেতে পারে। তবে আমাদের বিশ্বাস, অন্যান্যদের চাইতে এ ক্ষেত্রে মাক্তাব শিক্ষকদের অবদানই হবে তুলনামূলকভাবে বেশি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাফিজিয়া মাদ্রাসা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের সর্ব প্রথম হাফিজ। তিনি ছিলেন আমাদের ইতিহাসে সর্ব প্রথম ক্বারী এবং ইমাম। কুরআনের শিক্ষা যারা মুসলিম সমাজে চালু রেখেছেন তাদের মধ্যে হাফিজ, ক্বারী এবং ইমামদের অবদান সবচেয়ে বেশি। যিনি ক্বারী তিনি ইমাম হতে পারেন। কিন্তু হাফিজ নাও হতে পারেন। যিনি ইমাম হবেন তাকে অবশ্যই ক্বারী হতে হবে। কিন্তু হাফিজ না হলেও চলে। যিনি হবেন হাফিজ তাকে প্রথমে ক্বারী হতে হবে। আর এই দু'বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইমাম হওয়ার যোগ্যতা স্বাভাবিক ভাবেই রাখে। হাফিজের মধ্যে রয়েছে ক্বিরাত, হিফ্জ এবং ইমামত এই তিনটি গুণের সমন্বয় ও দক্ষতা।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর পরে মহান সাহাবীগণ হিফ্জ এর উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করেন। সাহাবীগণ অনেকেই ছিলেন হাফিজ। হযরত আবু বাকারের (রাঃ) খেলাফতকালে মোছাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফিজ শাহাদাত বরণ করেন। তখন পর্যন্ত হাফিজদের মাধ্যমে মূলতঃ কুরআন সংরক্ষিত ছিল। বহু সংখ্যক হাফিজ এক সঙ্গে শাহাদাৎ বরণ করাতে কুরআন সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংকলনের প্রয়োজনীয়তা সর্ব প্রথম তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এক সঙ্গে ইয়ামামার যুদ্ধে এতো হাফিজ শাহাদাৎ বরণ না করলে হয়তো সমগ্র কুরআন সংকলনের প্রক্রিয়া খেলাফত পরবর্তী যুগ পর্যন্ত বিলম্বিত হতো।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সময় থেকে কুরআন হিফ্জের যে সুন্নাত শুরু হয়েছে আজো তা মুসলিম বিশ্বে চালু আছে। শুরুতে আরব মুসলিম যারা কুরআনের অর্থ বুঝতেন তারাই কুরআন হিফজ করতেন। এখন শুধু আরবগণ হিফ্জ করতে পারেন, তা নয়। যারা কুরআনের শব্দার্থ বুঝেন না, এমন অনারবও হিফ্জ করতে পারেন। যারা অর্থ বুঝেন না শুধু তারাই নয়, যারা জন্মান্ধ তারাও কুরআন মুখস্থ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায় বিশ্বে বর্তমানে প্রায় এক কোটিরও অধিক হাফিজ রয়েছে। দুনিয়াতে এমন আর কোনো দ্বিতীয় গ্রন্থ নেই যা অতো বেশি সংখ্যক দূরের কথা বিভিন্ন ভাষাভাষীর একজন লোকও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করতে সক্ষম।

সংহতি সৃষ্টিকারী পুস্তক

সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতত্ববোধের অন্যতম প্রধান ভিত্তি ও বন্ধন হলো আল-কুরআন। সারা পৃথিবীর মুসলিম আরবী ভাষায় লিখা কুরআন তিলাওয়াত করেন। ব্যক্তিগত মুনাজাত মাতৃভাষায় করাই ভালো হয়। আনুষ্ঠানিক বা

জামায়াতের মুনাজাত কুরআনের আয়াত দ্বারা করা হয়। সারা বিশ্বের অনেক মুসলিম ধর্মীয় বিধান পালনের জন্য কুরআনের বেশ কয়েকটি সূরা মুখস্থ করেন। ঐশী গ্রন্থ কুরআন বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করেছেন।

শ্রুতিমধুর ও শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন তিলাওয়াত এবং শ্রবণে হৃদয়ে এক অনাবিল শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। কুরআনের সুর ও ধ্বনি অনেকের নিকট গানের সূরের থেকে অধিক মধুর। কুরআনের ধ্বনি, সুর, ছন্দ, আবেদন, আদেশ, নিষেধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দৃষ্টান্ত, হুশিয়ারী ও ভাবার্থ অনেক অমুসলিমকেও আকর্ষন ও বিমোহিত করে। কোনো কোনো হাফিজের উচ্চারণ সহীহ্ কিন্তু মধুর নয়। কারো কারো উচ্চারণ ততটুকু সহীহ্ নয় কিন্তু শ্রুতিমধুর। কুরআন তিলাওয়াতে শুদ্ধতা এবং মাধূর্যতা উভয়টাই প্রয়োজন।

অর্থ না বুঝে হিফ্জ

অর্থ না বুঝে কুরআনের ছয় হাজারের বেশি আয়াতের সবগুলো শব্দ একটির পর একটি মুখস্থ এবং মুখস্থ রাখা অতি কঠিন কাজ। নিজের লেখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি চিঠির প্রতিটি বাক্যের শব্দগুলো পরস্পর মুখস্থ রাখা এবং আবৃতি করা কয়জন মানুষের পক্ষে সম্ভব ? অথচ এত বড় কুরআনের শব্দগুলো নির্ভুল ভাবে মুখস্ত করা এবং সারা জীবন মুখস্ত রাখা অনেক হাফেজের পক্ষেই সম্ভব !

ঝিনুক মার্কা হাফিজ

কৃতিত্ব জাহির করার জন্য মুরগী ডিম পাড়ার পরই চিৎকার শুরু করে। সকলকে জানাতে চায় যে প্রাণী জগতে সে এক মহা অবদান রেখেছে। ঝিনুকের পেটে মনি-মানিক্য বা পার্ল উৎপাদিত হয়। ঝিনুকের পেটে কত দামী জিনিস যে লুকায়িত আছে, ঝিনুক তা অনুধাবন করতে পারলে হয়তো সমুদ্র তলে অথবা পার্ল উৎপাদন কেন্দ্রে নীরব নিথর হয়ে থাকতো না। ঝিনুক যদি মাছের মতো পানিতে ভাসতে, মুরগী বা কোকিলের মতো ডাকতে অথবা আকাশে উড়তে সক্ষম হতো তাহলে ঝিনুক মাছের মতো পানির উপরে উঠে তিড়িং বিড়িং করতো, নতুবা মুরগী বা কাকের মতো চিৎকার শুরু করতো। আত্মসংযমী ঝিনুক হলে কোকিলের মতো মধুর সুর লহরি সৃষ্টি করতো বা বলাকার মতো মনের আনন্দে মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়াতো।

আল্লাহ্র দুনিয়ায় সব চেয়ে মূল্যবান বস্তু হল কুরআনুল কারীম। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। আর এ মানুষ পরিণত হয় আছফালুছ্ ছাফেলিন বা নিকৃষ্টতম বস্তুতে। আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে উন্নত মানের কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কারণে পবিত্র কুরআনের গঠন শৈলী আজ পাঠকের কাছে দৃষ্টি নন্দন হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরাআনের প্রতিটি শ্বাশত বাণী ও অর্থ মুসলমানদের কাছে চির অম্লান, চির নতুন। মুদ্রণ পরিপাট্যে মানের হেরফের হলেও এর একটি কমা, যবরও পরিবর্তন হয়নি। অথচ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থ অনেক পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন হয়েছে।

এহেন কুরআন বক্ষে ধারণ করেন একজন হাফিজ। কিন্তু অর্থ জানা না থাকলে তিনি কতো মূল্যবান সম্পদের অধিকারী তা কি করে অনুধাবন করবেন ? গাধার পিঠে এক মন গোবরের বস্তা বা এক মন হিরকের বোঝার ভার একই। কোন্‌টির গুরুত্ব বা মূল্য কতটুকু তা বুঝার শক্তি গাধার নেই।

কুরআনুল করীম হিফ্‌জ্‌ করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র বান্দার কাছে কুরআনের বাণী প্রচার করা। দেখে দেখে পড়ার মধ্যে বা মুখস্থ তিলাওয়াতের মধ্যে অবশ্যই ছওয়াব আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী অন্য মানুষের কাছে প্রচার করা ছিল নবীদের কাজ। এ জন্যই আল্লাহ্‌ হাজার হাজার নবী পাঠিয়েছেন। বুঝার নিয়ত না করে কুরআন মুখস্থ করলে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যায় এবং এর কল্যাণ হতে মানুষ বঞ্চিত হন। শিশুদের হিফ্‌জকরণ শিশু বয়সে কুরআন না বুঝেই সম্পন্ন করতে হবে।

ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠার একটি ইংরেজী বিশ্বকোষের কোটি কোটি শব্দ থাকে। কিন্তু অক্ষর সংখ্যা ছাব্বিশ এর বেশি নয়। এই অক্ষরগুলো জানা তেমন কঠিন কাজ নয়। অক্ষর এবং শব্দ পাঠ পরিচিত হলে কেউ পুরা বিশ্বকোষ পড়তে পারবে। অনুধাবন ভিন্ন কথা।

কুরআনের এক শব্দ শত শত এমনকি হাজার বার ব্যবহার হয়েছে। কুরআনে যে মৌলিক শব্দগুলো এক বা একাধিক বার আছে এগুলোর সংখ্যা হয়তো কয়েক হাজারের বেশি হবে না। এই শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষা কুরআন মুখস্থ করার মতো কঠিন কাজ নয়। হাফিজ সাহেবেরা ইচ্ছা করলে আল-কুরআনুল কারীমের মৌলিক বা একক শব্দগুলোর আয়াতের অর্থ বুঝে নিতে পারেন।

হাফিজ প্রয়োজন কেন?

ব্যক্তি স্বার্থে হিফ্‌জ প্রয়োজন। সমগ্র আল-কুরআন একজন হাফিজের মস্তিষ্কে এবং কলবে গ্রথিত থাকে। একজন হাফিজ দশজনকে বেহেশতে নিতে পারেন। নিজে তো বেহেশতে যাবেনই যদি আসল ঠিক থাকে।

সামাজিক এবং দ্বীনি স্বার্থেও হিফ্‌জ প্রয়োজন। কোনো বিষয় সম্পর্কে কুরআনের আয়াত বের করতে হলে কুরআন পাঠ করে আয়াত খুঁজে বের করতে হয়। এতে সময়ের প্রয়োজন। একজন হাফিজ অতি দ্রুত যে কোনো আয়াত বের করতে পারেন।

কুরআনের আয়াত দ্বারা দ্বীনির কথা বলার ক্ষেত্রে যোগ্য এবং দক্ষ ব্যক্তি হলেন একজন হাফিজ। হাফিজের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তিনি কুরআনের আয়াতগুলো মনে মস্তিষ্কে রাখবেন। কোনো অনুষ্ঠান হলে তিলাওয়াত করে শুনাবেন। হিফ্‌জের উদ্দেশ্য হলো – প্রসঙ্গ এলেই কুরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াত তিলাওয়াত এবং অর্থ করে শুনাবেন।

আমাদের হাফিজরা সাধারণত এ কাজ করেন না। অধিকাংশের কাজ হলো ইমামতি করা, দু'য়া দুরূদ পাঠ করা, মৃত পথযাত্রীর শিয়রে বসে পবিত্র কুরআন পাঠ করা অথবা মৃত্যু বার্ষিকীসহ অন্যান্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তা গতানুগতিক ভাবে তোতা পাখির মতো পাঠ করে উপস্থিত শ্রোতাদের শুনানো। গতানুগতিক ভাবে তোতা পাখির মতো পাঠ করে উপস্থিত শ্রোতাদের কুরআনের যে আয়াতগুলো তিনি পাঠ করলেন সে আয়াতগুলোর অর্থ শ্রোতাদের শুনানো যে তার দায়িত্ব – অনেকে মনে হয় তা অনুধাবন করেন না। আর করলেও তা এড়িয়ে যান।

হিফজ সাহিত্য

কুরআন হিফ্‌জ করার ফজিলত আলিম এবং হাফিজরা জানেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে অবহিত নয়। হিফ্‌জের ফজিলত বা হাফিজিয়া মাদ্রাসা সম্পর্কে প্রবন্ধ বিষয় পুস্তক তেমন দেখা যায় না। কুরআন হিফ্‌জ সম্বন্ধে পুস্তক এবং প্রবন্ধ রচিত হওয়া প্রয়োজন।

হিফ্জ এর মেয়াদ

কোনো কোনো হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ২-৩ বছরের মধ্যে শিক্ষার্থীগণ হিফ্জ সমাপ্ত করতে পারেন। আবার কোনো কোনো মাদ্রাসায় ৫-৬ বছর লেগে যায়। এরপরও ৩০ পারা হিফ্জ সম্পন্ন হয় না। এর কারণ কী ? বহু কারণ আছে। হতে পারে শিক্ষার্থীদের স্মরণ শক্তি কম এবং তারা হিফ্জ করার অনুপযুক্ত। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। যাদের হাফিজ হওয়ার মতো মেধা এবং স্মৃতিশক্তি আছে তারাও বহু হাফিজিয়া মাদ্রাসা হতে হিফ্জ সম্পন্ন করতে পারেন না। এর একটি কারণ হলো হিফজ কোর্স পরিচালনায় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা অথবা পদ্ধতিগত ত্রুটি।

মমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা

চাঁদপুর জেলায় শাহাতলী রেল ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে মমিনপুর গ্রামে একটি অতি উন্নতমানের হাফিজিয়া মাদ্রাসা আছে। এ মাদ্রাসায় দু'থেকে তিন বছরের মধ্যে হিফজ্ খতম হয়ে যায়। এ মাদ্রাসায় লন্ডনস্থ বাঙ্গালীদের প্রায় ৫০টি ছেলে হিফজ্ অধ্যয়ন করে। এরা লন্ডনে বসবাসকারী বহু বাঙ্গালী বিশেষ করে সিলেট জেলার বাঙ্গালীদের সন্তান। তারা মনে করেন ৩ (তিন) বছরের মধ্যে তারা হিফ্জ সম্পন্ন করতে পারলে জীবনের একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন করলেন।

হিফজ্ সম্পন্ন করার জন্য যে তিন বছর ব্যয় হয়, তা জীবনের জন্য বড় ক্ষতি নয়। আমার জানা মতে বাংলাদেশে অন্য কোথাও এমনকি ঢাকা শহরেও এমন হাফিজিয়া মাদ্রাসা নেই যাতে মাতা-পিতা লন্ডনে বসবাসকারী হয়েও বেশি সংখ্যায় তাদের সন্তানদের বাংলাদেশে হিফ্জের জন্য প্রেরণ করেন। অন্যান্য হাফিজিয়া মাদ্রাসার পরিচালক ও শিক্ষকগণ এ মাদ্রাসায় এসে মাদ্রাসাটির পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারেন।

হিফ্জ মাদ্রাসার জনপ্রিয়তা

ঐ সমস্ত হিফজ মাদ্রাসাই জনপ্রিয় যেগুলোতে ২-৩ বছরের মধ্যে হিফ্জ সম্পন্ন হয়। বয়স্ক শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায় নিজদের পছন্দমত। শিশুরা হিফ্জ মাদ্রাসায় যায় শিক্ষক বা অভিভাবকদের পছন্দ অনুযায়ী। অভিভাবক এবং শিক্ষকেরা ঐ সমস্ত মাদ্রাসাই পছন্দ করেন যারা কম সময়ে মাদ্রাসা থেকে হিফ্জ সমাধা করে বের হয়ে আসতে পারে।

হিফ্জ সংক্রান্ত দৈনিক টার্গেট

হিফ্জ সংক্রান্ত দৈনিক অন্ততঃ ১০টি আয়াত নির্ধারিত করা যেতে পারে। আল-কুরআনের মধ্যে মোট ৬২৪৭টি আয়াত আছে। সূরার মুখবন্ধ এবং বিস্‌মিল্লাহ্ যোগ করলে আয়াত সংখ্যা ৬৩৬০-৭০ এর মাঝামাঝি। কিন্তু অধিকাংশ আলেমদের মতে আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬।

প্রতিদিন ১০টি করে আয়াত মুখস্থ করা সম্ভব হলে ৬৬৭ দিনে কুরআন হিফজ হয়ে যাওয়ার কথা। দু'বছরে দিনের সংখ্যা হলো ৭৩০। তাতে দু'বছরে ছুটি পাওয়া যায় ৬৩ দিন।

তিন বছরের মধ্যে কোনো মাদ্রাসায় হিফজ সম্পন্ন করানো হলে (৬,২৪৭ আয়াত ÷১০৯৫ দিন) = ৫.৭০ আয়াত প্রতিদিন মুখস্থ হতে হবে। রুটিন এবং ব্যবস্থাপনা মজবুত থাকলে এটা কঠিন নয়।

প্রতিদিন গড়ে ১০টি আয়াত হিফ্জ এর লক্ষ্যমাত্রা নিম্নলিখিতভাবে হতে পারে –

১। শেষ রাত ৩.০০ টা থেকে ফজর পর্যন্ত, ৩ আয়াত;
২। ফজর থেকে জুহর পর্যন্ত, ৩ আয়াত;
৩। জুহর থেকে আসর পর্যন্ত, ১ আয়াত;
৪। আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত, ১ আয়াত;
৫। মাগরিব থেকে এশা বা রাত ৯ টা পর্যন্ত, ২ আয়াত।

মোট ১০ আয়াত মুখস্থ করার সময় ছাড়াও অন্যান্য কিছু কাজও থাকতে পারে। যেমন – রাত ৩টা থেকে ফজর পর্যন্ত ঘুমের কিছুটা ভাব থাকে। এ সময় লেখার কিছু কাজও দেয়া যেতে পারে। একাধারে ১০ মিনিটের বেশি নয়। ফজর থেকে জুহরের সময় একবার করা বা শিক্ষকের নিকট পড়ে শুনাবার কাজও থাকতে পারে। জুহর থেকে আসরের সময় ছাত্ররা একজন আরেকজনকে পড়ে শুনাতে পারে। আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত বাইরে হাঁটাহাটিতে থাকবে। তখন একজন আরেকজনকে তাকবার করে শুনাতে পারে।

ফজরের পর নাস্তার আগে ১ আয়াত এবং নাস্তার পর থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে দু'আয়াত মুখস্থ করার টার্গেট থাকতে পারে। সকাল সাড়ে দশটা থেকে ১২ টা পর্যন্ত তাকরার বা শুনান চলতে পারে। ১২টা থেকে সাড়ে বারটা পর্যন্ত – ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে সংলাপ করতে পারে।

নিদ্রার সময়

হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষককে অবশ্যই রাত ৯ঃ০০ টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। কারণ তাদেরকে ৩.০০ টার সময় ঘুম থেকে উঠতে হবে।

ইশরাক অথবা নাস্তার পর বিশ্রামের জন্য আধঘন্টা শুয়ে থাকার জন্য বিরতি দেয়া যেতে পারে। আধ ঘন্টা কারো সাথে কথা না বলে চোখ বন্ধ করে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করলে ১৫-২০ মিনিট ঘুম হতে পারে। তা'হলে কায়লুলার পূর্বে ঘুমের ভাব আর হবে না।

ঘুমাবার জন্য কালো বর্ণের চোখ ঢাকা কাপড় (Eye cover) সকল শিক্ষার্থীরই থাকতে হবে। কালো রঙের Eye cover দেয়া হলে আলোর প্রভাব শিক্ষার্থীদের চোখে কম পড়বে এবং ঘুম তাড়াতাড়ি আসবে।

গোসল, নামাজ ও খানার বিরতি

গোসল, নামাজ, খানা ও অন্যান্য কাজের বিরতি ১২টা থেকে ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত। দু'টা পর্যন্ত অন্তত আধঘন্টা কায়লুলা, বিশ্রাম ও নিদ্রা অবশ্যই বাধ্যতামূলক করতে হবে। কায়লুলা ১ ঘন্টা পর্যন্ত করা যায়। তা'হলে রাত ৯টা পর্যন্ত জেগে থাকা কষ্টকর হবে না।

রাতে খাবারের সময়

হাফিজিয়া মাদ্রাসায় রাতের খাবার বলে কিছু নেই। খাবার অবশ্যই মাগরিবের পূর্বে অথবা কোনো কারণে বিলম্ব হলে মাগরিবের পর আধ ঘন্টার মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। বিকেল ৫ঃ০০ টা হতে ৬ঃ০০ টার মধ্যে রাতের খাবার কাজ সমাধা করতে হবে।

ভরা পেটে নিদ্রা আসলেও ভাল নিদ্রা হয় না। তন্দ্রা হতে পারে। তন্দ্রার ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Slumber অর্থাৎ অতি পাতলা নিদ্রা। খাদ্য হজম হওয়ার পর নিদ্রা গাঢ় হয়। যারা দেরীতে রাতের খাবার খায়, প্রচুর পরিমাণ খায় বা খাবার পরই শুয়ে পড়ে তাদের চোখে ঘুম আসতে পারে, কিন্তু নিদ্রা গাঢ় হবে না। কারণ খাবার হজম হতে প্রায় ৩ ঘন্টা লাগে। খাবার হজম হওয়ার পর নিদ্রা গাঢ় হয়। দেরী করে খেয়ে শুলে ফজর নামাজ কাযা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ ২-৩ ঘন্টা সময় তন্দ্রাতেই নষ্ট হয়। তারপর গাঢ় নিদ্রা শুরু হয়।

হিফ্জকালে উচ্চমানের হাফিজিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা কোনো অবসরই পায় না। একটার পর একটা কাজ তাদের লেগেই থাকে। রাত সাড়ে নয়টা-দশ টার আগে অনেকে ঘুমাতে পারে না। তৃতীয় মানের হাফিজিয়া মাদ্রাসাগুলোতে দেখা যায় রাত ৮ টার পর শিক্ষার্থীরা কোনো পড়াশুনা করে না। হিফ্জ সম্পর্কে কোনো আলাপ আলোচনাও করে না। ৯টার পূর্বে তো তাদের পড়া বন্ধ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

যে হাফিজিয়া মাদ্রাসায় নাস্তার পর হিফ্জ শুরু হয়, তা হাফিজিয়া মাদ্রাসা হিসেবে গণ্য হতে পারে না। এটা কুরআনের আয়াত শিক্ষা মাদ্রাসা।

মূল কথা হলো – প্রোগ্রাম এমনভাবে করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা মেশিনের মতো তা অনুসরণ করে মেধা ও সময় অপচয় না করে। টাইম বেঁধে না দিলে সময়ের অপচয় বেশি হবে। টাইম বেঁধে দিলে অর্ধেক শিক্ষার্থী তা অনুসরণ করবে। বাকী শিক্ষার্থীরা একটু এদিক সেদিক করতে চাইবে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহযোগী না পেলে সময় নষ্টের সুযোগ থাকবে না।

হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতি

হাফিজিয়া মাদ্রাসা আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়নে শিক্ষিত বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আগ্রহ ও মনোযোগ অতি সীমিত। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতির তেমন কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষাপদ্ধতির উন্নয়ন সম্বন্ধে বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনা গঠনমূলক পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ অবদান প্রয়োজন।

গরীবের সন্তানেরা পল্লী অঞ্চলে হাফিজিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে থাকে। হাফিজিয়া মাদ্রাসায় চেয়ার টেবিলে বসিয়ে পড়ানো হয় না। ছাত্র শিক্ষক মেঝের উপরে সুন্নাতি তিন তরিকার এক তরিকায় বসে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ করে থাকেন।

অক্ষর বা বাক্য দেখে পড়তে হলে চোখের ব্যবহার বেশি হয়। চোখ খোলা রাখতে হয়। হিফ্জ করতে হলে, এক বাক্য বার বার, শতবার পড়তে হয়। লেখা অক্ষর বা বাক্যের দিকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হয় না। বসে থাকতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘুমের ভাব আসে। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে পড়ার ফলে ঘুমের প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

ঘুম পরিহারকল্পে শিক্ষার্থীদেরকে সম্মুখে পিছনে ছান্দিক পদ্ধতিতে হেলতে দুলতে হয়। তাতে শরীরের রক্তচলাচল বেশি থাকে। অলসতা দূর হয়। অক্সিজেন গ্রহণ বেশি হয়। হামি আসে কম। কোনো হাফিজিয়া মাদ্রাসায় বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী লাইন ধরে বসে সম্মুখে পিছনে শরীর দুলিয়ে পড়াকালে নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা হয়।

হিফ্জ করার পদ্ধতি

শিশুরা বড়দের থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করে। ছন্দ ও সুরের সাথে শিশুদেরকে কোনো কিছু বার বার বললে এবং শিশুরা বয়স্কদের অনুসরণ করলে স্মরন শক্তিতে প্রবল শিশুদের মুখস্থ হয়ে যায়।

বর্তমানে কুরআনের সূরার ক্যাসেট বের হয়েছে। ক্যাসেট শুনেও সুরা মুখস্থ করা যায়। আধুনিক পদ্ধতির সুবিধা কুরআন হিফ্জের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে।

হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকের দায়িত্ব

হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হিফ্জের স্তর সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী কোন্ সূরার কত আয়াত পর্যন্ত হিফ্জ করতে পেরেছে তা জানতে হবে। যতটুকু পর্যন্ত হিফ্জ হয়েছে তার মধ্যে কোন্ কোন্ আয়াতগুলো শিক্ষার্থীর ছুটে যায় তা শিক্ষকের নোট বুকে লিখে রাখতে হবে। ছুটে যাওয়া আয়াতগুলো আগে পরের আয়াতের সাথে শত শত বার পড়িয়ে নিতে হবে। একটি আয়াত ৫০০ বার পড়িয়ে নিলে তা পূর্ণ হিফ্জ হয়ে যাবে।

হিফ্জ শিক্ষকের একনিষ্ঠতা

হিফ্জ মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে অবশ্যই একনিষ্ঠ হতে হবে। যে হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকেরা হিফ্জ শিক্ষাদান ছাড়াও অন্যান্য কাজে নিরত থাকেন, সে মাদ্রাসায় হিফজ বিলম্বিত হবে। অনেকের আদৌ হবে না।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা শিক্ষক থেকেও কনসালটেন্সি, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেন। কিন্তু হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে ইমামতি ছাড়া অন্য কিছু করা সঙ্গত নয়। তারা মিলাদ মাহ্ফিলে বা ওয়াজ মাহফিলে, ফাতিহাখানি ও দু'য়া দুরূদের অনুষ্ঠানে যেতে পারেন না।

যদি কোনো হিফ্জ শিক্ষক মাঝে মাঝে ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন, অবসর সময়ে তার চিন্তা হবে মাহফিলে কী কী যুক্তি তিনি পেশ করবেন, কোন্ আয়াত পাঠ করবেন, কোন্ হাদীস উল্লেখ করবেন, কোন পুস্তকের উদ্ধৃতি দেবেন ইত্যাদি। তার মনে হিফ্জ্কারী ছাত্রের কোন্ আয়াত ছুটে যায়, কোথায় ভুল হয় – সে খেয়াল থাকে না। যে দশজন শিক্ষার্থী কোনো একজন হাফিজের দায়িত্বে আছেন, কোন্ সূরার কোন আয়াতে শিক্ষার্থী ভুল করে বা একেবারে ভুলে যায় – তা শিক্ষকের নখদর্পণে থাকতে হবে।

তাকবার করার বা পড়া লেখার সময় শিক্ষকদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে শিক্ষার্থীর দুর্বল দিকটির দিকে। যে আয়াত শিক্ষার্থীর ছুটে যায় সে আয়াতের কাছাকাছি আসলেই শিক্ষকের সতর্ক ও মনোযোগী হতে হবে। ঐ আয়াতকে মাঝে রেখে আগের কিছু কিছু আয়াত ছেড়ে বা বাড়িয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীকে এমনভাবে আয়াত তাকরার বা শুনানী করবেন যাতে শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে দুর্বল আয়াতগুলো ভালোভাবে গ্রথিত হয়ে যায়।

হাফিজিয়া শিক্ষকের জরুরাত পূর্ণ করার দায়িত্ব

হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষককে একনিষ্ঠ হতে হলে তার প্রয়োজনের দিকেও ব্যবস্থাপকদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ তার বেতন অন্যান্য শিক্ষকদের থেকে বেশি হতে হবে। ১৯৯৯ সনে পল্লী অঞ্চলের এমন কোনো হাফিজিয়া শিক্ষকের কথা আমি শুনিনি যার বেতন ২৫০০ টাকা পর্যন্ত আছে। এ বেতন না দিলে শিক্ষককে পরিবার প্রতিপালনের জন্য নিজের জমাজমির আয় বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আয় বৃদ্ধির নয়া পথ দেখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের একনিষ্ঠতা

শিশুদের পক্ষে কোনো শিক্ষাই একাগ্রচিত্তে করা সম্ভব নয়। এক জায়গায় তারা স্থির হয়ে বসে থাকতে এবং এক বিষয়ে বেশি ক্ষণ মনোযোগ নিবিষ্ট করতে পারে না। তাদের চঞ্চল মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায়।

হিফ্জের প্রতি একনিষ্ঠ হতে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। হিফজের প্রতি একনিষ্ঠতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে।

তাসবীহ্রূপে ব্যবহৃত আয়াতসমূহ

যে আয়াতসমূহ তাসবীহ্ এবং জিকিরের আমলে ব্যবহৃত হয় সে আয়াতগুলো সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সচেতন রাখবেন।

মুনাজাতের আয়াতসমূহ

হাফিজের বহুল ব্যবহৃত আয়াত হলো মুনাজাতের আয়াতসমূহ। এগুলোতে সাধারণতঃ রাব্বি, রাব্বানা, আল্লাহুম্মা ইত্যাদি শব্দ আয়াতের প্রথমে বা অন্য কোনো স্তরে থাকে। এ আয়াতগুলো সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ হিফ্জ হওয়ার পূর্বেই মুখস্থ করিয়ে নিতে হবে এবং শিক্ষার্থী হাফিজ দ্বারা যত বেশি সম্ভব মুনাজাত করাতে হবে।

শেফা বা চিকিৎসা সম্পর্কিত আয়াত

আল-কুরআন হলো মানব জাতির জন্যে হেদায়েত, পথনির্দেশক, নূর, ফরজ হুকুম ও নিষেধ ইত্যাদি। তদুপরি আল-কুরআনের আয়াতের একটা বৈশিষ্ট হলো বান্দার প্রতি রহমত। এতে রয়েছে বিপদে, রোগে আরোগ্য এবং শেফা সংক্রান্ত আয়াত। মুসল্লীরা ইমাম সাহেবকে কেউ অসুস্থ আছে জানিয়ে তার জন্যে দু'য়া করতে বলেন। রোগ মুক্তির জন্যে মুনাজাতে আল্লাহর নবীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত আয়াতসমূহ যেমন - হযরত আদম (আঃ), নূহ্ (আঃ), আইয়ুব (আঃ), কর্তৃক ব্যবহৃত আয়াতসমূহ প্রাসঙ্গিক। এ আয়াতসমূহ হিফ্জ শেষ হওয়ার পূর্বেই মুখস্থ করিয়ে নিতে হবে।

পারস্পরিক উপদেশ

শিক্ষার্থীরা একজন আরেকজনকে উপদেশ দিতে ভালবাসে। উপদেশ দেয়া কালে কুরআনুল কারীমের আয়াত ব্যবহারে শিশুদেরকে উৎসাহিত করা যায়। শিশু, বৃদ্ধ, কিশোর, মধ্য বয়সী সকলের জন্যই অসুস্থতা স্বাভাবিক। কী অসুখ হলে শেফা হিসেবে কী আয়াত পাঠ করতে হবে, তা শিশুকাল থেকে শিক্ষা দিতে হবে। চোখের অসুখ দেখলেই পাঠ করতে হবে 'ফা কাশাফনা আনকা গিতা' আকা ফা বাসারুকা ইয়াওমা হাদিদঃ। এছাড়াও অসুখের অন্যান্য দু'য়াগুলো শিশুদেরকে মুখস্থ করিয়ে নেয়া হলে তারা অসুস্থ লোক দেখলেই প্রাসঙ্গিক আয়াত এবং তদুপরি দু'য়া দুরূদ পাঠ করে নেয়ার অভ্যাস করিয়ে নেয়া যেতে পারে।

হিফ্জ সংক্রান্ত নাটক

শিক্ষার্থীদের হিফ্জের জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য কিছু সংলাপ শিক্ষক লিখে রাখবেন। এ সংলাপের উদ্দেশ্য হবে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে যে ধরনের প্রশ্ন করেন, তদ্রূপ প্রশ্ন একজন শিক্ষার্থী আরেকজন শিক্ষার্থীকে করবেন। জবাব সঠিক হলে মারহাবা দেবেন এবং জবাব সঠিক না হলে তা সংশোধন করে দেবেন।

হিফ্জ শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। তাদের আলাপ আলোচনায় হিফ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করার সচেতন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

হিফ্জ শিক্ষার্থীরা অবসর সময়ে যে যে কথা বলে – সে সব সংলাপ নিয়ে নাটক লিখা যেতে পারে। এ নাটকে হিফ্জ বহির্ভূত কথা থাকবে। তবে, হিফ্জ সংক্রান্ত কথা যত বেশি সম্ভব ঢুকিয়ে দিতে হবে।

এ জাতীয় বইয়ের মাধ্যমে ছাত্রদের আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করা হবে। আলোচনা হতে পারে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে অথবা দু'জন ছাত্রের মধ্যে অথবা দু'শিক্ষকের মধ্যে।

প্রথম ১০টি সূরা যাদের মুখস্থ হয়েছে তাদের একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন – সূরা মায়েদার ৩ রুকু থেকে পড়ে শুনাও। সূরা মায়েদার ৩৫ আয়াত থেকে পড়ে শুনাও। সূরা আল ইমরানের ১০২ আয়াত কি তোমার মুখস্থ আছে ? থাকলে পড়ে শুনাও।

সূরা বাকারার ৪০ রুকু থেকে পড়ে শুনাও। সূরা বাকারার ৮৪ আয়াত থেকে পড়ে শুনাও। এ ধরনের প্রশ্ন একজন ছাত্র আরেক জন ছাত্রকে করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

হিফ্জ তাকরার

আল-কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ মুখস্থ করা একটু জটিল। এগুলোর উপর শিক্ষার্থী হাফেজগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করলে তাদের দুর্বলতা দূরীভূত হতে পারে। জটিল

আয়াতগুলোর তালিকা নিম্নরূপ ঃ

(১) সূরা আরাফ ঃ ৫৫-৭৩, (২) সূরা আহযাবঃ ৬৩ সূরার শেষ পর্যন্ত, (৩) সূরা ইয়াসিন ঃ ৩৬-৭১, (৪) সূরা হুদ ঃ ৭-২০, (৫) সূরা রাদ ঃ ১৯-৩০, (৬) সূরা রুম ঃ ১৬-২৮, (৭) সূরা যুমার ঃ ১১-৩০, (৮) সূরা দুখান ঃ ১৯-৩৫, (৯) সূরা দাহার, (১০) মূলক।

হিফজের তিলাওয়াতের বিভিন্ন ধরন বা পদ্ধতি আছে। একজন শিক্ষার্থী ক রুকু বিশেষ পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করে অন্য শিক্ষার্থীকে বলবেন – ২৪ নম্বর রুকু থেকে ভিন্ন ষ্টাইলে তিলাওয়াত শুরু করো। না পারলে বলে দেবে। যখন একজন শিক্ষার্থী তিলাওয়াত করে যায় অন্যরা মনোযোগ সহকারে হয়ে তিলাওয়াত শুনবে। হিফ্জ সংক্রান্ত সংলাপ তৈরী করার উদ্দেশ্য হলো অভিনয় নয় বরং শিক্ষার্থীদের নিজেদের অপ্রয়োজনীয় সংলাপকে সংযত করা এবং হিফ্জের দিকে প্রবাহিত করা।

হিফ্জ সংক্রান্ত সংলাপ শুরু করার এমন সময় বেছে নিতে হবে যখন বাধ্যতামূলক হিফ্জের ক্লাস শেষ হওয়ার পর যখন শিক্ষার্থীরা গল্প ও আড্ডা করে সময় নষ্ট করে।

শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার মনোভাব

ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্পিরিট তৈরী করতে হবে। প্রশ্ন করে একজন আরেকজনকে পরাজিত করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাতে তারা নিজেরাই নিজেদের দুর্বলতা ধরতে পারবে। এ ধরনের তাকরার শুধুমাত্র বিশেষ ক্লাসে নয়, সব সময়েই হতে পারে।

প্রথমে কিছু প্রশ্নের ছক তৈরী করে দিতে হবে যার উপরে তারা প্রশ্ন করবে। ছকের প্রশ্নগুলো মুখস্থ হয়ে গেলে তারা নিজেরাই প্রশ্ন তৈরী করতে পারবে।

শিক্ষক নিকটে বসে থেকে দু'তিন জন ছাত্রের গ্রুপ করে দিতে পারেন। তাদেরকে বলতে হবে তোমরা একেক জন দশটি করে প্রশ্ন কর এবং এর উত্তর সঠিক হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করে জানাও।

দু'বছরের মধ্যে যদি শিক্ষার্থীকে হিফ্জ সম্পন্ন করতে হয়, তবে এর প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে হবে। তারা খাওয়ার পর নিজের প্লেট টিফিন কেরিয়ার ধৌত করে সময় নষ্ট করতে পারবে না। নিজের জামা-কাপড় নিজেরা ধুতে পারবে না। ওস্তাদের ফাই ফরমায়েস খাটতে এবং খেদমত করতে পারবে না।

তারা ক্যাডেট স্কুলে প্রশিক্ষণের জন্যে যেভাবে জামা-কাপড়, জুতা ঠিক করে রাখে – তা করবে। কিন্তু কাজের লোকের অভাবের জন্যে যে কাজ নিজে করতে হয় তা করতে পারবে না। নিজের নাস্তা নিজে তৈরী করতে দেয়া হবে না।

কোনো কিছু ক্রয়ের জন্যে বাজারে যেতে পারবে না। বিনোদনের জন্যে গ্রুপে গ্রুপে বাজারে যেতে পারবে। কিন্তু কাজের জন্যে নয়। তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাহিবা মাত্রই হাতের কাছে পাবে। অভিভাবক সঙ্গতিপন্ন হলে এ ধরনের সেবা – মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে পারে যেমন হয়ে থাকে বোর্ডিং স্কুল সমূহে। দু'বছরের মধ্যে হিফজ সম্পন্ন করানো সম্ভব হলে বহু দ্বীনদার বিত্তশালী তাদের সন্তানদের হাফিজ বানাতে আগ্রহী হবেন, ইন্‌শাআল্লাহ্। চাঁদপুর জেলার শাহাতলী ষ্টেশনের দক্ষিণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মমিনপুর গ্রামে যদি এ ধরনের একটি মাদ্রাসা গড়ে উঠতে পারে; ঢাকার মতো বড়ো শহরে কেন হবে না ?

অনেক বিত্তবান অথবা শিক্ষিত/উচ্চ শিক্ষিত ধর্মভীরু ও ধর্মপ্রাণ অভিভাবকেরা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাদের সন্তানকে মাদ্রাসায় ভর্তি করাতে চায়না। এর অন্যতম কারণ হলো, ছাত্রদের দিয়ে চাঁদা উঠানো। এটা অনেকেই ছাত্রদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বলে মনে করে। এর কুপ্রভাব ছাত্র জীবন শেষে কর্মজীবনেও মাদ্রাসায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মাঝে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ জন্যে অনেক অভিভাবকই সন্তানকে মাদ্রাসায় পড়াতে নিরুৎসাহিত বোধ করেন। ভিক্ষাবৃত্তির হীন মানসিকতা ইসলাম ধর্মে অত্যন্ত ঘৃণিত। অথচ আমাদের দেশে মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে এই হীন কাজটিই অত্যন্ত উৎসাহের সাথে করা হচ্ছে।

এ জন্যে মূলতঃ দায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ আচরন। বৃটিশ আমলে প্রণীত মাদ্রাসা শিক্ষা আইন। দু'দুবার স্বাধীনতা লাভ করেও আজও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ে গঠনমূলক সংস্কার হয়নি। শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশে আজো মাদ্রাসা শিক্ষাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষায় সরকার পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ কবলেও মাদ্রাসা শিক্ষায় নামকাওয়াস্তে অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

হাফিজিয়া মাদ্রাসার সমস্যা

হাফিজিয়া শিক্ষার্থী

হাফিজিয়া মাদ্রাসা দান অনুদানের উপর নির্ভরশীল। শহরের হাফিজিয়া মাদ্রাসাসমূহ বিদেশ থেকেও সাহায্য পেয়ে থাকে। বহু কওমী, হাফিজিয়া ও আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী লিল্লাহ্ বোর্ডিং এ থাকে। মাদ্রাসায় হিফ্জ কোর্স থাকলে অনুদান বেশি পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ গরীবের সন্তানেরাই হাফিজিয়া মাদ্রাসায় বেশি লেখা পড়া করে। তাবলীগ প্রভাবিত বিত্তশালী ব্যবসায়ী ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তারাও আজকাল তাদের সন্তানদের হাফিজ বানাতে চান। কিন্তু উত্তম পরিবেশ পান না। আবার এমনও দেখা যায় অনেক বিত্তশালীদের প্রতিভাবান ছেলেটিকে ইহলৌকিক কল্যানের জন্য ইংরাজী স্কুল এবং হাবাগোবা রোগাগ্রস্থ, মানসিক প্রতিবন্ধি অথবা কম মেধাবান সন্তানটিকে পারলৌকিক কল্যানের আশায় মাদ্রাসায় পাঠান।

অনেক ধর্মপ্রাণ বিত্তশালী, উচ্চবিত্তশালী তাদের কন্যাদেরকেও হাফিজ বানাতে চান। মেয়েদের জন্য হাফিজিয়া মাদ্রাসা পাওয়া আরো কষ্টকর। যদিও বাসায় প্রাইভেট পড়িয়ে সন্তানদের হিফ্জ পড়ানো যায় কিন্তু আবাসিক মাদ্রাসায় হিফজ্ সহজে এবং দ্রুত সম্পন্ন হয়। একজনকে পড়তে দেখলে অন্যদের পড়ার আগ্রহ দেখা দেয়।

বাসা বা বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের কেউ গল্পের বই পড়বে, কেউ আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আড্ডা দেবে, কেউ টেলিভিশন দেখবে। এরূপ পরিবেশে কোনো শিশুকে হিফজ্ এর জন্য একটি কক্ষে আটকিয়ে রাখা খুবই কষ্টকর। আবাসিক হিফ্জ মাদ্রাসায় হিফ্জকরণ স্বল্প সময়ে সম্পন্ন হয়।

যে সমস্ত হিফ্জ শিক্ষার্থী লিল্লাহ্ বোর্ডিং এর উপর নির্ভরশীল হন তারা যেন স্বনির্ভর হতে পারে সেদিকেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকা উচিৎ। অনেক মাদ্রাসায় ফার্ণিচার তৈরী, শিক্ষা কোর্স, বাঁশ বেতের কারুকাজ, সেলাই মেশিন ব্যবহার প্রশিক্ষণ কোর্স থাকে।

বাঁশ বেতের সামগ্রী তৈরীর কারখানায় বা অনুরূপ পেশায় কাজ করে কর্মচারীরা মধ্যবিত্ত পরিবারের মান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে না। কোনো ব্যক্তি পিয়নের চাকুরী পেলে দরজীর দোকানের কর্মচারী হতে চাইবেন না। যদি আমরা আশ করি যে হিফ্জ শিক্ষার পর শিক্ষার্থী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মান অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন, তাহলেই এ সমস্ত কারিগরী শিল্পে কর্ম সংস্থানের একটি ব্যবস্থা হতে পারে।

যারা হাফিজ তারা মেধাবী। তাদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে যারা মুখস্থ করতে পারে, সাধারণত তারাই ভালো রেজাল্ট করে। বুদ্ধি, যুক্তিশীলতা, মেধা ও প্রজ্ঞার বিকাশ আমাদের দেশে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ততটুকু দেখা যায় না।

হাফিজদের হস্তাক্ষর

হাফিজের হস্তাক্ষর সাধারণত তুলনামূলকভাবে খারাপ হয়ে থাকে। হাফেজী মাদ্রাসায় লেখার উপর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম দেয়া হয়। মুখস্থ করার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিশু বয়সে লেখার অভ্যাস ভালো ভাবে গড়ে তোলা না হলে হাতের লেখা ভাল হয় না। বলা হয় যে, বয়স বেশি হলে শিশু কিশোরদের হাতের আঙ্গুল শক্ত হয়ে যায়।

এ সমস্যা সমাধান হতে পারে যদি হাফিজিয়া মাদ্রাসায় শিশু হাফিজদের হাতের লেখার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কোনো হাফিজিয়া মাদ্রাসায় এরূপ গুরুত্ব প্রদান সম্পর্কে অভিভাবকদেরকেও সচেতন থাকতে হবে। শুধু হাফিজিয়া মাদ্রাসা নয়, সকল শিশু শিক্ষা নিকেতনে শিশুদের হাতের লেখার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বয়সের অসামঞ্জস্যতা

হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রদের কুরআন হিফ্জ সাধারণত সম্পন্ন হয় ১২-১৫ বছরের মধ্যে। ৯ বছর বয়সেও কোনো কোনো হাফিজ কুরআন হিফ্জ সম্পন্ন করতে পারে। তবে এরূপ উদাহরণ বিরল। ১২-১৫ বছর বয়সে অধিকাংশ ছাত্র হিফ্জ সম্পন্ন করার পর মাদ্রাসা বা স্কুল-কলেজ লাইনে লেখাপড়া করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্লাসের নিয়মিত ছাত্রদের বয়স অপেক্ষা হিফ্জ সম্পন্নকারী ছাত্রদের বয়স ৩-৫ বছর বেশি হয়। যাদের শরীর লম্বা তাদের অসুবিধা হয় অধিক। একই ক্লাসের ক্ষুদ্রকায় ছাত্ররা তাদের ঠাট্টা করে বুড়া মিয়া বলে। বুড়া মিয়ারা ভুল করলে অন্যরা হাসাহাসি করে।

এ সমস্যা সমাধানের একটি উপায় হতে পারে হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের পরবর্তী শিক্ষার জন্য পৃথক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা অথবা কোনো কোনো মাদ্রাসায় হাফিজিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষিত বা ড্রপ আউটদের জন্য পৃথক ক্লাস করা।

যেহেতু এরা হিফ্জ পড়তে গিয়ে ৩-৫ বছর ব্যয় করেছে তাই তাদের প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, শিক্ষকদের এবং মাদ্রাসা পৃষ্ঠপোষকদের অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। প্রতি বিভাগে একটি করে হাফিজিয়া মাদ্রাসায় পড়া ছাত্রদের জন্য বিশেষ ধরনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে সমস্যাটির কিছুটা সমাধান হয়।

হিফ্জ পরবর্তী শিক্ষাক্রম

একটি বালক অথবা বালিকা ১১-১৩ বছরের মধ্যে হিফ্জ সম্পন্ন করার পর কোন্ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে যাবে ? স্কুলে না মাদ্রাসায় ? বর্তমানে মুসলিম ছেলে মেয়েদের শিক্ষার মাধ্যম হলো ৫টি। যথা- (১) মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসক্রমে স্কুলে পাঠ, (২) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস অনুসারে আলীয়া টাইপের ইবতেদায়ী ও দাখিল, আলিম মাদ্রাসার শিক্ষা গ্রহণ, (৩) দেওবন্দী পাঠ্যক্রম অনুসারে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম, (৪) কিন্ডারগার্টেন স্কুলের 'A' Level, 'O' Level সিলেবাস পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করা, (৫) বিভিন্ন সিলেবাস হতে কিছু কিছু নিয়ে মিশ্র সিলেবাস নিয়ে গঠিত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাক্রম।

হাফিজিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে কোন্ ছাত্র কোথায় যাবে – তা নির্ভর করবে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিশেষ করে অভিভাবকদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও শিশুর ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার উপর।

কওমী মাদ্রাসা এখনো উর্দু ও ফার্সীর প্রভাব থাকার কারণে বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষার আনুপাতিক গুরুত্ব কম।

হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজীর উপর গুরুত্ব

ইংরেজী ভাষার উপর দখল থাকলে বেসরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাওয়া সহজ হয়। হাফিজিয়া মাদ্রাসাসমূহে ছাত্রদের বাঁশ-বেত, সূচি-শিল্প প্রশিক্ষণ অপেক্ষা ইংরেজী ভাষা শিক্ষার দিকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। ইংরেজী শিক্ষা সময় সাপেক্ষ। অল্প সময়ে আয়ত্ব করা যেতে পারে এমন কারিগরী বিদ্যা হলো টাইপ রাইটিং, ষ্টানোগ্রাফি এবং বর্তমানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য খুব বেশি বিদ্যার দরকার হয়না। মধ্য মানের মেধা থাকলেই কম্পিউটার চাহিদা সম্পন্ন পেশায় চাকুরী পাওয়া সহজ হয়। হাফিজিয়া মাদ্রাসায় যারা লেখা পড়া করবেন, তাদের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষাটা আমার মতে খুবই জরুরী।

হাফিজিয়া মাদ্রাসার আর্থিক সমস্যা

বাংলাদেশে হাজার হাজার হাফিজিয়া মাদ্রাসা আছে। কত হাজার হাফিজিয়া মাদ্রাসা বাংলাদেশে আছে এর সঠিক জরিপ কখনও হয়নি। সমাজ কল্যাণ পরিদপ্তর থেকে এতিমখানা এবং শিশু সদনের জন্য মাথা পিছু ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বা আর্থিক মঞ্জুরী দেয়া হয়। কতগুলো হাফিজিয়া মাদ্রাসার জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বা আর্থিক মঞ্জুরী দেয়া হয় – এর পরিসংখ্যান সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরে আছে। হাফিজিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু তথ্য সমাজ কল্যাণ পরিদপ্তর হতে পাওয়া যেতে পারে।

হাফিজিয়া মাদ্রাসাগুলো জনগণের অনুদানে পরিচালিত হয়। জনগণ পরকালের নাজাত এবং সওয়াবের নিয়তে অর্থ দান করে। এতিমখানার জন্য অনুদান পুণ্যের কাজ। এতিমখানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার সমন্বয় হলে অনুদানে সওয়াব হবে বহুগুণ। দ্বীনদার ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় হাফিজিয়া মাদ্রাসাসমূহ চলছে।

হাফিজিয়া মাদ্রাসার সম্পত্তি

শহরের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব আয়ের উপর নির্ভর করে। ঢাকা শহরের প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে প্রাইভেট অনুদান খুব কমই আসে। অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নামে একটি স্কুলের শিক্ষার্থী পরিবহন সংখ্যা ৬০ (ষাট) এর উপরে। এটা বিদেশীদের পরিচালিত কোনো সংস্থা নয়। খাঁটি বাঙালীরাই এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন। হাফিজিয়া মাদ্রসাসমূহ সাধারণত দান, অনুদান, যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি দ্বারা সংগৃহীত অর্থে আনুষঙ্গিক খরচ নির্বাহ করে থাকে।

হাফিজিয়া মাদ্রাসাগুলোকে নিজস্ব স্থায়ী আয়ের উৎস সন্ধান করতে হবে। এর একটি হলো পরিবহন ব্যবসা। হাফিজিয়া মাদ্রাসার মালিকানায় কয়েকটি রিক্সা, বেবীট্যাক্সী, মাইক্রোবাস, বাস ইত্যাদি থাকতে পারে।

মাদ্রাসা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ছাত্র শিক্ষক সকলকে মাদ্রাসার সম্পত্তি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। এগুলো যদি ব্যক্তি বিশেষের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং অন্যেরা এ সম্পর্কে অবহিত না হন, তা হলে এসব সম্পত্তি প্রভাবশালীদের দ্বারা আত্মসাৎ, বেহাত, চুরি, অযত্নের কারণে কারণে নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পরিবহণগুলোতে “মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার সম্পত্তি কদমরাসূল এতিমখানার সম্পত্তি' ইত্যাদি লিখা থাকলে এগুলো ব্যবহারে যাত্রীদের আগ্রহ হবে এবং বেহাত হওয়ার সম্ভাবনাও হ্রাস পেতে পারে।

শুক্রবারে পরিবহণগুলো মুসল্লিদেরকে দেখানো যেতে পারে এবং এগুলোর আয়ে যেন বরকত হয় এজন্য মুসল্লিদের দু'য়া কামনা করা যেতে পারে। হাফিজিয়া মাদ্রাসার বয়স্ক ছাত্ররা এ পরিবহণগুলো ব্যবহার করতে পারে।

আর্থিক স্বনির্ভরতা

কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া থানার পোকখালী ইউনিয়নের পোকখালী কওমী মাদ্রাসা, আর্থিক স্বনির্ভরতার একটি অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা সমূদ্রে মাছ ধরার নয়টি নিজস্ব নৌকা মাদ্রাসা ফান্ড থেকে ক্রয় করেছে। মাদ্রাসার নিজস্ব আয় থেকেই এ ধরনের মাদ্রাসাটি চলতে পারে।

যে সমস্ত মাদ্রাসা সমুদ্রের নিকটবর্তী নয়, তারা ফিসিং ট্রলার দিয়ে মাছ ধরার ব্যবসা হয়তো করতে পারবে না। কিন্তু বাস, ট্রাক, কোষ্টার, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, রিক্সা ইত্যাদি পরিবহণ ব্যবসা করা বহু মাদ্রাসার পক্ষেই সম্ভব।

শিশুদের শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনীতা

শিশুদের শারীরিক পরিশ্রম নিয়মিতভাবে না করালে তাদের দেহ শক্ত, সামর্থ হয়ে গড়ে উঠে না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, আর্থিক দীনতা ও পুষ্টিহীনতার কারণে অধিকাংশ মাদ্রাসায় শিক্ষিতগণ শ্রেণীগতভাবে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাঁটায় ছিলেন সবচেয়ে দ্রুতগামী। তাঁর সঙ্গে চলার সময় সাহাবীদেরকে দৌড়াতে হতো। এমনও বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাঁটার সময় মনে হতো গাছপালা বেগবান – যেমন আমাদের মনে হয় রেলগাড়ীতে চলার সময়। এতো দ্রুতগামী ছিলেন আমাদের পেয়ারা নবী (সঃ)। অথচ তাঁর ওয়ারিস উলামায়ে-কিরাম এমনভাবে পথ চলেন যাতে মাটি ব্যথা না পায়। অনেকের হাঁটার গতি দেখে মনে হয় একজন গর্ভবতী মহিলা হাঁটছেন। যেন দ্রুত হাঁটলে গর্ভপাত হতে পারে।

মাদ্রাসায় শাক-সবজী চাষ

শাক-সবজী চাষের জন্য খুব বেশি জায়গার দরকার হয়না। লাউ গাছের জন্য কতটুকু জায়গার দরকার হয় ? লাউ গাছ ছাদের উপর তুলে দেয়া যায়। একটি বাঁশের জিঙলা আশ্রয় করে একাধিক সীম গাছ বেড়ে উঠতে পারে। ক্ষুদ্র শুকনা ডালের সাথে একটি বা দু'টি সীমের বীচি পুঁতে দেয়া যায়। মাদ্রাসার আশেপাশে খালি জায়গায় মাশকলাইয়ের ডাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে মাশকলাই উৎপাদন হয়। যেখানে বেশি জায়গা পাওয়া যায়, সেখানে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজী উৎপাদন করা সম্ভব।

পল্লী অঞ্চলে বহু পুকুর থাকে। মাদ্রাসার সংলগ্ন পুকুরটি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ উন্নততর পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য ইজারা নিতে পারেন। বহু মাদ্রাসায় টিউবওয়েল থাকে। টিউবওয়েলের বাড়তি পানির জন্য ৪-৫ হাত আকারের গর্ত করে রাখা যায়। এতে আফ্রিকান মাগুরের চাষ হতে পারে। উজুর জন্য ব্যবহৃত পানি মৎস্য চাষের জন্য পুনরায় ব্যবহৃত হতে পারে।

উৎপাদনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে উৎপাদনের সুবিধা কোনো না কোনো ভাবে হয়ে যায়। পুকুর পাড়ে কুমড়া, লাউ, সীম চাষের জন্য অতি উত্তম জায়গা। কুমড়া বা লাউয়ের মাচা পুকুরের দিকে লম্বা করে দেয়া যায়। মাচার নিচে ছায়া পড়লে মৎস্য চাষের সুবিধা হয়। কারণ ছোট্ট পুকুরের পানি গরম হয়ে যায়।

খেলার মাঠের প্রান্তে লতা জাতীয় শাক-সবজী উৎপাদিত হতে পারে। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে শাক-সব্জী উৎপাদনে প্রতিযোগিতা হতে পারে। মাদ্রাসা সাধারণত

মসজিদ সংলগ্ন হয়। মসজিদের চারিপাশে বেশ কিছু খালি জায়গা থাকে। সেখানেও লতানো শাক-সব্জী, মাচা তৈরী করে রাখা যায়। বিশেষ ধরনের কচু গাছ সর্বত্র জন্মে। কচু এবং কচুর লতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহ জাতীয় উপাদান থাকে। উঁচু মাঠের চার পাশে কচু গাছ লাগিয়ে দেয়া যায়। মাদ্রাসায় অবশ্যই দা, কোদাল, খন্তা ইত্যাদি রাখতে হবে। এগুলো শাক-সব্জী চাষে কাজে লাগবে।

শাক-সব্জী চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশ মহল্লা থেকে সংগ্রহ করা যায়। এ সব চাষের জন্য মহল্লাবাসীদের সক্রিয় সাহায্য কামনা করা যেতে পারে। এতে তাদের সাহায্য না পাওয়া গেলেও সমর্থন ও সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি পায়।

হাফিজিয়া মাদ্রাসায় হাঁস, মুরগী, ছাগল, পায়রা, প্রতিপালন

হাফিজিয়া মাদ্রাসার বিল্ডিং এর ছাদের সাথে পায়রার বাসা লটকিয়ে রাখা যায়। পায়রা প্রতিপালন কোনো ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার নয়।

শিশুরা হাঁস, মুরগী, পশু, পাখি, পায়রা, ছাগল পছন্দ করে। এগুলো প্রতিপালনে তাদের মানসিক বিকাশ উন্নততর হয়। হাঁস, মুরগী, ছাগল প্রতিপালনে মাদ্রাসার আয় বৃদ্ধি পায়।, হাফিজদের খাদ্যমান উন্নত হয়।

বালিকা হাফিজিয়া মাদ্রাসা

কয়েকযুগ আগেও বাংলাদেশে মহিলা বা বালিকা হাফিজিয়া মাদ্রাসা তেমন দেখা যেত না। সত্তরের দশক থেকে মহিলা মাদ্রাসা এবং বালিকা হাফিজিয়া মাদ্রাসা স্থাপন প্রক্রিয়া জোরদার হচ্ছে। বহু সংখ্যক মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। সাথে সাথে বালিকা হাফিজিয়া মাদ্রাসাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষাঙ্গণে ইয়াহুদী, নাছারা, কুফুরী, মুশরেকী পরিবেশ প্রবর্তনের ফলে শিক্ষাঙ্গণ আজ প্রেমাঙ্গণে পরিণত হচ্ছে। নাবালক, নাবালিকাদের মধ্যেও বালক বন্ধু, বালিকা বান্ধবী সংস্কৃতি চালু হচ্ছে। মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ এক সঙ্গে ডিস্ এন্টিনা সংযুক্ত টেলিভিশন দেখার ফলে চক্ষু লজ্জা যতটুকু ছিল – এখন আর তা নেই।

বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। ছেলেদের চাকুরী পাওয়াই কষ্টকর। মেয়েদের চাকুরী পাওয়া আরও কষ্টকর। একটি ছেলে চাকুরী পেলে আরেকটি মেয়ে ও সন্তান-সন্ততির জীবিকার ব্যবস্থা হয়। মেয়েরা চাকুরী পেলে সংসারের আয় বৃদ্ধি হয়। চাকুরিজীবী কোনো মহিলা বেকার স্বামী পছন্দ করেন না।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এম.এ. বা এম.এস.সি পাশ ছেলেরা অভিজাত শ্রেণীর এস.এস.সি. পাশ মেয়েও সুন্দুরী হলে বধূ হিসাবে বরণ করে নেয়। সারা জীবন সন্তানের ব্যয়ভার বহন করে। কিন্তু কোনো মহিলা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা এম.এস.সি, বা এম.এ. পাশ মহিলা চাকুরিজীবী সাধারণতঃ ভদ্রঘরের সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, দ্বীনদার, এস.এস.সি. পাশ বেকার যুবককে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে বেতনের টাকা তাঁর হাতে তুলে দিবেন না। এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা আপেক্ষিক। মোহভঙ্গ হলে বেকার স্বামীকে পালন দূরে থাক বিবাহ বিচ্ছেদে পরিণত হয়।

এম.এ., এম.এস.সি পাশ বহু মেয়ে চাকুরী না করেও গৃহিনী হিসাবে ঘর সংসার দেখাশুনা করে। বহু পিতামাতা চান না যে তাদের কন্যা বাইরে চাকুরী করুক অথবা স্বামীর সংসারে আর্থিক ঘাটতি পূরণ করুক। বহু স্বামীও চায়না যে, তার স্ত্রী অফিস, আদালত ও ক্যাফিটেরিয়াতে চাকুরী। অথবা পুরুষ-সহকর্মীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করুক। শুধু স্বামী কেন, বহু নাবালক ছেলেও অন্য পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে অবাধে স্বীয় মাতার ঘনিষ্ঠতা সহ্য করতে পারেনা।

ইংরেজী অক্ষর ভি মার্কা ব্লাউজ পরা অর্ধ উলঙ্গ নারীবক্ষ অধিকাংশ পুরুষ কুদৃষ্টিতে অবলোকন করে। স্বীয় স্ত্রী বা মায়ের বক্ষ সৌন্দর্য পরপুরুষের কুদৃষ্টিতে তাকানো স্বামী তো বটেই পুত্রও সহ্য করেনা।

মেয়েদের যদি চাকুরী না করে ঘর সংসার করতে হয়, তাহলে বি.এ., এম.এ পাশ না করে ফাজিল, কামিল, ডিগ্রীধারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হাফিজ স্ত্রী পাওয়া গেলে তো আর কথাই নেই। সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য সোনায়-সোহাগা ও আম-দুধের মিশ্রণে পরিণত হয়।

মহিলা মাদ্রাসা বা বালিকা হাফিজিয়া মাদ্রাসার পরিবেশ ভবিষ্যতে কি হবে জানিনা। কিন্তু এখনও তা পূত পবিত্র রয়েছে। সমালোচনা কটাক্ষের উর্ধে। কোনো কোনো আলীয়া মাদ্রাসায় পরীক্ষার সময় কুরআন হাদীসের ছেড়া পাতা শুনা যায় পায়খানায় নিক্ষিপ্ত হয়। এরূপ অধ:পতন ইহুদী, নাছারা প্রবর্তিত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও হয়নি। বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে আরো অধিক মহিলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। কারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশুদের পুথিগত ও নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব বর্তায় মায়েদের উপর। মহিলা হাফিজিয়া মাদ্রাসা বর্তমানে যা আছে আরও বৃদ্ধি পেলে দ্বীনি ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং শিক্ষার্থীদেরকে সুগৃহিনী হওয়ার কারিকুলাম প্রর্বতন করা হলে হাফিজিয়া মাদ্রাসা বা মহিলা মাদ্রাসাসমূহ হতে তৈরী সুবধুরা জাতিকে চরিত্রবান, দায়িত্বশীল ও আদর্শ নাগরিক উপহার দিবে।

মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা*

(শাহাতলী, চাঁন্দপুর)

বাংলাদেশে শহরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার হাফিজিয়া মাদ্রাসা আছে। আল-কুরআন হিফ্‌জ করার প্রবণতা, আদব এবং তমুদ্দুন বোধ হয় বিংশ শতাব্দীতে উপমহাদেশেই সবচেয়ে বেশি।

একজন কুরআনে হাফিজের উছিলায় তার মনোনীত ১০ জন বেহেশতে যেতে পারবে, যদি তার ঈমান ও আমল ঠিক থাকে। যে মহল্লায় বা গ্রামে হাফিজ বসবাস করেন, সে এলাকায় আল্লাহ্‌র খাছ রহমত নাজেল হয়। হাফিজ হবার সৌভাগ্য আমাদের অনেকেরই নসীবে নাও হতে পারে। কিন্তু, হাফিজিয়া মাদ্রাসা স্থাপনে সাহায্যের হাত প্রসারিত করা আমাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব।

হাফিজের সংখ্যা

বাংলাদেশে হাফিজের সংখ্যা কত ? এর জরিপ কখনও হয়নি। হাফেজ হওয়া কঠিন। যারা পরবর্তীতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হিফ্‌জ সংরক্ষণ করেন, তাদের পক্ষেই রমজান মাসে খত্‌ম তারাবীহ্‌ পড়ানো সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ মসজিদ আছে। মনে হয় এর অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ সংখ্যক মসজিদে রমজান মাসে খত্‌মে তারাবীহ্‌ অনুষ্ঠিত হয়। এ থেকে দেশে সক্রিয় হাফিজের একটি সম্ভাব্য সংখ্যা কিছুটা অনুমান করা যায়।

খতম তারাবীতে দেখে দেখে সূরা পাঠ

কোনো কোনো দেশে কুরআন হেফ্‌জের তমদ্দুন অনেকটা অবলুপ্তির পথে। অনেক দেশেই তারাবীহ্‌র নামাজের মধ্যে কুরআন খতম করা হয়। কোনো কোনো আরব দেশে ইমাম সাহেব নামাজ পড়াকালীন অবস্থায় দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করেন। কিয়াম অবস্থায় ঈমাম সাহেব কুরআন শরীফ খুলে নির্ধারিত পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করেন, রুকুতে যাওয়ার পূর্বেই কুরআন বন্ধ করে বগলের নিচে রেখে দেন। সে অবস্থায় রুকু-সিজদাহ্‌ করে দন্ডায়মান হবার পর বগলের মধ্য থেকে কুরআন-মজীদ হাতে নিয়ে খুলে পরবর্তী রাকাআতের জন্যে তিলাওয়াত শুরু করেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌! বাংলাদেশে এমন দুর্ভাগ্য আশা করি কখনো হবে না।

---

* ১৯৯৪ সনে নির্বাচন কমিশনে সচিব থাকাকালে আমি একবার মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা দেখতে গিয়েছিলাম। চার-পাঁচ ঘন্টা সেখানে ছিলাম। এ প্রবন্ধের তথ্যগুলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ১৯৯৪ সনে সংগৃহিত।

হাফিজ মুহাম্মদ মুহসিন

ঢাকা শহরে বহু সংখ্যক হাফিজিয়া মাদ্রাসা আছে। এর মধ্যে বেশ কিছু খুব ভাল মাদ্রাসা আছে। কোন্ মাদ্রাসাটি উন্নতমানের তা নির্ণয়ের মাপকাঠি বহুবিধ। বেশ কিছু হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ছাত্রগণ অতি স্বল্প সময়ে হিফ্জ সমাপ্ত করতে পারেন। যে সব মাদ্রাসা বিগত কয়েক বছর/দশক থেকে স্বল্পতম সময়ে কুরআন হিফজ করিয়ে দেয়ার সুমহান দায়িত্ব সুসম্পন্ন করার মহান ঐতিহ্য স্থাপন করেছে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হাফিজিয়া মাদ্রাসা হলো হযরত মাওলানা হাফিজ মুহাম্মদ মুহসিন পরিচালিত মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা।

অবস্থান

চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর থানার অন্তর্গত শাহাতলী ইউনিয়নের মুমিনপুর গ্রামে অবস্থিত মুমিনপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা। মুমিনপুর গ্রামের প্রাচীন নাম ছিল রামচন্দ্রপুর। চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর থানার অন্তর্গত মুমিনবাড়ী মাদ্রাসা বর্তমানে হিফ্জের জন্য বোধ হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত মাদ্রাসা। মাদ্রাসার মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা মোহসিন সাহেবের শ্বশুর ক্বারী ইব্রাহিম সাহেব (রঃ)। তাঁর পুত্র কাজী আবুল বাশার বর্তমানে মুমিনপুর ক্বিরাত মাদ্রাসার পরবর্তী মোহতামিম। মুমিন বাড়ীর নামানুসারে রামচন্দ্রপুর গ্রামের নাম মুমিনপুর করা হয়। মাওলানা মুহসিন সাহেবের বাড়ীতে প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তি আলিম ও দ্বীনদার বলে তাদের বাড়ীর নাম হয় মুমিনবাড়ী।

বাংলাদেশ রেলওয়ের চাঁদপুর হ'তে লাকসাম জংশনের মধ্যবর্তী চান্দপুরে নিকটবর্তী রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম শাহাতলী। রেলওয়ে ষ্টেশনের আধা মাইলের মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শাহাতলী আলীয়া মাদ্রাসা। আলীয়া মাদ্রাসাটি ডাকাতিয়া নদীর তীরে।

যোগাযোগ

চাঁদপুর শহর থেকে ফরিদগঞ্জ থানায় যাবার পথে ফেরী অতিক্রম করে মুমিনপুর গ্রামের নিকটবর্তী "সাহেব বাজার" পর্যন্ত যাওয়া যায়। সাহেব বাজার হতে মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা হাঁটা পথে আধা মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

শাহাতলী আলীয়া মাদ্রাসা হতে হাঁটা পথে মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা প্রায় ১ মাইল। পথের অবস্থা খুবই খারাপ। তাই নৌকায় যাওয়াই নিরাপদ। হেঁটে গেলে মুমিনপুর গ্রামের পাশেই খালের মতো নদীর অংশ বিশেষ নৌকায় অথবা একটু দূরে গেলে সেতু পার হয়ে যাওয়া যায়।

শাহাতলী আলীয়া মাদ্রাসা হতে নদী পথে মুমিনপুর মাদ্রাসা এক মাইল। এ দূরত্ব নৌকায় অতিক্রম করা যায়। নৌকা পাওয়া অনেক সময় কষ্টকর ব্যাপার। আগে থেকে খবর দেয়া থাকলে মাদ্রাসা হতে নৌকা এসে মেহমানদেরকে নিয়ে যায়।

নৈসর্গিক দৃশ্য

শাহাতলী এবং মুমিনপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে ডাকাতিয়া নদী উপদ্বীপের মতো একটি চর সৃষ্টি করেছে। এই 'ব' দ্বীপের মতো চওড়া জায়গায় মাদ্রাসাটি অবস্থিত হওয়ায় ছাত্রদের এলাকার বাইরে যাওয়া খানিকটা কষ্টকর। মাদ্রাসাটির অবস্থান ডাকাতিয়া নদীর লাগতীরে। সারা বছরেই নদীতে পানি থাকে। নৌকা ছাড়া নদী পার হওয়া যায় না।

নদীর অপর তীরের গ্রাম বহুদূরে। প্রশস্ত মাঠে দৃষ্টি অনেকটা হারিয়ে যায়। মাদ্রাসা ঘর বা মসজিদ থেকে বের হলেই গাছ-পালাহীন বিরাট ধানক্ষেত নজরে আসে। ঋতুভেদে কখনও সবুজের সমারোহ, কখনও সোনালী ধানক্ষেতের নৈসর্গিক দৃশ্য অতি চমৎকার। দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে না বরং সুদূর দিগন্তে হারিয়ে যেতে চায়।

মাদ্রাসার সামনে নদী তীরে বসে নদীর অপর তীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। এই ভালো লাগাটা কবি বা সৃজনশীল আবেগপ্রবণ লোকদের জন্যই শুধু নয়; কবি-অকবি, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই মাদ্রাসার স্বল্প পরিসর মাঠে হাঁটাহাটি করতে এবং অপর তীরের মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে।

বর্ষাকালে নদী ও মাঠ পানিতে একাকার হয়ে যায়। তখন মাদ্রাসার সম্মুখ-ভাগ প্রকান্ড হাওড়ের মতো মনে হয়। বর্ষাকালেও মাদ্রাসার মাঠে বসে দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমির দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে।

মাদ্রাসার সম্মুখের নৈসর্গিক দৃশ্যটি ছাত্রদেরকে মাদ্রাসা ভূমিতেই আকৃষ্ট করে রাখে। ছাত্রদের মধ্যে মাদ্রাসার এলাকা ছেড়ে গ্রামের বাইরে বা গ্রামের পথে ঘাটেও ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় না। মাদ্রাসার চৌহদ্দীর মধ্যেই তাদের জীবন আবর্তিত।

মাদ্রাসার জমি

মুমিনপুর গ্রামের মোবারক মঞ্জিলের প্রত্যেক শরীকই মাদ্রাসার প্রতি সহানুভূতিশীল ও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক মাওলানা মোহসিন সাহেবের দাদা শাহ মোবারকের নামানুসারে তার ঘরের নামকরণ করা হয়েছে মোবারক মঞ্জিল। মাদ্রাসা বর্তমানে যে স্থানে অবস্থিত তাতে বাড়ীর বহু শরীকের জমি পড়েছে। সকলেই উদার চিত্তে নিজস্ব অংশের জমি মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন।

ছাত্র সংখ্যা

মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ৩০০ (১৯৯৪ সনে)। এর মধ্যে ১৫০ জন নাজেরা ক্বারীয়ানা পাঠে নিরত। হাফেজী কোর্স শুরু করার পূর্বে নাজেরা ক্বারীয়ানা পাঠ করতে হয়। হাফেজী কোর্সের ছাত্র সংখ্যা ১৩০। এক বছরে নাজেরা বা দেখে কুরআন পাঠ শেষ করার পরেই হাফিজিয়া শুরু হয়। কিতাব ক্লাশের ছাত্র সংখ্যা ৩০ জন (১৯৯৪ সন)।

ঢাকা শহরের বহু বুজুর্গ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সন্তানদেরকেও হিফ্জ শিক্ষার জন্য মুমিনপুর মাদ্রাসায় পাঠান হয়। কাকরাইল তাবলীগ মারকাজের মুরুব্বী হাজী আবদুল মুকিত সাহেবের পাঁচ পুত্র এ মাদ্রাসা হতে হিফ্জ খতম করেন। কাকরাইলের অন্যতম মুরুব্বী ভাই আজিজুল মাকসুদের ৪ পুত্র মুমিনপুর মাদ্রাসায় হিফ্জ সমাপ্ত করেন। মাসিক মদীনার সম্পাদক, মাওলানা মহিউদ্দিন খানের দুই পুত্র মুমিনপুর মাদ্রাসায় হিফ্জ সমাপ্ত করেন। সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন পরিচালক মহিউদ্দিন আহমদের তিন পুত্র মুমিনপুর মাদ্রাসা হতে হাফেজ হন।

মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ

মুমিনপুর মাদ্রাসার বহু ছাত্র দেশ বিদেশে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত আছেন। হাফেজ আবদুল্লাহ এবং হাফেজ বিস্মিল্লাহ্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদে ইমামতি করছেন। তারা মাদ্রাসা ও হিফজখানা পরিচালনায় নিয়োজিত আছেন।

কাকরাইলের বড় হুজুর আবদুল আজিজ সাহেবের (রঃ) ছেলে মাওলানা মাসুদ যুক্তরাষ্ট্রের তাবলীগ মারকাজের জিম্মাদার। হাজী আবদুল মুকিত সাহেবের ছেলে আবদুর

রউফ লন্ডনে একটি মসজিদের ইমাম। হাফেজ ইব্রাহিম ঢাকার মৌলভীবাজারে গুলবদন মাদ্রাসার মোহতামীম। হাফেজ আবদুল হাকিম তাঁতি বাজার ইসলামিয়া মাদ্রাসার মুহতামীম। হাফেজ আবদুল্লাহ তাঁতি বাজার মাদ্রাসার মোহাদ্দিছ। মাওলানা নূরুর রহমান কাকরাইল মাদ্রাসার কিতাব শিক্ষক। মাওলানা হাফেজ আবু বাকার রহমতগঞ্জ ছানদিঘাট মাদ্রাসার মোহতামিম। মাওলানা আবদুস সাত্তার পাকিস্তানের একটি মসজিদের ইমাম এবং কাজী। হাফেজ আবদুস সাত্তার বিক্রমপুর মধ্যপাড়া মাদ্রাসার হিফ্‌জ শিক্ষক। এমনি আরও বহু প্রাক্তন ছাত্র দেশে বিদেশে দ্বীনি কাজে নিয়োজিত আছেন।

সময়ানুবর্তিতা

বড় বড় শহরের তুলনায় মাদ্রাসাটি খুব বড় ধরনের একটি মাদ্রাসা নয় বটে। কিন্তু, এর রয়েছে কিছু কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য যা মাদ্রাসাটিকে একটি অনন্য, অনুপম মাদ্রাসা হিসাবে স্বীকৃতি রয়েছে।

স্বল্প সময়ে হিফজ সম্পন্ন করতে হলে সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সময়ানুবর্তিতা সাধারণতঃ অনুৎপাদনশীল এবং কারিগরি ক্ষেত্রে অনগ্রসর সমাজে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। নির্ধারিত সময়ে বা স্বল্প সময়ে কুরআন হিফ্‌জ সম্পন্ন করতে হলে সময়ানুবর্তিতা অবশ্যই পালন করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এ কাজটি অনুন্নত এবং অনগ্রসর মানবগোষ্ঠীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

শিল্পোন্নত দেশে অর্থের রয়েছে প্রাচুর্য। তাদের নিকট টাকার মূল্য যতটুকু, সময়ের মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি। শিল্পে অনগ্রসর সমাজে প্রকট দারিদ্র্য বিরাজমান। তৈল ও খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলের কথা আলাদা।

দরিদ্র দেশে টাকার দাম বেশি – সময়ের দাম কম। অধিকাংশ লোক থাকে বেকার। ঘড়ি দেখে চলতে তারা জাতিগতভাবে অভ্যস্ত নয়। এরূপ সমাজে কঠোর সময়ানুবর্তিতা প্রবর্তন করা বড় কঠিন কাজ।

মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো কঠোর সময়ানুবর্তিতা। হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকের প্রতিটি পদক্ষেপই এবাদত হিসাবে গণ্য করা হয়। সূর্য উঠে গেলে ফযরের নামাজ কাযা হয়ে যায়। ২-৩ মিনিটে এমন আর কি ক্ষতি হলো, এ কথা বলা যায় না। রোযা রেখে ইফতার দেরীতে করলে রোযাও কাযা হয়ে যায়।

মুমিনপুর মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক কোনো কাজ সময়মত সম্পন্ন করতে না পারলে, এবাদত কাযা হয়ে গেলে যেমন মানসিক অশান্তিতে ভোগেন, মাদ্রাসার প্রতিটি কার্যক্রম সম্পর্কে তারা অনুরূপ অশান্তিতে ভোগেন। বহু দিনের লালিত ঐতিহ্যের ফলে তাদের মধ্যে এরূপ একটি মূল্যবোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনন্দিন রুটিন

মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার সকল ছাত্র-শিক্ষককেই সকাল ৪-৩০ মিনিটের মধ্যে অবশ্য করণীয় কর্তব্য হিসেবে কিতাব নিয়ে পড়তে বসতে হয়। মাদ্রাসার ৩০০ জন ছাত্রকে সাড়ে ৪টার মধ্যে কিতাব নিয়ে পড়তে বসতে হলে তাদেরকে সাড়ে ৩টা থেকে ৪টার ভিতরে শয্যা ত্যাগ করতে হয়। কম বয়সীদেরকে খাদেম ও শিক্ষকেরা ঘুম থেকে তুলে দেন। শিক্ষার্থীদের ঘুমাবার সময় রাত সাড়ে দশটায়।

পড়তে বসার আগে কেউ কেউ হালকা নাস্তা করে নেন। এ নাস্তার ব্যবস্থা ছাত্ররা নিজেরাই করে থাকে। সকল ছাত্রের কাছে বিস্কুট, চিড়া, মুড়ি, চিনি, গুড়, কলা ইত্যাদি জিনিস মজুদ থাকে। তারা তাদের রুচিসম্মত কিছু একটা খেয়ে নেয়।

ফজরের নামাজের পূর্বেই মাদ্রাসার সকল ছাত্রের এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা লেখাপড়া হয়ে যায়।

ফজরের নামাজের পর সঙ্গে সঙ্গেই সকলকে নিয়মিত সকালের নাস্তা করতে হয়। এ নাস্তার ব্যবস্থাও ছাত্রদের নিজেদের কাছে থাকে। প্রত্যেক ছাত্রের বেডিং, সুটকেস ইত্যাদি যেমন আলাদা, তেমনি নাস্তা রাখার পাত্র, বাস্কেট, টিফিন কেরিয়ার ইত্যাদিও আলাদা।

নাস্তা তাদের নিজস্ব রুচি সম্মত। যে ধরণের নাস্তা তারা চাইবে তা পূর্ব দিনেই তাদেরকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিস্কুট, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি যা নষ্ট হয় না, তা প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট বিকাল বেলা সরবরাহ করা হয়।

এক সপ্তাহ নাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একসঙ্গে সরবরাহ করা মাদ্রাসার একটি নিয়ম। যদি কোনো কিছু নিঃশেষ হয়ে যায়, অথবা নষ্ট হয়ে যায়, তা পুনরায় সরবরাহ করা হয়। কিন্তু, সাপ্তাহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একদিনে একসঙ্গে সরবরাহ করার একটি বিধি প্রচলিত আছে।

শুধু নাস্তাই নয়, অন্যান্য বস্তুও যতটুকু সম্ভব হয় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সরবরাহ করা হয়। তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেদেরই কাছে থাকে, যাতে চেয়ে নেয়ার জন্য সময় নষ্ট না হয়।

হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে কিসমিস, দুধ, মধু, সিদ্ধ ডিম, ইত্যাদি খেতে উৎসাহিত করা হয়। কিসমিস হাফিজিয়া কোর্সের ছাত্রদের জন্য উপকারী গণ্য করা হয়।

স্নান ও মধ্যাহ্ন ভোজন

নাজেরা বা কুরআন পাঠ ক্লাশের ছাত্রদেরকে টয়লেটে গমন, গোসল ও মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য ছুটি দেয়া হয় সকাল ৮-৪৫ মিনিটে। হাফিজিয়া গ্রুপের ছাত্রদেরকে ছুটি দেয়া হয় সকাল ৯-০০ টায়। কিতাব গ্রুপের ছাত্রদেরকে ছুটি দেয়া হয় সকাল ৯-১৫ মিনিটে। সব ছাত্রকে নদীতে গোসল করতে হয়। মাদ্রাসার কাছেই ডাকাতিয়া নদী। ছাত্রদের গোসলের সুবিধার জন্য একটি পাকা ঘাটলা তৈরী করা হয়েছে।

শিশু ছাত্রদের গোসলের সময় দুর্ঘটনা রোধে খাদিম বা পাহারাদার সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। ডাকাতিয়া নদীতে সাঁতার কেটে ছাত্ররা গোসল সম্পন্ন করে। প্রতি ১৫ মিনিট পর পর গ্রুপ ভিত্তিক গোসলের জন্য ছুটি দেয়ার দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমতঃ ঘাটে স্থান সংকুলান। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী গ্রুপ গোসলের জন্য এসে গেলে পূর্ববর্তী গ্রুপের উপর চাপ সৃষ্টি হয়, যেন তারা গোসলে টয়লেটে বা অন্য কাজে অতিরিক্ত সময় না কাটায়। এ সময়ের মধ্যে তারা ৪টি কাজ সমাধা করে। সেগুলো হলো :- (১) মাদ্রাসার প্রাঙ্গণ পরিচ্ছন্নকরণ, একটু দৌড়াদৌড়ি হৈ চৈ করা, (২) ব্যক্তিগত ছোটখাটো কাজ, টয়লেট গমন, (৩) গোসল, (৪) দুপুরের খাওয়া। আশা করা হয় যে, ছাত্ররা প্রতিটি কাজ ১৫ মিনিটে সম্পন্ন করবে।

কিতাব গ্রুপের ছাত্রদের জন্য সময় থাকে সবচেয়ে কম। তারা তুলনামূলকভাবে বয়স্ক, দায়িত্বশীল এবং আশা করা হয় যে তারা ছোটদের চেয়ে আরো দ্রুত কাজ করে

অন্য ছাত্রদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তাদের ছুটি দেয়া হয় ৯:১৫ মি: এবং আশা করা হয় যে, ১০:১৫ মিনিটের মধ্যে তারা মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করবে।

কাইলুলা বা দিবানিদ্রা

সকাল ১০:১৫ টা থেকে ১০:৩০ টার ভিতরে ছাত্রদেরকে নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে পড়তে হয়। সকাল ১০:৩০ মিনিটের মধ্যেই প্রত্যেক ছাত্রের মশারী টানানো সম্পন্ন হয় এবং এ সময় মাদ্রাসার সকল দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়া হয়। ঘর অন্ধকার হলে দ্রুত নিদ্রার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

গরমের সময় কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা চলে – শীতের সময় প্রয়োজন হয় না।

সকাল ১০:৩০ টা হতে দুপুর ১২:৩০ টা পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে সকল ছাত্রকে কাইলুলা বা দিবানিদ্রা করতে হয়। এ সময় কারও ঘুম না আসলেও মশারীর নীচে শুয়ে থাকতে হয়। কোনো কথাবার্তা বলে বা শব্দ করে অন্যের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানো যায় না। অভ্যস্ত হয়ে গেলে অস্বাভাবিক মনে হলেও এ সময় নিদ্রা আসে।

যেহেতু মাদ্রাসার পাঠ শুরু হয় সকাল ৪:৩০ টায়, ছাত্রদেরকে ৩:০০ টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে জেগে উঠতে হয়। ভোর ৩:৩০টা থেকে সকাল ১০:৩০ টা পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে জেগে থাকলে এর মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন হয়ে গেলে অনভ্যস্তদের নিকট অস্বাভাবিক মনে হলেও হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য সকাল ১০:৩০ টায় দিবানিদ্রা এবং কাইলুলা স্বাভাবিক স্বভাবে পরিণত হয়।

শীতকালে কাইলুলা বা দিবানিদ্রার সময় সকাল ১০-৩০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত অর্থাৎ দেড় ঘন্টা। গ্রীষ্মকালে ছাত্ররা ইচ্ছে করলে ১২:৩০টা পর্যন্ত ঘুমাতে পারে। কিন্তু দুপুর ১২:৩০ টার পর কেউ বিছানায় থাকতে পারে না।

দুপুরের পাঠ

শীতকালে দুপুর ১২টায় দিবানিদ্রা সমাপনের পর টয়লেট এবং অজুর জন্যে ১৫ মিনিট সময় দেয়া হয়। দুপুর ১২:৩০ টায় সকলকে পুনরায় পড়ার জন্যে বসতে হয়। যোহরের এবং জু'মার নামাজসহ এ পড়া চলে ৩ ঘন্টাকাল – বিকাল ৩:৩০ টা পর্যন্ত।

পাঠ মুখস্থ করার জন্য মগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সময়টুকু গুরুত্বপূর্ণ। হিফ্জকৃত অংশ শিক্ষককে শোনাবার জন্য উৎকৃষ্ট সময় ধরা হয় ফজরের নামাজের আগে।

হিফ্জ মাদ্রাসার ছাত্ররা সাধারণতঃ রুকু অনুসারে হিফজ করে থাকে। রমজান মাসে খত্ম তারাবীহ্ পড়াবার জন্য রুকু অপেক্ষা পৃষ্ঠা হিসাবে হিফজ সুবিধাজনক। প্রতিটি প্যারাকে ২০ ভাগে ভাগ করে এক এক ভাগ তারাবীহ্র নামাজের এক এক রাকাআতে পাঠ করা হয়। এজন্যে এক রাকাতে পড়ার মতো অংশটুকু সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠা অথবা দু'পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ হয়ে যায়, এভাবে প্রতিস্থাপন করে হিফ্জের জন্য মুদ্রিত কুরআন শরীফ পাওয়া যায়। যারা তারাবীহ্র নামাজে কুরআন খতম করতে চান, তারা এরূপ কুরআন অনুসরণ করে থাকেন।

রাতের খাবার

বিকেল ৩:৩০ মিনিটে সকল গ্রুপের ছাত্রদেরকে ব্যক্তিগত পড়াশুনা, ঐচ্ছিক কিতাব পাঠ, আছরের নামাজ, হাঁটাহাটি, দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য কাজের জন্য ছুটি দেয়া হয়।

মাগরিবের আজানের পূর্বেই তাদেরকে রাতের খাবার শেষ করতে হয়। খাবার প্রত্যেক ছাত্রকেই তার নিজস্ব টিফিন ক্যারিয়ারে দেয়া হয়। বিভিন্ন গ্রুপের ছাত্রদের জন্য খাদ্য ও খাদেম নির্দিষ্ট থাকে। ছোটদের টিফিন ক্যারিয়ার তারা না নিয়ে গেলে খাদেমরা পৌঁছে দেন এবং যাতে শিশুরা সময়মত খাবার সমাপ্ত করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্লেট, কাপ ইত্যাদি ধুয়ে যথাযথভাবে যথা স্থানে সংরক্ষণ করে।

মাদ্রাসার নিয়ম হলো এই যে, ছাত্ররা যখন লেখাপড়া করে শিক্ষকদেরকে তাদের কাছে থাকতে হবে। লেখাপড়ায় নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রদের অতি আগ্রহের ফলে বিকাল সাড়ে ৩টার পর হতে মাগরিব পর্যন্ত ফ্রি সময়টুকুতেও শিক্ষকদের মাদ্রাসার বাইরে ব্যক্তিগত কাজে যাওয়াও কষ্টকর হয়ে পড়ে।

বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণকে ছাত্রদেরকে লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ছাত্ররা নিজেরাই পাঠের উদ্যোগী হয় এবং শিক্ষকদেরকে তাদের কাছে বসে থাকতে বাধ্য করে।

রাতের পড়া

মাগরিবের নামাজ থেকে শুরু করে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত পুনরায় ছাত্রদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে লেখাপড়ায় নিয়োজিত থাকতে হয়। রাত সাড়ে নয়টায় ছুটির পর একঘন্টা পর্যন্ত মুক্ত সময়।

রাতের নাস্তা

রাত সাড়ে নয়টা হতে রাত দশটার মধ্যে ছাত্ররা নাস্তা করে। বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে যেহেতু রাতের খাবার খেয়ে নিতে হয়, ঘুমের আগে তাদেরকে কিছু খেতে হয়। রাতের নাস্তা খেয়ে প্রয়োজন হলে টয়লেটে যায়– নূতন করে উজু করে, কেউ কেউ নফল নামাজ পড়ে, কিছুটা কুরআন তিলাওয়াত করে, খোশ গল্প করে, হৈ চৈ করে, নিদ্রার প্রস্তুতি নেয়।

চাঁদের আলো না থাকলে নিদ্রার পূর্বেকার কর্মকান্ড কক্ষের ভিতরেই আবদ্ধ থাকে।

শয্যা গমন

রাত সাড়ে দশটার মধ্যে সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে ঘুমিয়ে পড়তে হয়। ভোর সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠার কথা। কিন্তু, কেউ ইচ্ছে করলে ভোর ৪টা পর্যন্তও ঘুমিয়ে থাকতে পারে।

বৈকালিক ভ্রমণ

ছাত্রদের মধ্যে মাদ্রাসার এলাকার বাইরে ভ্রমণ এবং খেলাধূলার প্রবণতা খুবই কম। যদিও মাগরিবের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত কোনো বাধ্যতামূলক লেখাপড়া নেই। কিন্তু, মাগরিবের নামাজের আধা ঘন্টা পূর্বেই সকল ছাত্রের কিতাব নিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে দেখা যায়।

মাদ্রাসা এলাকায় ছাত্রদের অবস্থান কারো কারো নিকট বন্দী দশা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, তা'হলে এই বন্দীদশা স্বেচ্ছাকৃত; চাপিয়ে দেয়া নয়। বিকেল ৩ঃ৩০ টা থেকে মাগরিবের নামাজ পর্যন্ত ২ ঘন্টা অথবা তদূর্ধ সময় রাতের খাবার, আছরের নামাজ এবং ব্যক্তিগত কাজের জন্যে সুনির্দিষ্ট। আছরের নামাজের পরেই রাতের খাবার দেয়া হয়। খাবার শেষ করেই ছাত্ররা ইচ্ছে করলে মাগরিবের আগ পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে পারে।

ছুটি

প্রতি বছর ছাত্র শিক্ষকদেরকে ৩ বার ছুটি দেয়া হয়। এ ছুটিগুলো রমজান, কোরবানী এবং অন্যান্য বিশেষ দিন ও উৎসব উপলক্ষে।

কোরবানী উপলক্ষে ছাত্ররা শিক্ষকদের ছুটি হলো ১৫ দিন।

হিফ্‌জ, নাজেরা, ক্বারীয়ানা পাঠ গ্রুপ-এ ২৫শে রমজান থেকে ৩ সপ্তাহের জন্য মাদ্রাসা বন্ধ থাকে। বয়স্ক ছাত্র – হিফজ সমাপ্তির পর কওমী নেসাবে কয়েকটি কিতাব পাঠ করে। সেজন্যে সুচিন্তিত সিলেবাস আছে। মুমিনপুর মাদ্রাসায় মিসকাত পর্যন্ত কিতাব পড়ানো হয়।

কিতাব গ্রুপের ছাত্ররা একটু বয়স্ক। তাদের ছুটি শুরু হয় রমজানের ৫ দিন পূর্বে এবং এই ছুটির মেয়াদ হলো পৌনে দু'মাস।

ঈদুল আজহা হতে ঈদুল ফিতরের মাঝখানে সময়টি প্রায় ৯ মাস। এর মধ্যে ছাত্রদেরকে ৩ সপ্তাহের ছুটি দেয়া হয়। শিক্ষকেরা নিজেদের সুবিধামত ২০ দিন ছুটি পান পূর্ণ বেতনে এবং ২০ দিন ছুটি পান বিনা বেতনে।

ছাত্রদের দেয় বেতন এবং ফিস

দু'বেলা খাবার জন্য সাধারণতঃ খরচ হয় ৭০০-৭৫০ টাকা। যা খরচ হয় তা যত ছাত্র যত বেলা খেলেন হারাহারিভাবে তাদের মধ্যে বন্টন হয়। শিশু এবং বয়স্ক সকল ছাত্রের জন্য হার একই। কম বয়সের ছাত্ররা যে কম খায় তা নয়। মাছ, গোশ্‌ত, তরকারি সকলকেই তাদের টিফিন ক্যারিয়ারে সমানভাবে দেয়া হয়। বড় ছোট কোনো পার্থক্য করা যায় না। ডাল এবং ভাত তাদের প্রয়োজনমত দেয়া হয়। শিক্ষকদের খাবার ছাত্রদের মেস থেকেই ফ্রি দেয়া হয় এবং এটাই বিধি।

ছাত্রদেরকে তাদের রুচি এবং প্রয়োজনমত টিফিন দেয়া হয়। এ টিফিন মানে উন্নত ও পরিমাণে পর্যাপ্ত।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল। বলা হয় যে, রুগ্ন ছাত্র এলেও এখানকার আবহাওয়া ও পরিবেশে তাদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল হয়ে যায়।

যেহেতু সাধারণতঃ বিত্তবানদের ছেলেরাই এ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে থাকে, তাদের রুচিমত যা খেতে চায়, তা-ই খেতে দেয়া হয়। এটা ছাত্রদের মাদ্রাসায় তুষ্ট হয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ।

ছাত্রদের বেতন এবং বৈদ্যুতিক বিল বাবদ মাসিক ৫০/- টাকা আদায় করা হয়।

মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার মোট ছাত্র সংখ্যা ৩০০। তন্মধ্যে ২৫০ জন দেশী, ৫০ জন বিদেশী, তথা ইংল্যাণ্ডের বসবাসরত বাংলাদেশীদের সন্তান।

ছাত্রদের দেয় অর্থের হিসাব

যদিও মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার জন্য চাঁদা নেয়া হয় না, বা চাঁদার কোনো বই নেই, কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে যে টাকা নেয়া হয়, তার পাই পাই হিসাব রাখা হয়। এজন্য ২ জন হিসাব রক্ষক সার্বক্ষণিক নিয়োজিত আছেন।

শিক্ষকদের বেতন

মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিম্নতম বেতন হলো ১৭০০ টাকা এবং উর্ধতন বেতন হলো ২৩০০ হতে ২৪০০ টাকা। শিক্ষকদের বেতন শুরার মধ্যে আলোচনাক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। অনেকেই প্রতি বছর ১০০ টাকা হারে বর্ধিত বেতন পেয়ে থাকেন।

বেতন ছাড়াও রমজানের ঈদ উপলক্ষে শিক্ষকদেরকে ঈদ বোনাস দেয়া হয়। ঈদ বোনাসের পরিমাণ হয় ৫০০/- থেকে ৬০০/- টাকা পর্যন্ত।

মাদ্রাসার শিক্ষকেরা সার্বক্ষণিকভাবে মাদ্রাসায় অবস্থান করেন। ছাত্ররা যে সমস্ত হল ঘরে থাকেন, ঐ কক্ষেই তাঁরা সাধারণতঃ একটি চৌকিতে থাকেন।

মাদ্রাসা পরিচালনার ব্যয়

মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হাফেজ মাওলানা মোহসিন সাহেবের বয়স সত্তুরের বেশি (১৯৯৪)। তিনি তাবলীগ জামা'য়াতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন এবং এর ব্যবস্থাপনায় উদ্বুদ্ধ। তাবলীগ জামা'য়াতের জন্যে কোনো চাঁদা সংগ্রহ করা হয়না। যাঁরা তাবলীগে অংশগ্রহণ করেন, তাঁরাই নিজ নিজ ব্যয় বহন করেন। যারা দীর্ঘ সময় দেশে তাবলীগী সফরে অথবা বিদেশে ভ্রমণে সক্ষম, তাঁরাই অনুরূপ সফর করে থাকেন।

মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্যে বার্ষিক মাহফিল করা হয় না বা চাঁদাও তোলা হয় না। যে সমস্ত ছাত্র নিজ ব্যয়ে লেখাপড়া করতে সক্ষম, তারাই এ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে থাকেন। অন্যের কৃপা নির্ভর না হয়ে নিজের সন্তানের লেখাপড়ার ব্যয় বহন করা পিতা-মাতারই কর্তব্য। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। কর্মজীবনে দান, খয়রাত, ভিক্ষার মনোবৃত্তি দূর হয়।

যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করতে চান, তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে তা করতে পারেন। প্রয়োজনের তুলনায় মাদ্রাসার আবাসিক সুযোগ-সুবিধা খুবই অপ্রতুল। বর্তমানে যে সুযোগ-সুবিধা আছে, তার মাদ্রাসা সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তিরা নিজেরা উপস্থিত থেকে অথবা তাদের বিশ্বাসভাজন কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করে দিয়েছেন।

আমাদের দেশে সাহায্য চাইলে পাওয়া যায়। অনেক বিত্তবান ব্যক্তি সহৃদয় মাদ্রাসায় মুক্ত হস্তে আর্থিক সহযোগিতা করতে আগ্রহী। কিন্তু সাহায্য প্রার্থী প্রকৃত মাদ্রাসার নাম ও প্রয়োজনীয়তা জানা না থাকলে যারা সাহায্য করতে ইচ্ছুক, তারা সাহায্য করতে পারেন না। প্রয়োজনটা কি দাতাদের বুঝানো প্রয়োজন। কিন্তু, এ সমস্ত ব্যাপারে তাবলীগ জামা'য়াতের অনুসারীরা আল্লাহ্র উপরে পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। মাদ্রাসার প্রয়োজনের কথা অন্যদের নিকট নিজে উদ্যোগী হয়ে ব্যাখ্যা করেন না। ফলে প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণিক ব্যবস্থাপনা অতি শ্লথ গতিতে অগ্রসর হয়।

মাদ্রাসার শিক্ষক

মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার সকল শিক্ষকই নিবেদিত প্রাণ। তারা মাদ্রাসাকে পরকালে নিজেদের নাজাতের উছিলা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। মাওলানা ফজলুর রহমান, সুফীজী হুজুর হাফেজ আবদুল হাই, (লালবাগের প্রাক্তন শিক্ষক), ক্বারী আবদুল মান্নান, ক্বারী তাজুল ইসলাম প্রমুখ প্রত্যেক শিক্ষকই ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা মাদ্রাসার স্বার্থকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। বর্তমানে (১৯৯৪ সনে) মাদ্রাসার শিক্ষকের সংখ্যা ১৭ জন এবং হিসাব রক্ষক ২ জন।

শিক্ষক হিসাবে যারা নিয়োজিত হন তাদের অনেকেই প্রথম ৫ বছরের মধ্যেই মাদ্রাসা ত্যাগ করেন। মাদ্রাসার কঠোর শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ কারো কারো পক্ষে কঠিন হয়।

শিক্ষকদের শিক্ষা বহির্ভূত কর্মসূচীর নিষিদ্ধতা

হাফিজিয়া, কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রগণ কুলখানি, মিলাদ, ওয়াজ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। মুমিনপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসার কোনো ছাত্রের এ ধরণের অনুষ্ঠানে যোগদান তো দূরের কথা, শিক্ষকদেরকেও কোনো দাওয়াত গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয় না। তারা কুলখানি, মিলাদ, খতমখানি, ওয়াজ মাহফিল, মাদ্রাসা পরিদর্শনে যেতে পারেন না।

মাওলানা মোহসিন সাহেব বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এমনকি লন্ডন থেকে ছাত্রদেরকে এ মাদ্রাসায় পাঠের জন্যে প্রেরণ তাদের পিতা-মাতার এক বিরাট কুরবাণী। মাদ্রাসার ছাত্ররা তাঁর নিকট পিতা-মাতার আমানত। এ মাদ্রাসার কোনো শিক্ষকেরই ছাত্রদের শিক্ষা বহির্ভূত অন্য কোনো দ্বীনি খেদমত প্রদানের সময় কম। অন্যদিকে দৃষ্টি দিলে বা মন গেলে ছাত্রদের লেখাপড়া ব্যাহত হয়।

কোন্ ছাত্র কোন্ সূরার কোন্ আয়াত পর্যন্ত হিফ্‌জ করতে পেরেছে, এবং কোন্ আয়াত ভুলে যাচ্ছে, কোন্ অক্ষর বা শব্দ উচ্চারণে ভুল করছে এরূপ বিষয়ে শিক্ষকদের চিন্তা-ভাবনা কেন্দ্রীভুত রাখা উচিত। এ দায়িত্ব তারা সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারলে ওয়াজ মাহফিল, মিলাদ, কুলখানিতে যাওয়ার যে দায়িত্ব, তা পালন না করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে হয়তো মাফ করে দেবেন।

হাফিজ মাওলানা মোহসিন সাহেব বিশ্বাস করেন দ্বীনি ক্ষেত্রে মুসলমানের যে দায়িত্ব, সে দায়িত্বটুকু সূচারুরূপে নিবেদিত প্রাণে সম্পাদন করা সম্ভব হলে সকলের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের সোনালী সুন্নাহ মুসলিম সমাজ কায়েম হওয়া সহজতর হবে।

মাওলানা মোহসিন সাহেব মনে করেন যে অন্য কোনো মাদ্রাসার পরিচালক, সংগঠক এবং শিক্ষকগণ যদি তার মাদ্রাসাটিকে ভাল মনে করে থাকেন, তবে তাদের উচিৎ হবে এ মাদ্রাসায় এসে ১ মাস, ২ মাস, ৩ মাস অবস্থান করা। এই মাদ্রাসার নিয়ম কানুন পর্যবেক্ষণ করা। তারা দেখে যতটুকু শিখবেন, সেটাই হবে সত্যিকার অভিজ্ঞতা।

মুমিনপুর মাদ্রাসার শিক্ষকদের অন্য মাদ্রাসায় গিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াজ করে তেমন কিছু লাভ হবে না, যতটুকু হবে অন্য মাদ্রাসার শিক্ষকরা এসে মুমিনপুর মাদ্রাসায় কিছুকাল সময় ব্যয় করে এ মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতি স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ এবং অনুধাবন করলে।

প্রেষণোপযোগী শিক্ষক

মুমিনপুর মাদ্রাসায় কিছু সংখ্যক শিক্ষক এমন থাকা উচিত যারা অন্য মাদ্রাসায় প্রেষণে প্রেরিত হবেন। বিশেষ করে কোন নব প্রতিষ্ঠিত হাফিজিয়া মাদ্রাসায়। মুমিনপুর মাদ্রাসার মডেলে শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলবেন। এরূপ একটি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন আছে বলে হাফেজ মোহসীন সাহেব অনুভব করেন। কিন্তু সমস্যা হলো আর্থিক সংস্থান।

মুমিনপুর মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন আসে ছাত্রদের বেতন থেকে। অন্য মাদ্রাসার জন্যে এ মাদ্রাসার প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক রাখতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন হবে, সে অর্থ এ মাদ্রাসার ছাত্রদের কাছ থেকে নেয়া সঙ্গত হবে না। আর তাঁর নীতিমালা অনুসারে তিনি অন্যদের কাছ থেকে অর্থ চাইতে পারেন না। যদি কোনো

সহৃদয় ব্যক্তি এক বা একাধিক অতিরিক্ত শিক্ষকের বেতন বহন করতে রাজী থাকেন, তবে এ মাদ্রাসায় তদ্রূপ সংখ্যক প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক রাখা সম্ভব।

এ মাদ্রাসার শিক্ষক অন্য যে মাদ্রাসায় শিক্ষকতার জন্য যাবেন তথাকার কমিটি যদি তাদের ব্যয় বহন করেন, তখন তাদের খাতে অর্থ প্রয়োজন হবে না। কিন্তু, অন্তবর্তীকালীন সময়ে এ পদ্ধতিটি চালু না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন।

মজলিসে শুরা

মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল হতে এখন পর্যন্ত বহু বুজুর্গ মুরুব্বীর মূল্যবান পরামর্শে এ মাদ্রাসার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। এদের মধ্যে আছেন কাকরাইল তাবলীগ মারকাজের বড় হুজুর আবদুল আজিজ, মরহুম হাফেজজী হুজুর মাহমুদুল্লাহ্ (রঃ), মুমিনবাড়ী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ক্বারী ইব্রাহীম (রঃ) (হাজী মোঃ মোহসিন সাহেবের শ্বশুড়), মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ্, কাকরাইলের মুরুব্বী হাজী আবদুল মুকিত প্রমুখ।

মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ মোহসিন সাহেব মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার মূলতঃ প্রতিষ্ঠাতা। প্রেরণা দাতা ছিলেন তাঁর শ্বশুর কারী ইব্রাহীম (রঃ)। বর্তমানে তাকেই প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়। হিফ্‌জ সম্পন্ন করার পর মাওলানা মুহাম্মদ মুহসিন দেশে লেখাপড়া করেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্যে পরে দেওবন্দ গমন করেন। দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর শিক্ষকতাকে হাফিজ মোহসিন সাহেব স্বীয় পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। শুরুতে তিনি বিক্রমপুরের মোমতাজগঞ্জে প্রথম একটি হাফিজিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৯৫৩ সনে নিজ গ্রাম মুমিনপুরে বর্তমান হাফিজিয়া মাদ্রাসাটি স্থাপন করেন।

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ মোহসিন সাহেবের পরিবার কয়েক পুরুষ পর্যন্ত দ্বীনি সেবায় নিয়োজিত আছেন। হাফেজ মুহাম্মাদ মোহসিন তাঁর পিতা মাওলানা হাবিবুল্লাহ্‌র একমাত্র পুত্র। পিতামহ শাহ্ মোবারক ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম। শাহ মোবারকের পিতা শাহ্ কাশেমও বিখ্যাত আলেম ও বুজুর্গ ছিলেন। শাহ্ কাসেমের পিতা শাহ্ হাসান আরব দেশ থেকে এতদ্ অঞ্চলে আগমন করেন বলে জনশ্রুতি আছে।

মাওলানা মুহাম্মাদ মোহসিন সাহেবের পিতামহ মোবারক শাহ-এর ছিল ৫ পুত্র। তাঁদের নাম (১) মাওলানা হাবিব উল্লাহ্, (২) মাওলানা সফি উল্লাহ্, (৩) মাওলানা ছিদ্দিক উল্লাহ্, (৪) মাওলানা লতিফ উল্লাহ্ এবং (৫) মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ্।

মাওলানা সফি উল্লাহ্ ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মোহ্‌তামীম ছিলেন। মাওলানা ছিদ্দিক উল্লাহ্ শাহাতলী আলীয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দীস ছিলেন। মাওলানা লতিফ উল্লাহ্ অল্প বয়সে মারা যান। মাওলানা মুহাম্মাদ মোহসিনের চতুর্থ এবং কনিষ্ঠ পিতৃব্য মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ্ সুদীর্ঘকাল লালবাগ জামিয়া কোরকানীয়ার মোহ্‌তামীম ছিলেন। তিনি বর্তমানে ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার মোহ্‌তামীম।

মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ্‌র প্রথম পুত্র মাওলানা ফজলুর রহমান মুমিনপুর মাদ্রাসার শিক্ষক। দ্বিতীয় পুত্র হাফিজুর রহমান ঢাকার রহমানীয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দীস। তৃতীয় পুত্র হাফেজ ফজলুর রহমান উক্ত রহমানীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক।

মাওলানা মোহসীন সাহেবের প্রথম পিতৃব্য সফি উল্লাহর একমাত্র পুত্র মাওলানা মাহমুদ অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মাওলানা মোহসিনের দ্বিতীয় পিতৃব্য মাওলানা সিদ্দিকুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবু সাদিক। ২য় পুত্র মাওলানা আবু নাফেহ নরসিংদী আলীয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দীস। ৩য় পিতৃব্য মাওলানা লতিফ উল্লাহর পুত্র হাফেজ ফরিদ লেখাপড়া করতে পাকিস্তান গিয়ে সেখানেই থেকে গেছেন।

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ মোহসিন সাহেব ৬ পুত্রের জনক। তারা সকলেই হাফিজ। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ খালেদ হাটহাজারী মাদ্রাসা হতে ফারেগ হয়েছেন। তিনি বর্তমানে কাকরাইল হাফিজিয়া মাদ্রাসার জিম্মাদার। তিনি মুমিনপুর মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানে পিতাকে সহায়তা করেন।

হাফেজ মোহসিন সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ খালেদ বৎসরাধিক কাল একাধিকবার তাবলীগে সময় দিয়েছেন। তিনি তাবলীগের কাজে কেনিয়া, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, জিম্বাবুই, আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশে সফর করেছেন। হাফেজ মোহসিন সাহেবের ২য় পুত্র হাফেজ রাশেদও তাবলীগে ৩ চিল্লা সময় দিয়েছেন। তৃতীয় পুত্র হাফেজ মাওলানা হামেদ যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা হতে ফারেগ হয়েছেন। তাঁর দুই পুত্র মোঃ জাহেদ এবং মোঃ জাবেদ হাটহাজারী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত। পঞ্চম পুত্র আমের ঢাকার মৌলভীবাজারস্থ গোলবদন মাদ্রসার ছাত্র।

হাফেজ মাওলানা মোহসিন সাহেব ছেলেমেয়েদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন দ্বীনদার এবং আলেম পরিবারে। তাঁর প্রথম জামাতা মাওলানা আনোয়ার কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া থানার রহমতপুর মাদ্রাসার মোহ্‌তামীম। ২য় জামাতা মাওলানা আবদুল বাতেন হাজারীবাগ ট্যানারী মোড় মসজিদের ইমাম এবং সাভার ফুলবাড়ীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। ৩য় জামাতা হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া সংযুক্ত আরব আমীরাতের শারজায় অবস্থিত সালমান ফারসী মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি হাফেজ্জী হুজুরের ভ্রাতা মাওলানা ইউসুফ সাহেবের পুত্র। ৪র্থ জামাতা হাফেজ মাওলানা মোকাদ্দেস কাকরাইলের শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বী মাওলানা মুনির সাহেবের পুত্র। তিনি আমানতপুর পীর মঞ্জিল মাদ্রাসার মোহতামীম।

হাফেজ মোহসিন সাহেবের বাড়ীর সকলেই দ্বীনি শিক্ষা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রতি সহানুভূতিশীল।

লন্ডনের বাঙ্গালী বংশোদ্ভূত যে সমস্ত ছাত্র অতীতে এ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে গেছেন, তাদের অভিভাবকদের কেউ কেউ মাওলানা মোহসিন সাহেবকে বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা করতে চেয়েছেন, অন্ততঃ তাঁর বাসগৃহটির জন্য একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করে দিতে চেয়েছেন। এ সমস্ত প্রস্তাব মাওলানা মোহসিন সাহেব স্মিতহাস্যে নীরবতার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মাদ্রাসার জন্য একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণের প্রস্তাবও কেউ কেউ দিয়েছেন। আশে-পাশের বাসিন্দাদের পর্দা ব্যাহত হওয়ার আশংকায় এ ধরণের প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি।

হাফিজিয়ার পর কিতাব কোর্স

মুমিনপুর মাদ্রাসা পূর্বে মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কিতাব ক্লাস প্রবর্তনের ফলে মাদ্রাসাটিকে মুমিনপুর মাদ্রাসা বলা হয়।

হাফিজিয়া শেষ করার পরও যারা মাদ্রাসায় লেখা পড়া করতে চায় তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেয়া হয়। সপ্তম স্তর পর্যন্ত কিতাব শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

ছাত্রদের মধ্যে যারা হিফজ সমাপ্ত করতে নানা কারণে অক্ষম, তাদেরকেও কিতাব কোর্সে ভর্তি করা হয়। কিতাব কোর্সের সিলেবাস হিসেবে দেওবন্দী নেছাব অনুসরণ করা হয়। শিক্ষকদের নিজস্ব পাঠাভ্যাস ও এলেম চর্চার চেয়ে কিতাব কোর্সটি জরুরী। কিতাব ক্লাস যেহেতু উচ্চ পর্যায়ের; তাই এটি স্বাভাবিকভাবে গুরুত্ব পেয়ে যায়।

কিতাব পাঠের জন্য মুমিনপুর মাদ্রাসা সুবিখ্যাত নয়। হাফিজিয়া মাদ্রাসা হিসাবে এটা অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। কিতাব কোর্স চালু থাকার ফলে ক্রমশঃ দাওয়া পর্যন্ত প্রবর্তনের প্রবণতা, দাবী ও প্রয়োজন দেখা দেবে। ফলে হাফিজিয়া মাদ্রাসা হিসেবে তুলনামূলকভাবে মাদ্রাসাটি নিস্প্রভ হয়ে যেতে পারে। এ দুর্ঘটনা যেন না ঘটে তাই মাদ্রাসাটির নাম মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা নামেই চালু থাকা প্রয়োজন।

প্রচার

মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসাটি বাংলাদেশের একটি অনুপম হাফিজিয়া মাদ্রাসা। কিন্তু এর প্রচার এবং পরিচিতি খুবই কম। হাফেজ মাওলানা মোহসিন সাহেব তাবলীগ জামা'য়াতের অনুসারী বলেই হয়তো সর্বপ্রকার প্রচার বিমুখ। ভাল জিনিস এবং প্রতিষ্ঠানের প্রচার না হলে বহু লোক এর থেকে ফায়দা নিতে পারে না।

মাওলানা সাহেব প্রচার বিমুখ। কারণ মাদ্রাসার ৩০০ ছাত্র ব্যবস্থাপনার জন্য অপটিমাম বা কাঙ্খিত সংখ্যা। ছাত্র সংখ্যা এর বেশি হলে ব্যবস্থাপনা কঠিন নয়। তথাপিও মাদ্রাসাটির প্রচার ও পরিচিতির প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, অন্যত্র উদ্যোক্তারা অনুরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ ধরনের সুনিয়ন্ত্রিত হাফিজিয়া মাদ্রাসা যতই প্রতিষ্ঠিত হয় ততই ভালো। এ মাদ্রাসায় এক বছর সময়কালে শিশুদের নাজেরানা কুরআন পাঠ সমাপ্ত হয়। এক বছরের মধ্যে শিশুদের ক্বারী হয়ে যাওয়া কম কথা নয়। ঢাকা ও বড় বড় শহরগুলিতে এ ধরণের পদ্ধতি চালু হলে বহু বিত্তবান পিতামাতাই ইংরেজী-বাংলা শিক্ষার পূর্বে ৮ বছরের মধ্যে কোনো এক সময় ১ বছর নাজেরা ক্বারীয়ানা পড়াতে আগ্রহী হবেন।

বর্তমান বিশ্বে, মুসলিম সমাজে আদর্শ মানুষ, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ প্রতিষ্ঠান, মডেল এবং অনুকরণীয় সংস্থা খুবই কম। প্রচারণা বিমুখ বলে আদর্শ মানুষ এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠান দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়।

ঈমান ইয়াক্বীনের তুলনায় শিরক ও কুফরের প্রচার ও প্রভাব মানব জীবন ও সমাজে যেরূপ বেশি – আদর্শ মানুষ, আদর্শ প্রতিষ্ঠান, মডেল সংস্থার প্রচার এবং প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। প্রতিযোগিতামূলক সমাজে প্রচার ও সম্প্রসারণ দূরের কথা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কষ্টকর।

মুমিনপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রদীপ এ অন্ধকার মুসলিম সমাজে এখানে সেখানে যে দু'একটি জ্বলছে, তা যেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে আলোকিত, প্রভাবিত, প্রাঞ্জল করতে পারে, সেদিকে আমাদের সুদৃষ্টির প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন

ভারতীয় মুসলমানদের অবক্ষয়ের শুরু আওরঙ্গজেব আলমগীরের ইন্তেকালের পর থেকে (১৭০৭)। পঞ্চাশ বছর পর ঘটে পলাশীর – মহাবিপর্যয় (১৭৫৭)। একশত বছর পর জাতির ললাটে অঙ্কিত হয় স্বাধীনতা সমর বা মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতা (১৮৫৭)। আরো পঞ্চাশ বছরে মাথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইতিহাসের অন্য মাইলফলক ভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬)। দূরীভূত হতে শুরু করে দু'শত বছরের অমানিশার ঘোর অন্ধকার।

চিন্তা করা, স্বপ্ন দেখা সৃষ্টিশীল মানুষের চিরন্তন প্রকৃতি। আজ যা বাস্তব সুদূর অতীতে তা ছিল স্বপ্ন, কখনও বা দিবা স্বপ্ন এবং কখনও কল্পনা। ধীরে ধীরে বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করে।

আজ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের পাশ্চাত্য শিক্ষার যে বাস্তবতা দেখা যায়, নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী এবং বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন এর নিকট তা ছিল স্বপ্ন। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছেন এবং স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে প্রতিপক্ষের অপমান, গঞ্জনা সহ্য করেছেন বলেই তাদের স্বপ্নের ফসল আমরা কুড়াচ্ছি। বেগম রোকেয়াকে নারী শিক্ষা বিরোধীদের হাতে কতই না নাজেহাল হতে হয়েছিল।

গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে বালিকা মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসার স্বপ্নও তেমন অলীক এবং অবাস্তব নয়। মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলনের কর্মী মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্যোক্তা বা পৃষ্ঠপোষক এখন বড় অভাব।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার মুসলমান সমাজের পূর্ণজাগরণ শুরু হয়। এ সময় সমাজের উন্নয়নকামী ত্যাগী ব্যক্তিরা মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো প্রজ্বলিত করার মহান সাধনায় ব্রতী হন। যেখানে সম্ভব হয়েছে তাঁরা মাইনর স্কুল, হাই স্কুল স্থাপন করেছেন। কয়েক যুগের মধ্যে সমাজ এর ফল পেতে শুরু করেছে। যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের অনেকেই চাকুরী পেয়েছেন। মুসলিম সমাজে একটি চাকুরীজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। ভারত বিভাগের পর মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে অনেকেই উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ছনের ঘর ও টিনের ঘরের পরিবর্তে পাকা বাড়ীতে থাকা শুরু করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা ছিল জমিদারদেরই অনেকটা একচ্ছত্র অধিকার।

আজাদীর পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা কিছুটা পরিবর্তিত হচ্ছে। পাকিস্তান আমলে ধনীদের সংখ্যা ছিলো খুবই সীমিত। এরা এখন পিছনে পড়ে গেছেন। অন্যদিকে নতুন ধনীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুসলিম দেশসমূহের জনশক্তি রপ্তানী শুরুর পর গ্রামেও টাকা পয়সা কিছুটা যাচ্ছে। একটি গ্রামের দশটি চাকুরীজীবি ছেলে পূর্বে গ্রামে যত টাকা পাঠাতে পারতো, এখন একটি ছেলে মধ্য প্রাচ্যে চাকুরী করে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাঠাতে পারে। মোটামুটিভাবে এক শ্রেণীর লোকের আর্থিক অবস্থা বৃটিশ আমল হতে স্বচ্ছল হয়েছে, জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। অর্থনৈতিক অব্যবস্থা এবং সুসম বন্টনের অভাবে একদিকে যেমন দারিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি ধনীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের এক শ্রেণীর লোক খেতে পারছেনা, আরেক শ্রেণীর লোকের হাতে কাঁচা টাকা আসায় ভোগ বিলাসের গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। এ কু-প্রভাব ছাত্র সমাজেও দেখা যাচ্ছে। আমাদের ছাত্রদের দুই আংগুলের ফাঁকে সিগারেট, হাতে ঘড়ি, পরিধানে বিদেশী সার্ট-প্যান্ট, পায়ে জুতা, সাথে রেডিও, কণ্ঠে সিনেমার গান আজকাল অতি স্বাভাবিক।

রাস্তা ঘাট হয়েছে, যাতায়াতের সুবিধা বেড়েছে। একদিনেই দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে পৌছা যায়।

দিকে দিকে আমাদের উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু একটি দিকে আমাদের হচ্ছে ক্রমাগত অধঃপতন। তা হলো আমাদের সততা, সত্যবাদীতা, পরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, মাতাপিতার আনুগত্য ইত্যাদি ন্যায় ও নীতির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ একদিকে আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নয়ন এবং রুচির ও মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে; অন্যদিকে গঠনমূলক চিন্তা-চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় হয়েছে।

আগে অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে চুরি করতো। আজকাল শিক্ষিত শ্রেণীই থেকে ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি, জুয়া, চুরি, হাইজ্যাক করছে। শিক্ষিত চোরদের তুলনায় পকেটমার এবং মসজিদে জুতা চোরদের অপরাধ তো তেমন কিছুই না।

অতীতে চোর, পকেটমার কখনও নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তারা বাড়ীতে দালান কোটা বানাতে পারতো না। কিন্তু আজকাল ঘুষখোর, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিতে চ্যাম্পিয়ন ব্যক্তিদের অনেকেই আমাদের সমাজে জাদরেল আমলা, শিল্পপতি, বিচারপতি, রাজনীতিবীদ, সমাজপতি। আমাদের সম্পদ এবং স্বাচ্ছন্দ বেড়েছে, কিন্তু ইনসাফ ও নীতি ভ্রষ্ট হওয়ায় সুখ ও শান্তি কমেছে।

এতো মিথ্যা, এতো প্রতারণা, এতো দূর্নীতি, কোন ভিন্নধর্মী দেশে বা সমাজে নাই। আমরা ধনী হয়েছি । শিক্ষিত হয়েছি। কিন্তু মানুষ হতে পারছিনা। পশুত্বে আমাদের কেউ কেউ পশুকেও হার মানাচ্ছে।

আমাদের নৈতিক অবক্ষয়রোধ এবং দানবীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অনেকেই চিন্তা ভাবনা করেছেন। বহুজনে বহু ফ্রন্টে কাজ শুরু করেছেন। যার যে স্থানে যে ক্ষেত্রে যেভাবেই অবদান রাখা সম্ভব আমাদের সকলেরই তা করা উচিৎ। আমরা মনে করি একটি এরূপ বেহাল অবস্থা রোধে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হলো নারীদের মধ্যে নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তার।

আমাদের দেশে নৈতিকতার ভিত্তি হলো ধর্ম। ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্মীয় চেতনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হলে আমাদের ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয় শতকরা এক'শ ভাগ প্রতিরোধ করা যাবে।

স্বভাব খারাপ হয়ে গেলে তা বদলানো কঠিন। নিজেদের যা অধঃপতন হয়েছে বা হচ্ছে তা রোধ করার চেষ্টার সাথে সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর যেন আমাদের

মতো না হয়, সেদিক লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন অনেক বেশি। ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতন হতে রক্ষা করতে পিতার চেয়ে মাতার ভূমিকাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

সন্তানের বেহেশত পিতার পদতলে নয়; মায়ের পদতলে। পিতা রাস্তা বানায়, যন্ত্রপাতি তৈয়ার করে, খাদ্য উৎপাদন করে, কলকারখানা গড়ে। কিন্তু মাতা গড়ে মানুষ। একটি মানুষের দাম একটি যন্ত্রের দাম হতে অনেক বেশি।

অনেক পিতা সারা জীবন পরিশ্রম করে গড়ে তোলে একটি শিল্প কারখানা। অপর দিকে ঘরে বসে মা গড়ে তোলে নেক সন্তান এবং আদর্শ মানুষ। পিতার কাজ অপেক্ষা মায়ের কাজের দাম পিতার দৃষ্টিতেও অনেক বড়।

কোন পিতাই ভাবতে পারে না যে, তার শ্রমে গড়ে তোলা শিল্প কারখানার মূল্য হবে নিজের সন্তানের মূল্য হতে বেশি, যদি না সে পিতা পাষণ্ড হয়।

পিতা অপেক্ষা মায়ের যে অতি মূল্যবান ভূমিকা, তা পালন করা সম্ভব, যদি মাতার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা এবং ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধি পায়।

আমাদের সমাজের অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সর্বত্র মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের প্রয়োজন আজ অত্যাধিক।

আসুন, আমরা সারা দেশে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন গড়ে তুলি এবং যার পক্ষে যেখানে যে স্তরেই সম্ভব, মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য চিন্তা ভাবনা করি এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেই।

নারীদের দ্বীনী শিক্ষার সুযোগ

প্রাথমিক যুগ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মেয়েদের জন্যে তো বটেই ছেলেদের জন্যও কোন প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল না। সাহাবায়ে কিরামের যুগে ইসলামী জ্ঞান চর্চার স্থান ছিল মসজিদ। মসজিদ নারী-পুরুষ সকলের জন্যে ছিল অবারিত দ্বার। যারা যত বেশি সময় মসজিদে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কাটাতে পারতো তারা ততো বেশি জ্ঞান অর্জন করতো। মসজিদের বাইরে জ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান স্থান ছিল পিতৃগৃহ বা ওস্তাদ গৃহ।

হিজরী ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে বাগদাদে উজিরে আজম নিজামুদ্দিন তুসির প্রচেষ্টায় নিজামিয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। সরকারী উদ্যোগে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয় বলে উলামায়ে কিরাম বাঁধা দিতে পারেননি। কিন্তু এর প্রতিবাদে শোক পালন করেন।

তাদের ধারণা ছিল, জ্ঞান চর্চা মসজিদের পরিবেশ হতে বাহির করা হলে এতে অপবিত্রতা এবং দুনিয়াদারী উদ্দেশ্যের সংযোগ হবে। তাঁদের সন্দেহ খুব বেশি অমূলক হয়নি। কিন্তু সময় এবং পরিবেশের তাগিদে মসজিদের বাইরে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবর্তন করতে হয়।

মসজিদের বাইরে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসাবে মাদ্রাসা স্থাপন শোকসন্তপ্ত উলামায়ে কিরামকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন তৎকালীন ইমামুল হারামাইন এবং হযরত আবু হামেদ আলী গাজ্জালীর (রঃ) উস্তাদ আহমদ জুয়াইনী (রঃ)।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে পুরুষদের জন্যে দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নারীদের জন্যে ব্যাপক হারে পৃথক মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

সাহাবাদের যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার সুযোগ ছিল কম, সমস্যা এবং প্রয়োজন ছিল আত্মরক্ষা ও সংখ্যাবৃদ্ধি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা দ্বীনদারদের মধ্যে শুরু হয় উমাইয়া, আব্বাসীয়াদের যুগে।

ইসলামের প্রচার যখন শুরু হয়, তখন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান চর্চা অনেকটা অসম্ভব ছিল। সারা আরবের মধ্যে মাত্র ১৯ জন লোক লেখাপড়া জানতেন। সেই অবস্থায় মাদ্রাসা স্থাপন কষ্টকর ছিল।

পরবর্তীকালে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। হযরত আবু হানিফা (রঃ) এর গৃহে যে গবেষণা ও শিক্ষা কেন্দ্র ছিল তা "ওস্তাদ গৃহ" শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে শুরু হলেও মাদ্রাসার রূপলাভ করে।

প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ যখন সৃষ্টি হয়েছে, তা শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত নয়। পুরুষদের জন্যে মাদ্রাসা স্থাপিত হবে কিন্তু মহিলাদের জন্যে স্থাপিত হবে না। এর অর্থ কি এই যে, মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার কোন অধিকার নেই?

যদিও বর্তমান মাদ্রাসাগুলো পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু মাদ্রাসায় যা শিক্ষা দেয়া হয়, সব কিছুই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা ইসলামী বিধি-বিধান, আইন-কানুন সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত।

মাদ্রাসায় শিক্ষার ফলে ইসলামের বিধি-বিধান, আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হলেও মাদ্রাসায় শিক্ষিত পুরুষরাও বর্তমান যুগের জীবন সংগ্রামে পরাজিত এবং পর্যদুস্ত। তাঁরা জীবন সংগ্রামে বর্তমান পরিবেশকে তাঁদের আয়ত্বাধীন করতে পারছেন না।

পরিণতিতে রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, সরকারী চাকুরী, সামরিক বিভাগ, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রায় সকল বিভাগ থেকে তারা অনেকাংশে বঞ্চিত ও নির্বাসিত।

ইন্টিগ্রেটেড ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এসব বিভাগেও 'উলামায়ে কিরাম নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

বর্তমানে মাদ্রাসা সিলেবাসে যা আছে তা পুরুষদের অপেক্ষা মহিলাদের জন্যেই অধিকতর উপযোগী। দায়সারা ভাবে মাদ্রাসা সিলেবাসের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে কিছুটা সংস্কার হয়েছে; এটাকে আরও ব্যাপকভাবে সংস্কার করে যুগের চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রয়োজন।

বর্তমানে নারীদের দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ

আমাদের সমাজে নারী শিক্ষার কী ধরনের সুযোগ আছে? নারী শিক্ষার জন্যে পৃথক অথবা সহশিক্ষার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। মহিলাদের জন্যে পৃথক মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা চলছে। কিন্তু মেয়েদের জন্যে ইসলামী শিক্ষার সুযোগ কী আছে? আলেম উলামা, পীর বুজর্গগণ নারীদের জন্যে দ্বীনী শিক্ষার কতটুকু সুযোগ সৃষ্টি করেছেন?

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্যে "কো-এডুকেশনঃ তথা 'কু'–এডুকেশন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রচলিত আছে। গ্রামে মাধ্যমিক স্তরেও ছেলে মেয়েদের এই 'কু'-এডুকেশন ব্যবস্থা আছে।

যেহেতু ফাজিল, কামিল পর্যায়ে মাদ্রাসাগুলোতে ছেলে-মেয়েদের এক সঙ্গে 'কু'-এডুকেশন ওলামায়ে কিরামগণ সমর্থন করবেন না, তাই তাদেরই উচিত মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের জন্যে অধিকতর উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসা।

শিক্ষা নারী-পুরুষ সকলের জন্যে সমভাবে ফরজ (হাদীস)। কিন্তু আমাদের দেশের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় শিক্ষা পুরুষের জন্যেই ফরজ।

ছেলেদের শিক্ষার জন্যে উলামায়ে কিরাম বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু নারী শিক্ষার জন্যে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সমভাবে এগিয়ে আসছেন না।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত পিতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পিতাকেই দেখা যায় মেয়েদের শিক্ষার প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল।

ছেলেদেরকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হবে কিন্তু মেয়েদেরকে পড়াবেন না, অনেক দায়িত্ব ও স্নেহশীল পিতামাতা এরূপ কল্পনা করতে পারেন না।

অনেক পিতা কন্যা সন্তানের জন্যে অনুভূতি অধিকতর প্রবল। মেয়ে যদি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো করে এবং আরও পড়তে চায়, তবে তাকে না পড়ানো একটি অমানবিক ব্যাপার, যদি পিতার তেমন কোন আর্থিক সমস্যা না থাকে।

আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদের অনেকেই সরকারী চাকুরী করেন না। বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে তারা সংসার দেখেন। চাকুরী না করলেও বোটানী, জিওলজীতে মেয়েরা মাষ্টারী ডিগ্রী নেয় কেন ? এর বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে।

বিয়ে হতে দেরী হলে শিক্ষিত বিত্তশালী পিতামাতা মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রাখতে চান না। তাতে অনেক ক্ষেত্রে বিয়ে দিতে অসুবিধা হয়। বয়স হয়েছে বিয়ে হয়না কেন? এরূপ প্রশ্ন পাত্র পক্ষের মনে জাগে। হয়তো মেয়ের কোন দোষ আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে থাকলে তখন পাত্র পক্ষের মনে এরূপ অহেতুক সন্দেহ কম হয়।

মেয়েদের মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ থাকলে অনেক পিতামাতাই তাদের মাদ্রাসায় পড়াতেন। বিশেষ করে যে সমস্ত পিতামাতা অফিস আদালতে, মিল কারখানায় চাকুরী করা পছন্দ করেন না। ইসলামী শিক্ষার সুযোগ এর অভাবে বহু মেয়েকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

মহিলা মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা

মূল্যবোধের ভিত্তি হতে পারে জ্ঞান, শিক্ষা, অজ্ঞতা, ভীতি, ভয় ইত্যাদি। অজ্ঞতার যুগে প্রাকৃতিক শক্তিসমুহ সম্বন্ধে ভীত হয়ে মানুষ সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদির পূজা করতো। সাপের ধ্বংসকারী শক্তি দেখে মানুষ সাপের পূজা করতো।

গরুর উপকারিতা লক্ষ্য করে গো-পূজা করতো। দীর্ঘজীবী মহা বৃক্ষ দেখে পূজা করতো। আজকালও মানুষ জ্বীন ভূত নিয়ন্ত্রণে সক্ষম পীর দরবেশদের ক্ষমতা দেখে তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে এবং পীর পূজা করে।

শিক্ষাভিত্তিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় শিক্ষিতদের মন মানসে। শিক্ষা ও শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বহু পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের পক্ষে নামাজ পড়া, রোজা রাখা সহজ। কিন্তু সুন্নাত দাড়ি রাখা বড় কষ্টকর। নামাজ পড়তে পড়তে অনেকের কপালে সেজদার কালো দাগ পড়ে যায়। কিন্তু দাড়ি রাখার প্রসঙ্গ উঠলেই তারা প্রশ্ন তুলবেন – ইহা কি ফরজ?

ফরজ না হলেও এমন কোন সাহাবী, উলামা, হাককানী অলী, বুজুর্গ মুর্শেদ পাওয়া যায় না যারা দাড়ি রাখেননি। যদিও ইংরেজী শিক্ষিতদের পক্ষে দাড়ি রাখা, সুন্নাতী লেবাস পড়া, গোল টুপি মাথায় দেয়া কঠিন, কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষিত ছাত্রদের পক্ষে উহা সহজ।

মহিলাদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ

মাদ্রাসা শিক্ষিত উলামায়ে-কিরাম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত সাহেবদের মধ্যে পারস্পরিক তর্ক বিতর্ক, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সাহেব স্যারদের মাথায় সুন্নাতী গোল টুপি না উঠলেও কিস্তি টুপি বা জিন্নাহ ক্যাপ উঠে, চিবুকে সুন্নাতী দাড়ি না উঠলেও মৌদী দাড়ি বা আলীগড়ী দাড়ি গজায়।

দেহে জোববা না উঠলেও পাঞ্জাবী শোভা পায়। কিন্তু নারীদের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষিতা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিতা নারীর কোন আদর্শিক সংঘাত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নেই। সেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষিত নারীদের একক দৌরাত্ম্য। কারণ নারীদের উচ্চতর পর্যায়ের মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ নেই।

পুরুষের পক্ষে নারীদের সঙ্গে তর্কে জিতা বড় কঠিন। বিশেষ করে যৌন সংগ্রামে দুর্বল স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে প্রভাবিত করা প্রায় অসম্ভব। হীনমনা স্বামী মাদ্রাসায় শিক্ষিতা অতৃপ্ত স্ত্রীকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষিত নারী আমাদের সমাজে বিরল।

মধ্য বয়সের পর আমরা অনেকেই ধর্মভীরু হয়ে পড়ি। তখন জায়নামাজের এবং তসবীহর সঙ্গে আমাদের অনেকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। কিন্তু একই সঙ্গে স্ত্রীদেরকে ধর্মভীরু করে তোলা সম্ভব হয়না।

মাগরীবের নামাজের পর স্বামী মহোদয় যখন তাসবীহ তাহলীল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন দেখা যায় স্ত্রী মনোরম সাজে সজ্জিত হয়ে পাড়া বেড়াচ্ছেন বা স্বগৃহে অতিথি আপ্যায়ন করছেন বা ভিসিআর দেখছেন।

মাদ্রাসায় শিক্ষিতা নারীগণ এরূপ ক্ষেত্রে পরিবারে আদর্শিক দ্বন্দ্ব নিরসনে এবং

জন্য গৃহিনীর মানস পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। মেয়েরা স্বভাবতঃ ধর্মপ্রবণ। এই ধর্ম প্রবণতার ভিত্তি ইসলামী জ্ঞান না হয়ে ভীতি ও লোভ হলে ভিত্তি দুর্বলই থেকে যায়।

দোয়া দরুদ এবং ফজিলতের বই পড়ে ধর্মীয় ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহ সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তাবিজ তুমার ঝাড়ফুঁক জাতীয় দোয়া দরুদে কাজ না হলে বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে।

মহিলাদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি স্বার্থেই তাদের জন্যে মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। প্রকৃতিগতভাবে দেখা যায় মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর ধর্মভীরু। কিন্তু মহিলাদের জন্য ধর্ম বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ না থাকার ফলে তারা হয়ে পড়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই অনেকক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় অনুভূতি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শিক্ষার অভাবে গোড়ামী সহজেই ধর্মের স্থান গ্রহণ করে।

বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে শিরক-এর যে মহাপ্লাবন, তার ধারক, বাহক অনেক ক্ষেত্রেই মহিলাগণ। তারা বিশ্বাসপ্রবণ বলে গাজাখুরী কাল্পনিক কাহিনী সহজেই বিশ্বাস করেন এবং শিশুদের কোমল হৃদয়ে তা স্থানান্তরিত করেন। মহিলাদের মধ্যে ধর্ম শিক্ষা বিস্তার লাভ করলে কুসংস্কারের অন্ধকার দূর হয়ে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে।

প্রিয় সহধর্মিনী

নারীকে শুধু আল্লাহ্ পুরুষের ভোগের সামগ্রী বা দাসী করে সৃষ্টি করেননি; বরং প্রিয় সঙ্গী করে সৃষ্টি করেছে, যাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে পারস্পরিক মমতা, দরদ, ভালবাসা। যাতে করে তারা একে অপরের মধ্যে নির্ভরশীল স্বস্তি শান্তি পেতে পারে। শিক্ষিত স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গী হলো শিক্ষিতা নারী। শিক্ষিতা নারী শিক্ষিত স্বামীকে বিপদে আপদে সাহায্য করতে পারে, প্রয়োজন বোধে পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারে।

পাশ্চাত্য শিক্ষিত এম.এ., এম.এস.সি. পাশ অথবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার যুবক একটি অল্প শিক্ষিত প্রাইমারী স্কুল পাশ মেয়ে বিয়ে করতে চাইবে না।

অনেক ছেলেই সমশিক্ষিতা স্ত্রী পছন্দ করে। তাতে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদান সহজতর হয়। সমশিক্ষিতা না চাইলেও তারা অন্ততঃ ডিগ্রী পাশ অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ মেয়ে চাইবে।

আজকাল স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ছেলেদের জন্য স্নাতক ডিগ্রী মেয়ে পাওয়া কঠিন নয়। মাদ্রাসা লাইনে যারা কামিল, ফাজেল, আলিম পাশ করেন, তাদের জন্য মাদ্রাসায় শিক্ষিত মেয়ে পাওয়া কঠিন। বালিকা/মহিলা মাদ্রাসা না থাকায় তাদেরকে বাধ্য হয়ে অল্প শিক্ষিত এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত পাশ মেয়ে বিয়ে করতে হয়, যারা কুরআনের অর্থ অনুধাবন করতে সমর্থ নয়। দ্বীনি এবং দুনিয়াদারী শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এরূপ নারীর সন্তানদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া অনেকটা কষ্টকর, কারণ তারা মায়ের কাছ থেকে ব্যাপক শিক্ষার ব্যাপারে তেমন কোন সাহায্যই পায় না। স্ত্রীরা অশিক্ষিত বলে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সন্তানেরা তুলনামূলকভাবে পিতা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই কম শিক্ষিত হয়।

পিতা এম.এ. পাশ এবং বি.এ. পাশ এরূপ পরিবারের সন্তানদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা এম. এ., এম.এস.সি. পাশ করা যতটুকু সহজ, পিতা কামিল পাশ ও মাতা প্রাইমারী পাশ এরূপ পরিবারের সন্তানের পক্ষে কামিল পাশ করা বা অনুরূপ পাশ করা বা অনুরূপ শিক্ষা পাওয়া অপেক্ষাকৃত কষ্টকর।

মাদ্রাসা শিক্ষিত ছেলেদের মাদ্রাসা শিক্ষিত স্ত্রী পাওয়ার স্বার্থে মহিলা মাদ্রাসার প্রসার অত্যাধিক প্রয়োজন।

মহিলা মাদ্রাসার গুরুত্ব

ইসলামী সমাজে নারীর মুখ্য ভূমিকা

ইসলামী সমাজে নারীর প্রধান ভূমিকা হলো আদর্শ সন্তান তৈরী করা, আদর্শ মানুষ গড়া, সুখী পরিবার গড়ে তোলা।

পুরুষ অর্থ উপার্জনে কল-কারখানা বা অফিস-আদালতে ব্যস্ত থেকে জাতীয় উন্নয়ন গড়ে তোলে, আর পরিবারে নারী গড়ে জাতির জন্য আদর্শ মানুষ। নারীরা হলো মানুষ গড়ার প্রাথমিক কারিগর।

পুরুষের সৃষ্ট যন্ত্রপাতি বা জিনিষপত্রের শেষ পরিণতি এ দুনিয়ায়। নারীর সৃষ্ট মানুষের শেষ পরিণতি হলো জান্নাতে। আর এই জান্নাত হলো মায়ের পদতলে।

সন্তানের চরিত্র, আখলাক এবং মানস গঠন মায়ের জন্য ফরজ। মায়ের দায়িত্ব হলো নেক সন্তান গড়া এবং মানুষ করা। মুসলিম মহিলারা ইসলামের সোনালী যুগে টাকা রোজগার করে স্বামীকে সাহায্য করেন নি। কিন্তু তারা এমন সোনার সন্তান গড়ে ছিলেন, যারা সমকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

আদর্শ মাতা হযরত আসমা (রাঃ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) উমাইয়া সুলতান আবদুল মালেকের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অসম যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে মায়ের দোয়া নিতে এসেছিলেন। তাঁর মাতা হযরত আসমা (রাঃ) ছিলেন হযরত আয়শা (রাঃ) এর ভগ্নি।

যুদ্ধ সাজে সজ্জিত বর্ম পরিহিত পুত্রকে দেখে মায়ের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সন্তানকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন – তার উদ্দেশ্য কি বিজয় না শাহাদাত ?

সুলতান আবদুল মালিকের বাহিনী এতো বিরাট ছিল যে ঐ অসম যুদ্ধে বিজয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। মাতা হযরত আসমা (রাঃ) এবং পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) দু'জনেই এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) জানালেন যে, তিনি শাহাদাত এর জন্যেই যুদ্ধে যাচ্ছেন। মা তখন জিজ্ঞাসা করলেন শাহাদাতই যদি তোমার লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে তুমি বর্ম পরিহিত কেন ? আত্মরক্ষার এতো প্রস্তুতি কেন ? তোমার বর্ম খুলে ফেল।

বর্ম খুলে ফেললে শাহাদাত ত্বরান্বিত হবে এবং প্রতিপক্ষের লোকবল কম ক্ষয় হবে। যদি প্রতিপক্ষ মুসলিম হয়, তবে তাদের রক্তক্ষয় যতো কম হবে ততোই তো মঙ্গল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মায়ের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বর্ম খুলে ফেললেন। মা তখন পুত্রকে কাছে ডেকে মাথা কোলে নিয়ে বহুক্ষণ আদর করলেন এবং পুত্রের শাহাদাত হাসিলের জন্যে দোয়া করলেন।

আদর্শপ্রবণ মায়েরা বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষিত মায়েদের চেয়ে মানব সভ্যতার উন্নয়নে অনেক বেশি অবদান রাখতে পারেন। মায়ের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো আদর্শ সন্তান গড়ে তোলা। আদর্শ সন্তান গড়ে তোলার জন্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা অপেক্ষা ইসলামী আদর্শমূলক শিক্ষাই অনেক বেশি কার্যকরী এবং প্রাসঙ্গিক।

সন্তানদের ইসলামী মানস গঠন

মুসলমানদের গৌরবময় যুগে বাবা মা দু'জনেই দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। বর্তমানে মাতা পিতা উভয়েই অধিকাংশ শিক্ষিত পরিবারে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত।

কাঁঠাল গাছে আম উৎপাদন হয় না। ঠিক তদ্রূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মাতা-পিতার সন্তান পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ভাবাপন্ন না হয়ে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এরূপ আশা করা যায় না। ২/১টি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম সেটা স্বতন্ত্র।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মায়েদের সন্তান যে ধর্মীয় মূল্যবোধে উদাসীন এবং পাশ্চাত্য মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এটা স্বাভাবিক।

অশিক্ষিত মায়েরা নানা কারণে সাধারণতঃ অধিকতর ধর্মপরায়ণ হন। কিন্তু বাস্তববাদী পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আধুনিক শিক্ষিতাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার অবক্ষয় হতে থাকে। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মেয়ের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ কষ্টকর।

শিশু মানস ও চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট সময় হলো দশ বছর বয়সের পূর্বকাল। এ সময়ে শিশুরা পিতা অপেক্ষা মাতার সান্নিধ্যই বেশি পেয়ে থাকে। মাতা যদি খাঁটি ঈমানদার হন, শিশুর অবচেতন মনেও এর কিছুটা প্রভাব পড়ে।

সন্তান মায়ের কাজ অপছন্দ করতে পারেনা। যে শিশু মাকে রোজা রাখতে, তাসবীহ টিপতে এবং নামাজ পড়তে দেখেছে, ঐ শিশু পরবর্তী বয়সে পরিবেশগত কারণে নাস্তিক বা কম্যুনিষ্ট হলেও অমানুষ না হলে ধর্মের প্রতি খুব বেশি অসহনশীল হতে পারে না।

কারণ, যে নিজের মাকে যা করতে দেখেছে, তা মন থেকে অপছন্দ করতে পারে না, যদিও ধর্মের বিরুদ্ধে বিরাট বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করে থাকে।

মায়ের কোন কাজকে সন্তান অযৌক্তিক এবং অবিবেচনা প্রসূত ভাবতে পারে কিন্তু মনে প্রাণে বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না।

মুসলিম ছেলে নাস্তিক হলে তাকে মুসলিম নাস্তিক এবং হিন্দুরা কম্যুনিষ্ট হলে তাকে হিন্দু কম্যুনিষ্ট বলা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিক বা কম্যুনিষ্ট হওয়া তাদের পক্ষে কষ্টকর।

পরবর্তীকালে ধর্ম বিশ্বাস সম্পূর্ণ শিথিল হয়ে গেলেও কোনো গোড়া ধর্মীয় চেতনা সম্পন্ন পরিবারের সন্তান ধর্ম বদল অথবা ধর্মের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

বহু চেষ্টা তদবির, সংগ্রাম সাধনার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতায় নাম লেখার পদ্ধতি রহিত হয়ে শুধুমাত্র রোল নাম্বার লেখার পদ্ধতি চালু হয়। মুসলমানদের সব সময় অভিযোগ ছিল যে পরীক্ষকগণ বেশির ভাগ হিন্দু হওয়ায় মুসলমান পরীক্ষার্থীদেরকে মার্ক কম দেন।

হিন্দু মার্ক্সিষ্ট কম্যুনিষ্ট জ্যোতিবসুর পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানদের তীব্র বিরোধীতা সত্ত্বেও পুনরায় পরীক্ষার খাতায় নাম লেখার পদ্ধতি চালু করেছে। পরিণতিতে মুসলিম ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়েছে। বিরল প্রতিভাবান না হলে মুসলমান ছেলেদের পক্ষে প্রথম বিভাগে পাস করা সম্ভব হয় না।

বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের সন্তানদের ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। সন্তানদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা যাতে সৃষ্টি হয় আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি, দান ছাদ্‌কাহে দিই, রোজা রাখি। এগুলো খুবই ভাল এবং করা উচিৎ, কিন্তু আমাদের সমস্যা সমাধান অতি সহজেই হয়ে যায়, যদি আমরা মেয়েদেরকে মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি। অশিক্ষিতা ধর্মপরায়ণ মায়ের প্রভাব অপেক্ষা শিক্ষিতা ধর্মপরায়ণ মায়ের প্রভাব সন্তান এর উপর অনেক বেশি।

আজকাল ছেলে-মেয়েরা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যুক্তিবাদী হয়ে পড়েছে। যুক্তি ছাড়া কোন কিছু বিশ্বাস করতে তারা অনাগ্রহী। ধর্মের অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করা যায় না।

যুক্তি বিশ্বাসকে মজবুত করে। যুক্তি শিথিল বিশ্বাসকে একিনে পরিণত করে। যদি কোন মা বিভিন্ন উদাহরণ এবং যুক্তি দিয়ে সন্তানকে কোন বিষয়ে বুঝাতে পারেন, তবে তার প্রভাব সন্তানের উপর অনেক বেশি হবে।

ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণও নারী শিক্ষার ব্যাপারে অত্যধিক উদাসীন। তারা বালিকা মাদ্রাসা এবং মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের জন্যে সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে আসছেন না। ফলে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নারীগণ অনেক পিছনে পড়ে আছে।

আমাদের বংশধরদের ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্যে হায় হুতাশ না করে যদি আমরা আমাদের চিন্তা, ফিকির শ্রম ও মেধা বালিকা মাদ্রাসা এবং মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনে নিয়োজিত করতে পারি, সমস্যা সমাধান অনেক সহজ হবে। কিন্তু গঠনতান্ত্রিক এই দিকটি সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ, নেতা, কর্মী এবং মোহাদ্দিসগণ এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন বলে মনে হয়।

মহিলা মাদ্রাসার যে প্রয়োজন আছে এ সম্পর্কে আলোচনা কালে তারা তা জোরালো ভাবেই স্বীকার করেন; কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আর অধিক অগ্রসর হতে চান না।

মেয়েদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্যে বেগম রোকেয়া যে শ্রম এবং সাধনা নিয়োগ করেছিলেন, মহিলা মাদ্রাসার জন্যে অনুরূপ ত্যাগ ও তিতীক্ষার প্রয়োজন আছে। নৈতিক এবং ধর্মীয় অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে এর প্রয়োজন আরো অনেক বেশি।

নারীদের মধ্যে ইসলাম বিরোধী আন্দোলন

পাশ্চাত্য শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে বিভিন্ন সময় ইসলাম বিরোধী কথা বলতে শুনা যায়। বস্তুতান্ত্রিক দর্শনে প্রভাবিত ইংরেজী শিক্ষিত নারীরা ইসলাম বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করেন। তারা ইসলাম বিরোধী সভা সমিতি করেন, প্রশেসন করেন, পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেন। মাদ্রাসা শিক্ষিতা মহিলার অভাবহেতু ইসলামিক চেতনা সম্পন্ন মহিলাদের পক্ষে কোন আন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। মহিলাদের সঙ্গে ইসলাম সম্বন্ধে কথা বলা মহিলাদের পক্ষেই সহজতর। মাদ্রাসায় শিক্ষিত পুরুষেরা সাধারণতঃ ইসলাম বিরোধী হয় না। আশা করা যায় মাদ্রাসায় শিক্ষিত মেয়েরাও ইসলাম বিরোধী হবে না।

মহিলা মাদ্রাসার উপকারিতা

নারী শিক্ষা ও নারীর মর্যাদা

আমাদের সমাজে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম, হাফেজ, ক্বারী ও ইমামদের প্রতি সাধারণ মানুষ খুবই শ্রদ্ধাশীল। তাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার অসৎ প্রকৃতির লোকেরাও সাধারণত কিছুটা কম করে থাকে।

শুধু নামাজে নয়, পথ চলার সময়ও লোকজন তাঁদেরকে সামনে এগিয়ে দেয় এবং আগে সালাম দেয়। আশা করা যায় মাদ্রাসায় শিক্ষিতা মহিলারাও জনসাধারণ থেকে অনুরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে থাকবেন।

মাদ্রাসায় শিক্ষিত মহিলাদের প্রতি শুধু যে বাহিরের লোকেরাই সম্ভ্রমশীল হবেন, তা নয়, স্বামীরাও তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

একজন আলেমা স্ত্রীর প্রতি শারীরিক নির্যাতন ও জুলুম করলে আল্লাহ্ বেজার হবেন এবং গুনাহ্ বেশি হবে এ ভয়েও অসংযমী স্বামী মাদ্রাসা শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রতি সহনশীল ও সংযমী হতে পারেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা ও সরল জীবনযাপন

শিক্ষিত সমাজের সবচেয়ে গরীব অংশ হলো মাদ্রাসা শিক্ষিত ‘ওলামায়ে কিরাম। ‘আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষিত বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বহুসংখ্যক ওলামায়ে কিরাম আছেন যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের তুলনায় লেখাপড়ায় কম সময় ব্যয় করেননি।

তাঁরা ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন না। হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে সুদে ঋন নিয়ে বাড়ি করতে পারেন না। ইংরেজী তেমন জানেন না বলে সরকারী চাকুরীও করতে পারেন না। ফলে অতি অল্প আয়ে কায়ক্লেশে তাঁরা জীবনযাপন করেন।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রদর্শনী ক্ষেত্রে এখনও মাদ্রাসা শিক্ষিতগণ প্রভাবিত হননি। আমাদের সমাজে তাঁরাই সবচেয়ে অল্পে তুষ্ট।

আশা করা যায় মাদ্রাসা শিক্ষিতা মহিলারাও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষদের ন্যায় অল্পে তুষ্ট থাকবেন। তাঁদের মধ্যে বৈষয়িক সম্পদ ও বিত্তের প্রতিযোগিতা তুলনামূলকভাবে কম হবে। তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্যে স্বামীদের সদুপায়ে অর্থ রোজগার করতে তেমন হয়তো হবে না, বরং তাঁরাই অসদুপায়ে অর্থ রোজগারে স্বামীদের নিরুৎসাহিত করতে পারবেন।

নারী শিক্ষা ও সুখী পরিবার

পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মেয়েরা অর্থ রোজগার করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করবে এবং সুখী পরিবার গঠন করবে।

চাকুরী লাভের জন্যে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীবন রসায়নবিদ্যা, ফার্মাকোলোজী, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা,

কৃষিবিদ্যা, পশুপালন বিদ্যা, মৎস্য চাষ বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক এবং সুবিধাজনক।

অনেক মাতা পিতাই মেয়েকে চাকুরীর উপযুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান না। অনেক স্বামী উচ্চ শিক্ষিত স্ত্রী চান, কিন্তু স্ত্রী অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করুক, তা চান না। তারা মনে করেন স্ত্রী শিক্ষিতা হলে সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব বেশি হবে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে স্ত্রী সন্তানের গৃহ শিক্ষকের কাজও কিছুটা করতে পারবেন।

যদি সুখী পরিবার এবং ঘর সংসার করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি অপেক্ষা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিশু মনস্তত্ত্ব এবং দ্বীনী শিক্ষাই অধিক প্রাসঙ্গিক এবং উপকারী হতে পারে।

সুখী পরিবার গঠন যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে সন্তানের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের উন্মেষ এবং সুন্দর চরিত্র গঠন যে শিক্ষার মাধ্যমে বেশি হতে পারে সেই শিক্ষাই মায়ের জন্যে প্রাসঙ্গিক হয়।

আমাদের সমাজে বর্তমান ধর্মীয় অনুভূতি এবং নৈতিক চেতনার অবক্ষয়ের একটি অন্যতম কারণ হলো নারীদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।

নারীদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রবর্তন করতে পারলে পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু কুফল এবং মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। মায়েদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি সম্ভব হলে সন্তান এর মধ্যে উক্ত মূল্যবোধের প্রসার অতি সহজ হয়।

বর্তমান সামাজিক এবং নৈতিক প্রেক্ষাপটে ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের জন্যে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকতর প্রয়োজন বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

নারী শিক্ষা ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি

বহু পাশ্চাত্য শিক্ষিতা নারী চাকুরী করে বা ব্যবসা বাণিজ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করছেন এবং বর্তমান দুর্মূল্য বা অভাব অনটনের যুগে বিপন্ন অর্থনৈতিক বোঝা কিছুটা লাঘব করেছেন অথবা সচ্ছল জীবনযাপনে মূল্যবান অবদান রাখছেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে অর্থ রোজগার করে সচ্ছল ও অভাবহীন জীবনযাপন করা হয়ত সম্ভব কিন্তু সুখী সংসার গড়ে তোলা কতটুকু সম্ভব সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

স্বামী ও স্ত্রী যৌথ আয়ের সংসারে বিত্তের প্রাচুর্য থাকতে পারে কিন্তু শান্তি কতটুকু আছে ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যান্যদের পক্ষে বুঝা কষ্টকর।

সারাদিনের কর্মক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে গৃহে ফিরে স্ত্রীকে কাছে পাওয়ার আনন্দ যে কতো এবং না পাওয়ার ব্যথা যে কত গভীর, ভুক্তভোগী ছাড়া এ ব্যথা কেউ বুঝতে পারবে না। যা হোক, এ বিষয়টি বিতর্কমূলক।

পাশ্চাত্যের আদর্শে আমাদের দেশেও অনেক স্বামী উপার্জনকারী স্ত্রী চায়। কিন্তু পাশ্চাত্যের শতকরা ষাটভাগ বিয়ে যে তালাকে পরিণতি লাভ করে এবং পরস্পরের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত বহু নারী ও পুরুষ বিচ্ছিন্নর একক জীবনযাপন করতে বাধ্য হয় সে দিকে দৃষ্টি আমাদের কমই পড়ে।

পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে নারীর অর্থনৈতিক অবদান বা অপদানের বিতর্কে না গিয়েও অন্ততঃ এটুকু বলা যায় যে ইসলামী সমাজে পরিবারের ব্যয় নির্বাহে নারীর কোন প্রকার অর্থনৈতিক দায় দায়িত্ব নেই।

স্ত্রী এবং সন্তানের সকল ব্যয়ভার বহন করার একমাত্র দায়িত্ব হলো গৃহকর্তা। স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা করা পরিবারের কর্তার উপর ফরজ। কিন্তু স্ত্রীর জন্যে ফরজ, ওয়াজিব তো নয়ই, সুন্নাতে মোয়াক্কাদাও নয়। বড়জোর মোস্তাহাব বলা যেতে পারে। তবে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে মেয়েদের জন্যে সুনির্দিষ্ট ফরজ কর্তব্য ছিল।

উত্তরাধিকার সূত্রে মাতাপিতার সম্পত্তির অংশ হিসেবে যা কিছু স্ত্রী পেয়ে থাকে, তাতে তার একক অধিকার। এতে স্বামীর কোন অধিকার নেই। স্ত্রী যদি দয়াপরবশ হয়ে স্বামীকে বা স্বামীর সংসারে কিছু ব্যয় করতে চায়, তা হলো তার উদারতা এবং মহত্ব।

উপার্জনশীল স্ত্রী হওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামী সমাজের নারী শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। নারী ভরণ পোষণের জন্যে স্বামীর উপর নির্ভর করবে এটাই স্বাভাবিক। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা থেকে চাকুরী করে (রোজগার করে) পরিবার পরিচালনা করার নিয়ম ও আদর্শ ইসলামী সমাজে ছিল না।

নারী বা পুরুষ যে বয়সেরই থাকুক না কেন অবিবাহিত থাকা ইসলামের দৃষ্টিকোণ হতে কাঙ্খিত নয়। স্থানীয় এবং আঞ্চলিক মূল্যবোধের কারণে বিকল্প ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে।

পাশ্চাত্যের অন্যতম দার্শনিক জর্জ বার্নাড'শ বলেছেন যে, পারিবারিক কাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্যে স্বামীর উচিত স্ত্রীদেরকে মাসিক বেতন দেয়া।

পাশ্চাত্য সমাজ অপেক্ষা ইসলামী সমাজে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিকটতম। ইসলাম নারীকে কর্মচারী হিসেবে বেতন পাওয়ার অধিকার দেয়নি। কিন্তু নারীর প্রতিপালন ও প্রয়োজন মিটাবার সার্বিক দায়িত্ব পুরুষকে দিয়েছে।

ভরণ পোষণ এবং পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে নারী পুরুষের উপর নির্ভর করবে ইহাই হলো ইসলামী সমাজের সাধারণ নিয়ম।

তবে কোন নারী যদি কর্মক্ষম হন এবং দু'দিক সামলাতে পারেন, তবে পারস্পারিক আলোচনা ক্রমে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এটা হারাম নয়।

হযরত খাদিজা (রাঃ) এর অসাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য করার প্রতিভা ছিল। এরূপ বিরল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ইসলামী সমাজে স্বীকৃত। হযরত খাদিজা (রাঃ) এর বিত্ত সম্পদ ইসলাম প্রচারের কাজেই অকাতরে ব্যয় হয়।

ইমাম আবু হানিফার জীবনে কন্যার প্রভাব

হানাফী মাজহাবের ইমাম আজম হযরত আবু হানিফার (রঃ) জীবন সাধনায়ও তার কন্যার অর্থনৈতিক ভূমিকা ছিল।

হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু হানিফার মূল নাম কিন্তু আবু হানিফা ছিল না। তাঁর নাম ছিল নোমান এবং পিতার নাম সাবিত। তার কন্যার নাম ছিল হানিফা।

একদিন কন্যা পিতার জন্যে খাবার পরিবেশন করে পিতাকে আহ্বান করেন। কিন্তু, পিতা নোমান (রঃ) গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রশ্নটা ছিল কুকুর সম্বন্ধে। মেয়ে খাবার জন্যে বার বার তাগিদ দিচ্ছেলেন। বাবা জানালেন যে তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করে বের করতে পারছিলেন না। অত কঠিন কি প্রশ্ন হতে পারে যার জবাব ইমাম আবু হানিফা (রঃ) জানেন না, ইহা ভেবে কন্যা

আশ্চর্য হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন প্রশ্নটি কি ? প্রশ্নটি কন্যাকে জানানো হলো। কন্যা বললেন যে, ঐ প্রশ্নের জবাব তিনি জানেন। বাবা প্রশ্নটির জবাব জানতে চাইলেন। কন্যা বললেন, তার জবাব যদি সঠিক হয় তা'হলে বাবা মেয়েকে কি দিবেন ?

ইমাম জানাতে চাইলেন যে, কন্যা হানিফা কি চান ? কন্যা জানালেন তার দাবী দু'টি। প্রথমতঃ পিতা আর বিলম্ব না করে খাবার খাবেন। দ্বিতীয়তঃ পিতা নিজের নাম বাদ দিয়ে 'আবু হানিফা' নামে পরিচিত হবেন অর্থাৎ 'হানিফার বাবা' এই নামে নিজেকে পরিচয় দিবেন। স্নেহময়ী কন্যাকে খুশী করার জন্যে পিতা সানন্দে রাজী হবেন এবং এরপর তিনি চিঠিপত্রে 'আবু হানিফা' এ নামে স্বাক্ষর করতেন এবং নিজেকেও আবু হানিফা অর্থাৎ 'হানিফার বাবা' নামে পরিচয় দিতেন।

কালক্রমে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মূল নাম নোমান বি সাবিত চাপা পড়ে গেল এবং তিনি আবু হানিফা (রঃ) নামে বিশ্ব মুসলিমের নিকট পরিচিত হলেন।

ইমাম আবু হানিফার (রঃ) কন্যা প্রোথিতযশা বিদুষী হিসেবে না হলেও এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি অনেক সময় এমন প্রশ্নের জবাব জানতেন যা ইমাম আবু হানিফা (রঃ) নিজেও জানতেন না। পিতা আবু হানিফার (রঃ) স্বাস্থ্য সংরক্ষণে এবং তাঁর শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কন্যা হানিফার বিশেষ অবদান ছিল। ইমাম আবু হানিফার (রঃ) মাদ্রাসায় কয়েকশত ছাত্র ছিল। তাদের সমস্ত ব্যয় তিনি নিজে বহন করতেন। এর জন্যে কারো নিকট থেকে চাঁদা নিতেন না।

তাঁর মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যা কারো কারো মতে পাঁচ শতেরও বেশি ছিল। ঐ সব খরচ আসতো ইমাম আবু হানিফার (রঃ) বস্ত্র কারখানা এবং বস্ত্র আমদানী, রপ্তানী ব্যবসা থেকে।

সুদূর খোরাসান হতে উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল বিস্তৃত ছিল ইমাম আবু হানিফার (রঃ) বস্ত্র কারখানা ও বস্ত্র আমদানী-রপ্তানী-ব্যবসা, বাণিজ্য। ঐ সব ব্যবসা, বাণিজ্যের তদারকি অনেক সময় কন্যা হানিফা করতেন।

শিক্ষা ও নৈতিকতা

শিক্ষার সঙ্গে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধদের মধ্যে যেরূপ অর্বাচীনতা ও বেহায়াপনা দেখা যায়, মাদ্রাসায় শিক্ষিত ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। তাদের মধ্যে অধিকতর সংযম বোধ পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশ্যে ফাহেশা কাজে তারা সংকুচিত।

আমাদের দেশে অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে পর্দা একরূপ নেই বললেই চলে। গ্রামে যেরূপ খোলামেলা চলাফেরা তারা করেন, গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করতে এসে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সেরূপ উগ্র গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।

মাদ্রাসায় শিক্ষিত হলে তাদের মধ্যে শালীনতা জ্ঞান অধিকতর হবে এবং সহকর্মীদের সুন্দর পরিবেশ রক্ষায় তারা প্রভাবিত করতে পারবে।

মহিলা মাদ্রাসা ও নারী নির্যাতন

মহিলাদের অনাবৃত দেহাংশ অনেক পুরুষের মনে অনাকাঙ্ক্ষিত কামনার উদ্রেক করে। রিপুর তাড়নায় মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়।

আশা করা যায় যে মাদ্রাসায় শিক্ষিত মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছদে অধিকতর শালীন হবে। অসংযত আচরণ এবং অশালীন পোষাক, পরিচ্ছদের জন্যে যে সমস্ত অনাচার ও নারী নির্যাতন হয়ে থাকে, মাদ্রাসা শিক্ষিত মেয়েদের উপর তা হয়তো কিছুটা কম হতে পারে।

খৃষ্টান মিশনারী সিস্টারদের শালীন পোষাক, পরিচ্ছদ শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করে। মাদ্রাসা শিক্ষিতা মেয়েরাও যদি অনুরূপ পোষাক, পরিচ্ছদ পরিধান করেন, তবে তারাও অনুরূপ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম পেতে পারেন।

স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি

১৯৭০ সনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাক্ষরতার হার ছিল ১৯%। ১৯৮৮ সনের স্বাক্ষরতার হার ২৪% অথবা ২৫%। দেড়যুগে স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬%। অর্থাৎ স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ০.৩%। এই হারে দেশের বাকী শতকরা ৭৫ জনকে শিক্ষিত করতে ২৫০ বৎসর পয়োজন হবে।

বর্তমানে স্বাক্ষরতা বৃদ্ধিতে পুরুষদের ভূমিকাই মুখ্য। দেশব্যাপী বালিকা মক্তব বৃদ্ধির মাধ্যমে যদি মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে নেয়া যায়, পরবর্তী জেনারেশন নিরক্ষর থাকবে না। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির স্বার্থে বালিকা মক্তব ও মহিলা মাদ্রাসা প্রয়োজন।

মহিলা কেন্দ্রিক সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র

সমাজের মাদ্রাসা শিক্ষিত মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মহিলা কেন্দ্রিক সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এ সমস্ত কেন্দ্র পাড়াভিত্তিকও হতে পারে।

মহিলা কেন্দ্রিক সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ ও সুব্যবস্থা হতে পারে। মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মহিলা পাঠাগার, মহিলাদের উদ্যোগে প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিকা, পর্দানশীন মহিলাদের স্বাস্থ্যসম্মত শরীরচর্চা ইত্যাদির সুযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে।

মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষার সুফল

মহিলা নেতৃত্ব

মাদ্রাসা শিক্ষিত মহিলারা সমাজে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ কলুষমুক্ত হবে, অনাচার কমবে।

পাশ্চাত্যের একজন রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্ট একবার জনসমক্ষে বলেছিলেন যে, "তোমরা যদি আমাকে উৎকৃষ্ট মা দাও, তবে আমি তোমাদের উৎকৃষ্ট জাতি উপহার দিব।" নৈতিক অবক্ষয় রোধে মহিলারা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

মহিলা বক্তা এবং ওয়ায়েজীন

মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে নিজস্ব জ্ঞান বিতরণের প্রবণতা পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের অপেক্ষা অনেক বেশি। জ্ঞান বিতরণে যে অশেষ পূণ্য রয়েছে তা মাদ্রাসা শিক্ষিতগণ মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন।

ফিজিক্স/কেমিষ্ট্রিতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সভা, সমিতিতে দাঁড়িয়ে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেছেন, তা জনগণকে অবহিত করতে ততটুকু আগ্রহী নন, যতটুকু দেখা যায় একজন কামেল পাশ মাওলানাকে। দু'জনের শিক্ষার সময়কাল প্রায় একই।

ভূগোল বা অংক শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী একজন এম.এস.সি. তাঁর লব্ধ বিদ্যা বিতরণের জন্য সুযোগ পেলেই দাঁড়াবেন না। অথচ দশ বছরের মাদ্রাসা শিক্ষিত একজন আলেম এ ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী।

প্রচুর সরকারী অর্থ ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরেজী, বাংলা শিক্ষিতদের শতকরা একজনও জাতীয় সঙ্গীত মুখস্থ বলতে পারবেন না অথচ মাদ্রাসা শিক্ষিতগণ সম্পূর্ণ নিরক্ষরদের কুরআনের বহু সংখ্যক সূরা মুখস্থ করিয়ে দেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে তাদের লব্ধজ্ঞান প্রচারের প্রবণতা অনেক বেশি। মহিলারা যদি মাদ্রাসায় শিক্ষিত হন, তবে তাদের আয়ত্ত্ব জ্ঞান বিতরণের প্রবণতা তেমনি অধিকতর হবে।

আজকাল মহিলাদের মধ্যে দ্বীন সম্বন্ধে ওয়াজ করার জন্য পুরুষ বক্তা আহ্বান করতে হয়। মহিলা মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মহিলাদের মধ্যে বহু ওয়ায়েজীন সৃষ্টি হবে। যাঁরা মহিলাদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে বয়ান করতে পারবেন।

মক্তব পরিচালনায় নারীদের ভূমিকা

আমাদের দেশে প্রায় দুই লক্ষ মসজিদ আছে এবং সকল মসজিদের সঙ্গেই মক্তব সংযুক্ত ছিল। ইদানীং মক্তবের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

মসজিদ মহল্লার লোকেরা একজন মক্তব শিক্ষককে মাসিক নগদ ভাতা দেড়শত টাকাও দিতে পারে না। এই অল্প টাকায় একজন পুরুষের পক্ষে পরিবার প্রতিপালন করা

নয়। অতীতে যে সমস্ত ধর্মপ্রাণ ক্বারী ও হাফেজগণ কায়ক্লেশে মক্তবের শিক্ষকতা করতেন, তাঁরা জীবনযাত্রার জটিলতা বৃদ্ধির কারণে অন্য পেশার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদেরকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করে মক্তব পরিচালনার উপযুক্ত করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। মক্তব থেকে যে বাড়তি আয় হবে, তাতে বহু মহিলা নিজ মহল্লার মক্তব শিক্ষক হতে রাজী হবেন। এ জন্য প্রয়োজন প্রথমে মহিলাদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

বর্তমানে প্রাইমারী স্কুলে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের জোর প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক স্কুল নেই।

গাঁয়ে গিয়ে যদি কোন মহিলা প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারেন, তবে নিজ মহল্লায় শিক্ষকতা করতে তাঁদের আপত্তি থাকার কথা নয়।

মিলাদ মাহফিল পরিচালনা

সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈনদের সময় যদিও মিলাদ প্রচলিত ছিল না কিন্তু উপমহাদেশে এটা ইসলামী সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। মিলাদ মাহফিলকে হাক্কানী উলামা-ই-কিরাম বেদাআত বলে ত্যাগ করতে চান কিন্তু চাইলেই এটা ত্যাগ করা যাবে না। তাই মিলাদকে মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে মেনে নেওয়াই ভালো। মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষিকাদেরকে অবশ্যই মিলাদ পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে। দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা ও মিলাদ পরিচালনার প্রতি প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

মহিলা বিশেষজ্ঞ

মহিলাদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার অবারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে মহিলা শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ আছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে মহিলাদের অবদান অতি ব্যাপক। মহিলা চিকিৎসকগণ পুরুষদের ন্যায় সমযোগ্যতার অধিকারী। প্রশাসনিক উচ্চ পদেও মহিলাদেরকে দেখা যায়।

সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকলার ক্ষেত্রে রয়েছে মহিলাদের পদচারণা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি লক্ষণীয় নয়। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলা বিশেষজ্ঞরা যদি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন, তবে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা ও অবদানের সুযোগ থাকা উচিত। মহিলাদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত করা সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত নয়।

মহিলা শিল্পপতি

ইদানীং গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রীতে হাজার হাজার মহিলা আকৃষ্ট হচ্ছেন। পুরুষের মালিকানা এবং পুরুষ কর্মকর্তাদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন বহু গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রীতে বহু অনাচার প্রবেশ করছে।

মাদ্রাসা শিক্ষিত মহিলারা ফ্যাক্টরীতে চাকুরী পেলে মহিলাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ হবে। মাদ্রাসা শিক্ষিত মহিলারা ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋন নিয়ে মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবেন, যার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে মহিলা, যার কর্মচারীরাও হবে মহিলা। মহিলা মালিকানাধীন ঔষধ তৈরীর কারখানা, ছাপাখানা, আরো বহু ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে।

মহিলাদের গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরীতে চাকুরী বন্ধ করা যাবে না। তাই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর মালিক, পরিচালক মহিলাদের মধ্য থেকে হলে অনাকাঙ্খিত অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে।

মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষামান

মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষার মান অবশ্যই উন্নত করতে হবে। মাদ্রাসাগুলোতে আরবী শিক্ষার মান এত নিম্নে এবং চর্চা এত কম যে, খুব কম উলামায়ে কিরাম আরবীতে পুস্তক রচনা করা, রিপোর্ট লেখা এবং ভাব বিনিময় করতে পারেন। মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে বই থাকে খুব কম। শিক্ষার উপকরণ খুবই স্বল্প।

ছাত্রদের বেতন অনেক ক্ষেত্রেই ফ্রি। তদুপরি কর্তৃপক্ষই লিল্লাহ বোর্ডিং-এ ছাত্রদেরকে খাদ্য পরিবেশন করে থাকেন। এক্ষেত্রে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ হয়না।

মহিলা মাদ্রাসায় আমরা দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ছাড়াও মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের কন্যা সন্তানদের আকর্ষণ করতে চাই। মহিলা মাদ্রাসা লেখাপড়ার মান হতে হবে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং কিন্ডারগার্টেন টাইপ।

ছাত্র বেতন হবে চড়া। আজকাল কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য পিতামাতা অর্থ ব্যয় করতে তেমন পরান্মুখ নন। তবে যেখানে ছাত্র হবে গরীব পিতামাতার সন্তান, সেখানে ব্যবস্থা অন্যরূপ হতে পারে।

পাবলিক স্কুল টাইপ মহিলা মাদ্রাসা

ভারত বিভাগের পর বিগত ৪০ বছরে এদেশে বেশ মজবুত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে। বাংলাদেশ হওয়ার পরে এ ধারা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য অনেক পিতামাতা ছেলেদেরকে তো বটেই এমনকি মেয়েদেরকে শিলং দেরাদুনস্থ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে লেখাপড়া করতে পাঠান। যারা ইসলামী চেতনাসম্মত উচ্চবিত্ত তাঁরাও সুবিধাজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না পেয়ে মেয়েদের বিদেশে পাঠাতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশের আরবী মাধ্যমের পাবলিক স্কুল টাইপ মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের স্কোপ আছে। উন্নতমানের স্কুল প্রতিষ্ঠা হলে বর্তমানে যারা বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (১৯৮৫) ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে বা অন্যান্য স্কুলে-কন্যা সন্তান লেখাপড়া করতে পাঠান, সেখানে হয়তো নাও পাঠাতে পারেন।

প্রয়াত রনদা প্রসাদ সাহা তার মায়ের নামে প্রতিষ্ঠা করেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টের একটি প্রতিষ্ঠান হলো মির্জাপুর ভারতেশ্বরী হোম, যা নারী শিক্ষার জন্য একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান এবং ইহা পরিচালিত হয় প্রয়াতঃ আর পি সাহার সম্পত্তির আয় থেকে।

বাংলাদেশে বহু শ্রেষ্ঠ ধনী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আছেন। তাঁদেরকে ভালভাবে এপ্রোচ করা হলে তাঁরা হয়তো তাদের মায়ের নামে একটি পাবলিক স্কুল টাইপ মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন করে নারীদের ইসলামী শিক্ষার পথিকৃত হিসাবে পরিগণিত হতে পারেন।

টিউটরিয়াল মাদ্রাসা

মহিলাদের ইসলামী শিক্ষা এত প্রয়োজন যে বিভিন্ন কাঠামো টাইপের মহিলা মাদ্রাসার চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ঢাকা শহরে বহু শিক্ষকের বাড়ী এখন টিউটরিয়াল হোম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রাইভেট বাড়ীতে পরিচালিত হচ্ছে।

বাড়ীর দো'তলায় কোন পরিবার বসবাস করেন। নিচতলায় গৃহকর্ত্রী ২/১ জন শিক্ষক নিয়োগ করে কিন্ডারগার্টেন চালান। এ সমস্ত কিন্ডারগার্টেনের বেতন অত্যন্ত চড়া।

উন্নতমানের শিক্ষা কিন্ডারগার্টেন টাইপ বালিকা মাদ্রাসা প্রাইভেট বাড়ীতেও অনুষ্ঠিত হতে পারে। চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর বহু ইসলামী চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি করার মত তেমন কাজ পান না। তারা এ সমস্ত মাদ্রাসায় সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। অনেকে সুযোগ পেলে বিনা বেতনে চাকুরী করতে রাজী হবেন।

বড় বড় শহরে আধুনিক মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হলে মহিলা মাদ্রাসায় ভলানটিয়ারী সার্ভিস দেয়ার জন্য বহু শিক্ষিকা মহিলা পাওয়া যেতে পারে।

আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা

দেশে বিদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আবাসিক। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক আবাসিক হোস্টেল আছে। আমাদের দেশের কওমী/খারেজী মাদ্রাসাগুলো এবং এতিমখানাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আবাসিক।

কওমী/খারেজী মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে ছুন্নাতের অনুশীলন অনেক ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়। এর একটি বড় কারণ হলো কওমী/খারেজী মাদ্রাসাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবাসিক। শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদের চাল-চলনের উপর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সহজ হয়।

মেয়েদের পক্ষে বাসস্থান হতে দূরে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকর হয়ে পড়ে। মাদ্রাসা আবাসিক হলে যাতায়াত সমস্যা কিছুটা কম হয়। মহিলা মাদ্রাসা আবাসিক হলেই বিভিন্ন দিক থেকে সুবিধাজনক।

মহিলা মেডিক্যাল মাদ্রাসা

মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তারই কাম্য। কামেল ফাজেল মহিলাদের জন্য মহিলা মেডিক্যাল মাদ্রাসা স্থাপিত হলে ডাক্তার সৃষ্টি হবে। যদি মহিলাদের গৃহকোণের বাইরে চাকুরী করতে হয়, তবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠানই তাঁদের জন্য সুবিধাজনক।

মহিলা মাদ্রাসা সিলেবাস

মহিলা মাদ্রাসার সিলেবাস আলীয়া লেভেলের হতে পারে। যদি মহিলা মাদ্রাসা কওমী লাইনের হয়, তবে এর সিলেবাস কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসের ন্যায় হতে পারে। কি ধরনের মাদ্রাসা হবে তার উপর সিলেবাস নির্ভর করবে।

বর্তমান মাদ্রাসা ছাত্রদের শতকরা নব্বই ভাগই আসে বিত্তহীন শ্রেণী হতে। তারা অল্পতেই তুষ্ট। জীবন যাপনে তাদের চাহিদা কম।

যেহেতু মহিলা মাদ্রাসাতে দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান ছাড়াও মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের সন্তানরাও লেখাপড়া করবে, তাই সিলেবাসে কিছু সংযোজন করতে হবে।

উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন ধারায় ইংরেজী জ্ঞান অপরিহার্য। বিদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশীয় ব্যবসার হিসাব-নিকাশ, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি ইংরেজীতে প্রণীত হয়।

পুরানো সরকারী কাগজপত্রের প্রায় সবগুলোই ইংরেজীতে। বর্তমানে বাংলা বাধ্যতামূলক হলেও বিদেশী সাহায্যের সাথে সংযুক্ত প্রকল্পের বা বিষয়ের সরকারী দলিল দস্তাবেজ ইংরেজীতেই প্রণীত হয়।

বিদেশী গাড়ী, টেলিভিশন, ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার, ভিসিআর, বিদেশী ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির বিবরণ ইংরেজীতেই থাকে। ইংরেজী জ্ঞান না থাকলে এগুলোর ব্যবহার বুঝা কষ্টকর।

মহিলা মাদ্রাসা সিলেবাসে ইংরেজী এবং বাংলা ব্যাপকভাবে থাকতে হবে। ফার্সী বাদ দিয়ে আরবী, বাংলা, ইংরেজীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণ করতে হবে।

মহিলাদের পরিবারের টাকা-পয়সার হিসাব রাখতে হয়। বাজেট প্রণয়ন করে আয় অনুসারে চলতে হয়। মহিলা মাদ্রাসা সিলেবাসে একাউন্টিং এবং একাউন্ট কিপিং অবশ্যই রাখতে হবে।

আরবী কথোপকথন

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ইংরেজী শিক্ষিতরা যেভাবে ইংরেজীর মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন, মহিলা মাদ্রাসার ছাত্রীদেরকেও অনুরূপ আরবী কথোপকথনে অভ্যস্ত হতে হবে।

খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে ছোট ছোট শিশুরা দু'বছরের মধ্যেই ইংরেজী কথোপকথনের অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

মহিলা মাদ্রাসার ছাত্রীদের মধ্যেও অনুরূপ আরবী বলার প্রবণতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। আরবী উচ্চারণ সঠিক করার জন্য আরবী ক্যাসেট খুবই সুবিধাজনক।

মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষার পরিবেশ এমন করতে হবে যাতে শিক্ষা চিন্তা করতে শিখায়। আধুনিক সভ্যতার জীবন ধারার উদ্ভূত বিভিন্ন প্রশ্নের ইসলামসম্মত জবাব যাতে মহিলারা পেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অতীতের মনীষীরা তাদের যুগের শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। যে সমস্যা তাদের যুগে সৃষ্টি হয়নি, তার সমাধান তাদের গ্রন্থে খুঁজলে ব্যর্থ হতে হবে।

নিত্য নতুন প্রশ্নের জবাব এবং নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান বের করতে হলে নিজের চিন্তাকে অতীতের দোর গোড়ায় বন্ধক রাখা ঠিক হবে না। বিনা প্রশ্নে বিনা যুক্তিতে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে দু'টি জিনিস। তার একটি হলো কোরআন, অপরটি হলো সুন্নাহ্।

ইসলাম ও গতিশীলতা

যমযম কূয়ার পানি অতি পবিত্র মহৌষধ। কিন্তু ইসলাম শুধু কূয়ার পানি নয় যে, তাকে বোতলে ভরে রাখবো আর প্রয়োজনের সময় ঔষধ হিসেবে পান করবো।

ইসলাম একটি দীঘি নয় যে, তাতে শুধু অবগাহন করবো এবং সাঁতার কাটবো। বরং ইসলাম একটি প্রবাহমান নদী, যুগে যুগে বহু জনপদের প্রয়োজন মিটিয়ে মহাসমুদ্রের পানে তার মহাযাত্রা। ইসলাম একটি গতিশীল জীবন বিধান, এটা কোন বদ্ধ কূয়া নয়।

বিভিন্ন দেশে এবং যুগে মানুষ নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়, এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে মানব জীবনকে পরিপূর্ণতা বা পারফেকশনের দিকে নিয়ে যাওয়াই ইসলামের লক্ষ্য। যে মহালগ্ন ও মহাস্থানের দিকে মানবতার এই মহাযাত্রা তা হলো আল্লাহর দিদার এবং জান্নাত। দুঃখের বিষয় ইসলামকে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আবদ্ধ করে তার গতিশীলতা এবং প্রবাহমানতা আমরা নষ্ট করে দিয়েছি। নারী এবং পুরুষের মধ্যে সার্বজনীন ও ব্যাপক শিক্ষা ছাড়া ইসলাম উহার গতিশীলতা ফিরে পাবে না।

সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কিরাম এবং ফকিহগণ কুরান-হাদীস অনুশীলন করে কিয়াস ও ইজমার মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই এরূপ বহু সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শক্তিসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা, গবেষণা, কিয়াস, ইজমা খুবই কম হয়েছে।

আল্লাহর সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে চিন্তা, গবেষণা করার জন্যে আল্লাহ্ আল-কুরআনে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। যারা চিন্তা করে না তাদেরকে পশুর সমান বলে গালি দিয়েছেন। যারা হিকমত বা বিজ্ঞানে অধিকারী হয়েছেন আল্লাহ্ বলেন, তিনি তাদেরকে প্রভূত কল্যাণের অধিকারী করেছেন।

মানুষের কু-অভ্যাস ও বদ-আখলাকের কারণে নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হয়। যেমন হয়েছে বর্তমান যুগে 'এইডস'। আল্লাহ্ বলেছেন যে, সব রোগের নিরাময়ও আছে এবং তা খোঁজ করে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঝাড়, ফুঁক তাবিজ-তুমার দিয়ে মানুষের যতটুকু খেদমত করা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি খেদমত হয় পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধ আবিষ্কারের মাধ্যমে। নারী-পুরুষ সকলেরই উচিত মানব কল্যাণের এরূপ ছদ্কায়ে জারিয়া জাতীয় গবেষণামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

বিজ্ঞানকে ইসলামসম্মত উপায়ে শিক্ষাদান সহজ। একজন স্যাকুলার শিক্ষাবিদ শিক্ষা দিয়ে থাকেন দুই ইউনিট হাইড্রোজেন ও এক ইউনিট অক্সিজেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত করলে পানিতে পরিণত হয়। এখানে পার্থক্য হলো দৃষ্টিভঙ্গী।

আল্লাহর নির্দিষ্ট করে দেয়া বিধান আবিষ্কার করার সাধনাই মুসলমানদের জন্যে বিজ্ঞান সাধনা। আল্লাহর আইন আবিষ্কার করার সাধনা ইবাদতের মধ্যে গণ্য এবং এই ইবাদত থেকে নারীকে বঞ্চিত করার অধিকার পুরুষের নেই। মা-বোন, কন্যা পরিবারের [illegible]। স্বামী এবং স্ত্রী দুই চাকাওয়ালা একটি গাড়ী। একটি চাকা অচল হলে গাড়ীটির গতিশীলতা ব্যাহত হয়।

মহিলা মাদ্রাসার স্থান

মহিলা মাদ্রাসা দেশের সর্বত্র স্থাপিত হতে পারে। প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ যেরূপ স্থানে হতে পারে অনুরূপ স্থানে বা অঞ্চলে বালিকা/মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হতে পারে। বালিকা মক্তব প্রতি গ্রামেই স্থাপিত হতে পারে।

যেহেতু বর্তমানে মহিলা মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চেতনা তেমন গভীর নয়, তাই আলিম, ফাজিল, কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা স্থাপন করা হলে ছাত্র সংখ্যা হবে কম। জনগণের মধ্যে যে অঞ্চলের বা শহরে ইসলামী চেতনা অপেক্ষাকৃত সুগভীর সেখানে মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন সহজতর হবে।

ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর ইত্যাদি বড় বড় শহরে আলিম, ফাজিল, কালিম পর্যায়ের মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

মহিলা মাদ্রাসার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তি

অবাঙ্গালী মুসলমানদের বহু বাড়ীঘর সরকারী অফিস, অফিসারদের বাসভবন এবং অন্যান্যভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সমস্ত বাসভবন যদি মহিলা মাদ্রাসার জন্য ব্যবহৃত হয়, পূববর্তী মালিকরা শুনেও শান্তি পাবে।

মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পদ ইসলামের কাজে ব্যবহার হওয়া অধিকতর সঙ্গত। যে সমস্ত পরিত্যক্ত ভবন অফিসারদের বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, মহিলা মাদ্রাসার উদ্যোগী কর্মীরা এগুলোর কোন একটি মহিলা মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দের আবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট করতে পারেন।

পিছনে লেগে থাকলে এ ধরনের বাড়ী পাওয়া সহজতর হবে। যদি কোন অফিসার পরিত্যক্ত ভবনে থাকেন তার বিকল্প না করে মহিলা মাদ্রাসার জন্য উক্ত বাড়ীটির বরাদ্দ লাভ করা কষ্টকর। কিন্তু অফিসার বদলী হয়ে গেলে এ বাড়ী পাওয়া সহজ।

এজন্য পূর্ব হতে চেষ্টা তদবীর করে এ শর্তে বরাদ্দ করে নেয়া যায় যে, বর্তমান অবস্থানকারী বদলীর পর বাড়ীটি মহিলা মাদ্রাসার জন্য হস্তান্তর করা হবে।

পরিত্যাক্ত বাড়ীর প্রাক্তন মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের নিকট থেকে মহিলা মাদ্রাসার পক্ষে বরাদ্দের জন্য আবেদন এবং অনুদান পত্র আনতে পারলে বরাদ্দের তদবীর আরও জোরদার হবে।

খাস জমিতে মহিলা মাদ্রাসা

মহিলা মাদ্রাসার জন্য খাস জমি পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। মুসলিম শাসনামলে বাংলার চার ভাগের এক ভাগ জমি, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকা, এতিমখানা ইত্যাদির জন্য ওয়াকফ এবং লাখেরাজ ছিল। রিজামশান আইন করে এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকাংশই বৃটিশ সরকার নিয়ে নেয় এবং পাকিস্তান আমলেও ঐ ধারা অব্যাহত থাকে।

যেহেতু মসজিদ মাদ্রাসার বহু জমি বিনা ক্ষতিপূরণে এবং সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে বিভিন্ন সময়ে সরকারী খাস খতিয়ানভুক্ত হয়ে অন্যভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই মহিলা মাদ্রাসার জন্য সরকারী জমি পাওয়া নিতান্তই সঙ্গত। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে খাস জমি পাওয়ার জোর চেষ্টা চালাতে হবে।

বালিকা মাদ্রাসার জন্যে বিকল্প গৃহ না পাওয়া গেলে মসজিদেই মাদ্রাসা শুরু হতে পারে এবং যতো শীঘ্র সম্ভব বিকল্প গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে।

মহিলা মাদ্রাসা সংগঠন

ফান্ড

সরকার কর্তৃক মহিলা মাদ্রাসার উদ্যোগ নেয়ার পূর্বে বেসরকারী উৎস থেকেই মহিলা মাদ্রাসার জন্যে ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। সত্যিকার উদ্যোগ নিতে পারলে ফান্ড খুব বড় একটি সমস্যা হবে না।

নেক কাজে যারা অর্থ ব্যয় করতে চান, তারা ভালো কাজের নতুন ক্ষেত্র পেলে আনন্দিত হন। মহিলা মাদ্রাসা যেহেতু একটা সৎ দিগন্ত, তাই অনেক বিত্তবানই উদার হস্তে এগিয়ে আসবেন। অবশ্য যদি তাঁরা মনে করেন যে উদ্যোক্তাগণ অর্থের তেমন অপব্যবহার করবেন না।

মহিলা মাদ্রাসার জন্যে মহিলা বিত্তশালীদের নিকট অনুদান চাইলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

মহিলা মাদ্রাসা কাউন্সিল

কিছু কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের চেষ্টা করা হলে কিছু কিছু মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হবে। ইদানীং পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে এখানে সেখানে মহিলা মাদ্রাসার খবর প্রকাশিত হয়। কামিল পর্যায়ে এখনো বাংলাদেশে কোন মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়নি (১৯৮৬)।

তেজগাঁওস্থ রহমতে আলম ইসলাম মিশনে ফাজিল পর্যন্ত মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৯৮৭ সন পর্যন্ত বাইশ জন এতিম বালিকা উক্ত মাদ্রাসা হতে ফাজেল পাশ করেছেন। সারাদেশে দাখিল, আলিম, ফাজিল মিলিয়ে আনুষঙ্গিক ২৫টি মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে (১৯৮৬)। এই সংখ্যা নিতান্তই কম।

দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন করতে হবে। এ জন্য মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। শহরে, গ্রামে, গঞ্জে সারা বছর ধরে যারা সুললিত কণ্ঠে ওয়াজ করে থাকেন, তাদের সাহায্য নিতে হবে।

পীর, বজুর্গানদের চেষ্টার ফলে মহিলা মাদ্রাসা স্থাপিত হতে পারে। মহিলা মাদ্রাসার আন্দোলন সৃষ্টি ও সমন্বয়ের জন্য আপাততঃ বেসরকারী পর্যায়ে মহিলা মাদ্রাসা বোর্ড, মহিলা মাদ্রাসা কাউন্সিল, মহিলা মাদ্রাসা ট্রাস্ট, মহিলা মাদ্রাসা এসোসিয়েশন ইত্যাদি নামের বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়ে মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলনকে গতিশীল করা প্রয়োজন।

এই সমস্ত সংগঠনের কাজ হবে মহিলা মাদ্রাসার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সভা সমিতি করা এবং ধর্মপ্রাণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

মহিলা মাদ্রাসার চেতনা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি মহিলা মাদ্রাসা ট্রাস্টের মাধ্যমে মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের কাজ ত্বরান্বিত হতে পারে।

মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষক

মহিলা মাদ্রাসায় ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষকদেরকে অবশ্যই তাহাজ্জুদ গুজার ও নিয়মিত সিয়াম বা রোজা পালনকারী হতে হবে। হৃদয়ে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টিতে রোজা একটি অতি উত্তম মাধ্যম।

মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষক পুরুষ হোক বা নারী হোক তাকে অবশ্যই ইসলামী আকিদায় দৃঢ় এবং ইসলামী আখলাক সম্পন্ন হতে হবে। পোশাক পরিচ্ছদে তাদেরকে হতে হবে শালীন।

বোরকা বা চাদর (জিলবাব) অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে

বোরকার সনাতন ডিজাইনটি পরিবর্তন করে রুচিসম্মত করা প্রয়োজন আছে। সেকেলের ডিজাইনের এবং কালো বোরকা পরিহিতা মহিলার অভিব্যক্তি ভীতিপ্রদ। বোরকার ডিজাইন উন্নত করা অত্যাবশ্যক।

মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্যোগ

মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্যোগ যেকোন উদ্যোগী কর্মীই নিতে পারেন। কর্মীকে যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হতে হবে এমন কোন প্রয়োজন নেই। গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে যারা ক্লাব লাইব্রেরী করেন, সাময়িকী প্রকাশ করেন, নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান, ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করে থাকেন, এরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তি উদ্যোগী বা আহবায়ক হয়ে সভা ডাকতে পারেন।

পঞ্চাশ জনকে দাওয়াত দেয়া হলে অন্ততঃ পাঁচজনতো আসবেই। বেশিও আসতে পারেন। উদ্যোক্তা যদি বক্তা না হন, তিনি এ লেখার অংশ বিশেষ পড়িয়ে শুনাতে পারেন এবং মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনে অন্যদের সহযোগিতা কামনা করতে পারেন।

যারা সহানুভূতিশীল তাদের নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। মহিলা মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, সম্ভাবনা, বিশেষ স্থানে মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে ৪-৫ সভায় আলোচনা করে যারা প্রায় সভায় যোগ দিয়ে থাকেন, তাদেরকে নিয়ে একটি স্থানীয় মহিলা মাদ্রাসা সংগঠন বা মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটির একটি সংক্ষিপ্ত গঠনতন্ত্র অনুমোদন করে বছরান্তে পুনঃসংশোধন করে নেয়া যেতে পারে।

নির্বাচনের পর যারা দু'এক সভার পর আর সময় দিতে পারে না, তাদের পরিবর্তে যারা সময় দিতে পারেন, তাদের নিয়ে কমিটি পুনর্গঠিত করে নেয়া যেতে পারে। যারা সভায় আসবেন তাদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা ছাড়া প্রতি সভায় কিছু অনুদান আদায় করে নেয়া যেতে পারে।

টাকা কুরবানী না করলে কোন কাজের জন্যে দরদ সৃষ্টি হয় না।
উদ্যোক্তাদেরকে মাদ্রাসার জন্যে স্থানের সন্ধান করতে হবে এবং স্থান নির্ধারণ করে কাজ করলে কাজের বরকত হবে।

যদি বহু সংখ্যক সভা-সমিতিতে আলোচনা করেও মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন না করা যায়, তাতে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। বহু জায়গায় চেষ্টা করলে কিছু কিছু জায়গায় সফলতা অর্জন করা যাবে, মাদ্রাসার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি হবে। প্রাথমিক চেষ্টা ব্যর্থ হলেও পরবর্তী চেষ্টায় সফলতা অর্জন করা যাবে। এক জায়গার ব্যর্থতা অন্য জায়গায় সফলতায় পরিণত হয়।

কোন জায়গায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না বলে সে স্থানে বাংলাদেশে 'মহিলা মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব' শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান করতে কোন দোষ নেই।

যত বেশি সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান হয়, তার সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন আন্দোলন জোরদার হবে। কামিয়াবী অবশ্য আল্লাহ্‌র হাতে। দ্বীনি কাজের কামিয়াবী শুধু উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নয়, এর প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত আছে। আল্লাহ্

আমাদের মহিলা মাদ্রাসার পথিকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগ আমাদের হাতছাড়া করা উচিত হবে না।

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে যদি আমরা দ্বীনি ভাবাপন্ন করতে চাই, তবে সহজতর পন্থা হলো তাদের মাতৃকূলকে দ্বীনি ভাবাপন্ন করা। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাতৃকূলকে দ্বীনি ভাবাপন্ন করার প্রকৃষ্ট পন্থা তাদের মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করা। নারীকূলকে মাদ্রাসা শিক্ষিতা করতে হলে মাদ্রাসা সহশিক্ষা বা 'কু' এডুকেশনের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়।

এজন্যে প্রয়োজন পৃথক বালিকা এবং মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন করা। বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এখানে সেখানে দশ-বিশটি মাদ্রাসা স্থাপিত হতে পারে। সারাদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা মাদ্রাসা স্থাপনের জন্যে জরুরী হলো – এ বিষয়ে সচেতনতা। আর এ জন্যে প্রয়োজন সারাদেশব্যাপী মহিলা মাদ্রাসা আন্দোলন গড়ে তোলা। আসুন আমরা সকলে আমাদের সাধ্য মোতাবেক এ আন্দোলনের মহান সৈনিক বা ত্যাগী সিপাহসালারে পরিণত হই। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে শুরু করা স্বার্থ লেশহীন কুরবানীওয়ালা আন্দোলনের কামিয়াবী সুনিশ্চিত এবং অনিবার্য।

নারীর শ্রেষ্ঠত্ব

মানব শিশুর জন্ম পুত্র বা কন্যা রূপে। নারীর প্রথম ভূমিকা হলো কন্যা হিসেবে। শিশুকালে পুত্র এবং কন্যার প্রয়োজন ও চাহিদার ক্ষেত্রে পিতামাতার দায়িত্বের কোনো পার্থক্য নেই। সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক খাওয়ানো, জামা কাপড় দিয়ে আচ্ছাদন, প্রতিকূল পরিবেশ ও জীব জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা, রোগে চিকিৎসা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই পিতামাতার দায়িত্ব কন্যা বা পুত্র সন্তানের প্রতি একই রূপ। পরিবারে নারীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো স্ত্রী হিসেবে এবং তৃতীয় ভূমিকা হলো মা হিসেবে। এ তিনটি প্রধান ভূমিকা ছাড়া সমাজে নারীর বহু দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার এবং ভূমিকা রয়েছে।

নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? দু'টি মেষ এবং দু'টি ছাগলের মধ্যে তুলনা করা ঠিক হবেনা। তুলনা করতে হলে তুলনীয় বিষয়গুলো সমশ্রেণীর হতে হবে। নর ও নারী কি সমশ্রেণীর ? সমশ্রেণীর না হলে দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ – এ প্রশ্ন অবান্তর।

প্রজনন

সন্তান জন্মদানে একজন পুরুষের একটি নির্ধারিত ভূমিকা আছে। এক কোটি নারী সম্মিলিতভাবে সে ভূমিকা কি পালন করতে পারবে ? একজন নারীর গর্ভধারনের যে ক্ষমতা এবং যোগ্যতা তা কি একশত কোটি পুরুষের মধ্যে পাওয়া যাবে ? এমন কাজ আছে যা একজন নারী করতে পারে, শত কোটি পুরুষও তা করতে পারবে না। অনুরূপভাবে এমন কাজ আছে যা শত কোটি নারীও সমাধা করতে পারবে না, যা একজন পুরুষ করতে পারে। তা'হলে নারী ও পুরুষ সব দিক দিয়ে সমশ্রেণীর হলো কি করে ? নর ও নারীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ – এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো – কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী শ্রেষ্ঠ এবং কোনো কোনো কর্মে পুরুষ শ্রেষ্ঠ।

শিশু খাদ্য

স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে শিশু প্রতিপালনে পিতা অপেক্ষা মায়ের অবদান বেশি। শুধু মানব জাতি কেন, অন্য যেকোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে পিতার অবদান অপেক্ষা মাতার অবদান অনেক বেশি। নবজাত সন্তান মাতৃস্তন্য পান করে বেড়ে উঠে। যদি এমন কোনো পরিবেশে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে যেখানে কোনো প্রকার খাদ্য দ্রব্য নেই – সেখানেও মায়ের কোলে থাকতে পারলে নবজাতকের কোনো অসুবিধাই হয় না। বিশ্বের তিনশত কোটি পুরুষের মধ্যে কোনো পুরুষের দেহে সন্তানের খাদ্য নেই। শত কোটি পুরুষের দেহে ঐ পরিমাণ দুগ্ধ নেই যা আছে একজন প্রসূতির দেহে। শিশু খাদ্য ভান্ডারের দিক থেকেও নর অপেক্ষা নারী শ্রেষ্ঠ।

যৌন ক্ষুধা তৃপ্তি

খাদ্যের ক্ষুধা নিবারনের জন্যে অসহায় মানুষ অন্যের নিকট খাদ্য ভিক্ষা করে। কিন্তু খাদ্যের জন্যে অন্যকে হত্যা করে না। ক্ষেত্র বিশেষে হত্যা করে থাকে সীমাহীন বিত্তের ক্ষুধা মিটাতে। ক্ষমতা ও বিত্তের সীমাহীন ক্ষুধা এক প্রকার মানসিক বিকৃতি।

পুরুষের যৌন ক্ষুধা খাদ্যের ক্ষুধা অপেক্ষা অনেক বেশি তীব্র। নিয়মিত নয়, সাময়িক যৌন ক্ষুধা তৃপ্তির জন্যে মানুষ হত্যা পর্যন্ত করে থাকে। নারীর যৌন ক্ষুধা পুরুষের মত তত তীব্র নয়। পুরুষের যৌন ক্ষুধা তৃপ্তির মাধ্যম হলো নারী। পুরুষ নারীকে যত আনন্দ দিতে পারে, নারী পুরুষকে যৌন তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে পারে অনেক অনেক বেশি।

সুন্দরতম সৃষ্টি

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোলে। শিশু সুন্দর। কন্যা শিশুর স্নিগ্ধতা মোহনীয়। নারী এবং পুরুষের মধ্যে বেশি সুন্দর কে ? এটা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টি শক্তির পার্থক্যের উপর। পুরুষের মতে নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক সুন্দর। নারী সুন্দরতম সৃষ্টি।

প্রাচীন ইতিহাসে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতো। বহু যুদ্ধের কারণ ছিল নারী। নিজের দেশে বা দলে সুন্দর পুরুষ সংগ্রহের জন্যে কোনো দেশে বা কালে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়নি। দেশের শাসক নারী হলেও তারা ভিন্ন দেশের সুন্দর পুরুষ সংগ্রহের জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি।

ব্যর্থ প্রেমের পরিণতিতে অবিবাহিত থাকে কে ? অধিকাংশ এমন কি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থ প্রেমিকা পর পুরুষকে বিয়ে করে থাকে। মেয়েদের পক্ষে অবলম্বনহীন জীবনযাপন কষ্টকর। কিন্তু বহু প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম স্মৃতিতে এত মুগ্ধ থাকে যে তারা চির কুমারত্ব গ্রহণ করে।

শিশু ও তরুণ বয়সে নর ও নারীর সৌন্দর্যের মধ্যে কিছুটা মিল থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুরুষের সৌন্দর্য লোপ পেতে থাকে। জীব-জন্তুর সারা মুখে পশম থাকে। যৌবন শুরুতেই পুরুষের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয় শ্মশ্রু, গোফের মাধ্যমে। শ্মশ্রু নর সৌন্দর্যের প্রতীক। সিংহের যেমন কেশর থাকে, নরের থাকে শশ্রু।

আল্লাহ্ নারীকে পুরুষ অপেক্ষা সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও নারীর দাড়ি গজায় না। পাশ্চাত্য সমকামী সংস্কৃতির কুপ্রভাবে অনেক পুরুষ নারীদের মত সুন্দর হওয়ার মানসে হয়তো দাড়ি কাটে। তৌরাত, ইঞ্জিল, কুরআনে উল্লিখিত কোনো নবী বা তার সঙ্গী সাথীদের কেউ বা প্রাথমিক অনুসারীদের কেউ দাড়ি মুন্ডন করতেন না। এটা আল্লাহর সৃষ্ট ফিতরাত বিরোধী।

সান্নিধ্যে শান্তি

দুঃখ, কষ্ট, ক্লান্তিতে মানুষ সান্নিধ্য কামনা করে। অন্যের কাছে মনের কথা বলতে পারলে দুঃখ কিছু কমে। ভাগাভাগি করে নিলে ভার হালকা হয়। ব্যথা, বেদনা, দুঃখের বিষয়টিও তেমনি। অন্যের কাছে বলতে পারলে মনের কষ্ট কিছু কমে।

ব্যবসা সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ঘটলে ঘনিষ্ট ব্যবসায়ী বন্ধুকে তা জানাতে মন চায়। আপনজন মারা গেলে নিকটাত্মীয় স্বজন ও ঘনিষ্ট বন্ধুদেরকে খবর দিতে এবং দুঃখের

কথাটা বলতে ইচ্ছা হয়। বিভিন্ন ধরনের পাপ কাজেও বন্ধুদের প্রয়োজন হয়। যৌন সিনেমা দেখতে হলে সম মানসিকতা সম্পন্নদের সান্নিধ্য কাম্য।

বিভিন্ন ধরনের সান্নিধ্যের মধ্যে কার সান্নিধ্য সবচেয়ে বেশি কাম্য ? কার কাছে বার বার ফিরে যেতে মন চায় ? সান্নিধ্য কামনার ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা নারী শ্রেষ্ঠ।

মায়ের সান্নিধ্য অপেক্ষা অধিকতর শান্তিময় সান্নিধ্য আর কিছু হতে পারে না। ঘরের বাইরে দীর্ঘ সময় থাকতে ভালো লাগে না। ঘরে ফিরে যাকে দেখতে মন সবচেয়ে বেশি চায় তাদের মধ্যে প্রথম হলো কন্যা। তারপর পুত্র, এরপর মা, স্ত্রী এবং অন্যজন। সান্নিধ্য কামনায়ও দেখা যায় পুরুষের নিকট অন্য পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিকতর কাম্য।

সন্তানের ভালোবাসা প্রাপ্তি

সন্তানের ভালোবাসা বেশি পাওয়ার হকদার এবং শক্তিমান কে ? পিতা অথবা মাতা ? পুত্র এবং পিতা দু'জনেই নর। এক প্রজাতির সৃষ্টি। সন্তানের ভালোবাসা প্রাপ্তিতে মাতা-পিতার মধ্যে যদি প্রতিযোগিতা হয় জয়লাভ করবে কে ? জয়লাভ দূরের কথা বিষয়টি অতো অসম যে প্রতিযোগিতার কোনো প্রশ্নই আসে না। হলেও অনেকটা খরগোস এবং কচ্ছপের প্রতিযোগিতার মতো হবে। পুত্র এবং পিতা সমশ্রেণীর হলেও এমন পুত্র কি তিন শত কোটি পুরুষের মধ্যে একজনও পাওয়া যাবে যে মাতা অপেক্ষা পিতাকে বেশি ভালোবাসে ? সন্তানের ভালোবাসা প্রাপ্তির যোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে পিতা অপেক্ষা মাতা বহুগুণ শ্রেষ্ঠ।

চরিত্র গঠন

শিশুর চরিত্র গঠনে নারী এবং পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? সন্তানের চরিত্র গঠনে নারী এবং পুরুষের যৌথ ভূমিকা রয়েছে। সন্তানের চরিত্র গঠনের জন্যে পিতামাতার সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। শিশু মনস্তত্ত্বের জ্ঞানহীন, নৈতিকতাহীন ও অশিক্ষিত হলে কেউই যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে না।

সন্তানকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা পিতা অপেক্ষা মাতার বেশি। দু'জন সম শিক্ষিত হলে মাতা যেরূপ চান সন্তান সেভাবেই গড়ে উঠবে। মাতা-পিতার চিন্তা বিপরীতমুখী হলে মায়ের স্বপ্ন এবং কল্পনার আলোকে সন্তান গড়ে উঠবে। সন্তানের চরিত্র গঠন প্রতিযোগিতায় মায়ের কাছে পিতা হেরে যাবে। চরিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে সন্তানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হলো মায়ের কোল। মাতা ভিন্নমতাবলম্বী হলে সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতার ভূমিকা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া দূরের কথা, চৌকিদারের ভূমিকাও পালন সম্ভব হয় না।

সেবা

অসুস্থ সন্তানের সেবায় পিতা এবং মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? অসুস্থ পুত্রের বুকে, পিঠে, কপালে মায়ের হাতের স্পর্শ স্বপ্নে প্রাপ্ত ঔষধসম। ক্ষণকালের জন্য হলেও অসুস্থ সন্তানের ব্যথা বেদনা মায়ের হাতের অমৃত স্পর্শে বিদূরিত হয়ে যায়।

সন্তানের জন্য অশ্রুপাত

সন্তানের মৃত্যুতে মাতা এবং পিতার মধ্যে দুঃখ হয় কার বেশি ? সন্তানের দুর্ঘটনাজনিত অপমৃত্যুতে কয়জন পিতা অপ্রকৃতিস্থ হয় ? সন্তান শোকে পাগল হয়ে

যাওয়ায় ঘটনা পিতা অপেক্ষা মায়েদের মধ্যেই বেশি। সন্তানের দুঃখে যত দীর্ঘ সময় মায়ের অশ্রুপাত হয়, পিতার ততটুকু হয় না। সন্তানের জন্য দুঃখ, ব্যথা, অশ্রুজলে সিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মাতা অনুপম।

ত্যাগে শ্রেষ্ঠত্ব

সন্তানের জন্য ত্যাগে নর ও নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? সন্তানের জন্ম প্রক্রিয়ায় পিতা-মাতার ত্যাগের মধ্যে কি কোনো তুলনা হতে পারে ? সন্তান জন্মকালে প্রত্যেকটি নারী জীবন-মরণ সংগ্রামের সম্মুখিন হন। মৃত্যুর মুকাবিলা করেন মা। পিতা ভোগ করেছেন আনন্দ ও সুখ। পরবর্তিতে কিছুটা পেরেশানী ও প্রত্যাশার মিশ্র অনুভূতি।

কোনো নারী এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন না যে সন্তান জন্মকালে তার মৃত্যু হবে না। সম্ভাব্য মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও নারী সন্তান কামনা করেন। গর্ভধারণের সকল ব্যথা বেদনা বরণ করে নেন। সন্তান জন্ম প্রক্রিয়াকালে ত্যাগে ও কষ্টে, ব্যথা ও বেদনায় নারী-পুরুষের কোনো তুলনাই হয় না। মানব জীবন ও সমাজের বহু ক্ষেত্রেই নারী শ্রেষ্ঠ, অনুপম এবং অতুলনীয়।

পরিশিষ্ট-ক

বাংলাদেশে দাওয়ায়ে হাদীস স্তরে মাদরাসার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা

ঢাকা জেলা-২৭

১। হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদারাসা, ১৬, বড় কাটারা, ঢাকা (১৯৩৬)।
২। জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া ৩ ও ৪, কোতওয়ালী রোড, ঢাকা-১১০০ (১৯২৫)
৩। জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা (১৯৫০)
৪। জামেয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪।
৫। মাদরাসা নূরিয়া আশরাফাবাদ (কামরাঙ্গির চর), ঢাকা।
৬। জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ, মীরপুর-১, ঢাকা-১২২৮।
৭। মাদরাসা দারুল উলুম, মাদানিয়া, দঃ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
৮। জামেয়া শরইয়্যা মালীবাগ, ঢাকা-১২২৭।
৯। দাঃ কুরআন শামসুল উলূম মাদরাসা, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৭।
১০। জামেয়া মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।
১১। জামেয়া রহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।
১২। মাদরাসা দারুল উলূম মীরপুর, ৬ (ব্লক ডি), ঢাকা-১২১৬।
১৩। মাদরাসা দারুর রাশাদ, মীরপুর-১২ ব্লক-৩, ঢাকা-১২২১।
১৪। জামেয়া মাদানিয়া বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
১৫। মাদরাসা মিফতাহুল উলূম, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
১৬। মাদরাসা মাখযানুল উলূম খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা।
১৭। জামেয়া দ্বিনিয়া শামসুল উলূম মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১৮। জামেয়া দারুল ইলূম, ১৫৪ মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১৯। জামেয়া ছিদ্দিকিয়া দারুল উলূম, দারুস সালাম, মীরপুর, ঢাকা-১২২৮।
২০। ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা-১২১২।
২১। মাদরাসা ফয়জুল উলূম আজিমপুর, ঢাকা।
২২। জামেয়াতুস সাহাবা উত্তরা, ঢাকা।
২৩। জামেয়া মাদানিয়া রাজ ফুলবাড়িয়া, সাভার, ঢাকা।
২৪। জামেয়া মিল্লিয়া (মহিলা মাদরাসা) মীরপুর-১২, ঢাকা-১২২১।
২৫। মাদরাসা আশরাফুল উলূম (মহিলা মাদরাসা) হুনটেক, ঢাকা।

২৬। রানাভোলা মহিলা মাদরাসা, উত্তরা, ঢাকা।

২৭। মহিলা মাদরাসা, মীরপুর-২, ঢাকা।

নারায়নগঞ্জ ২টি

২৮। জামেয়া আশরাফিয়া আমলাপাড়া, নারায়নগঞ্জ।

২৯। দারুল উলুল, দেওভোগ, নারায়নগঞ্জ।

নরসিংদী ২টি

৩০। মাদরাসা ইসলামিয়া ইসলামপুর, নরসিংদী।

৩১। দারুল ইলুম, পূর্বদত্তপাড়া, নরসিংদী।

মুন্সিগঞ্জ ২টি

৩২। জামেয়া আরাবিয়া (মহিলা মাদরাসা), টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

৩৩। জামেয়া হালিমিয়া মধুপুর, মুন্সিগঞ্জ।

গাজীপুর ১টি

৩৪। জামেয়া আনওয়ারিয়া বরমী, গাজীপুর।

সিলেট ২৮টি

৩৫। জামেয়া কাছেমুল উলূম, শাহজালাল দরগা সিলেট।

৩৬। জামেয়া মাদানিয়া ইসলামিয়া, কাজির বাজার, সিলেট।

৩৭। জামেয়া নুরানিয়া ভার্থখলা, রেলস্টেশন রোড, সিলেট।

৩৮। মাদরাসা মদীনাতুল উলূম দারুস সলাম, খাচবদির সিলেট।

৩৯। জাময়ো ইসলামিয়া ছিরামপুর, কদমতলী, সিলেট।

৪০। জামেয়া ইসলামিয়া হুসাইনিয়া, গহরপুর, সিলেট।

৪১। জামেয়া তাওয়াককুলিয়া রেঙ্গা, সিলেট।

৪২। জামেয়া ইসলামিয়া আনওয়ারুল উলূম, উমরপুর, সিলেট।

৪৩। মাদরাসা দারুস সুন্নাহ্ গলমুকাপণ, সিলেট।

৪৪। জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া বিশ্বনাথ, সিলেট।

৪৫। জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম বিশ্বনাথ, সিলেট।

৪৬। মাদ্রাসাতুল বানাত, বুরুঙ্গ, সিলেট।

৪৭। জামেয়া ইসলামিয়া আব্বাসিয়া কৌড়িয়া, সিলেট।

৪৮। জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম হেমু, হরিপুর বাজার, সিলেট।

৪৯। মাদরাসুতুল উলূমিল ইসলামিয়া হরিপুর, সিলেট।

৫০। জামেয়া ইসলামিয়া মাদীনাতুল উলূম খড়িলহাট, দরবস্ত, সিলেট।

৫১। মাদরাসা দারুস সালাম জাফলাউট, সিলেট।

৫২। জামেয়া ইসলামিয়া, রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন, সিলেট।

৫৩। দারুল উলূম কানাইঘাট, সিলেট (১৯৫৪)।

৫৪। মুজাহিরুল উলূম কওমিয়া গাছবাড়ী সিলেট।

৫৫। জামেয়া মুশাহিদিয়া কাসেমুল উলূম, সিলেট।

৫৬। ঢাকা উত্তর আরাবিয়া হোসাইনিয়া, রানাপিং, সিলেট (১৯৪৮)।

৫৭। দারুল ইলূম হোসাইনিয়া, ঢাকা দক্ষিণ, সিলেট।

৫৮। মাদরাসাতুল বানাত, ঢাকা দক্ষিণ, সিলেট।

৫৯। জামেয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা, মুহাম্মাদপুর, সিলেট।
৬০। জামেয়া ইসলামিয়া, দারুল উলূম দেউলগ্রাম, সিলেট।
৬১। জামেয়া দ্বিনিয়া আসআদুল উলূম রামধা, সিলেট।
৬২। জামেয়া ইসলামিয়া ফয়জে আম, মুনশীপাড়া, সিলেট।

সুনামগঞ্জ জেলা ৭টি

৬৩। জামেয়া ইসলামিয়া হাসনাবাদ, সুনামগঞ্জ।
৬৪। হুসাইনিয়া হাফেজিয়া আরাবিয়া সৈয়াদপুর, সুনামগঞ্জ।
৬৫। জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া দরগাপুর, সুনামগঞ্জ।
৬৬। জামেয়া ইসলামিয়া দারুল হাদীস, সুনামগঞ্জ।
৬৭। জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম অলৈতলী, কাতিয়া, সুনামগঞ্জ।
৬৮। টেকের ঘাট দারুল হাদীস মাদরাসা, সুনামগঞ্জ।
৬৯। জাউয়া জামেয়া ইসলামিয়া ছাতক, সুনামগঞ্জ।

মৌলভিবাজার

৭০। জামেয়া ইসলামিয়া হেমায়েতুল ইসলাম, ঘড়গাও, রাজনগর, মৌলভীবাজার।
৭১। দারুল উলূম টাইটেল মাদরাসা মৌলভীবাজার।
৭২। জামেয়া দ্বিনিয়া, মৌলভীবাজার।
৭৩। জামেয়া লুৎফিয়া বরুনা, হামিদনগর, মৌলভীবাজার।
৭৪। বড়খলা বশিরিয়া মাদরাসা, মৌলভীবাজার।
৭৫। আজিমগঞ্জ দারুল উলূম মাদরাসা, মৌলভীবাজার।

হবিগঞ্জ ২টি

৭৬। উমেদনগর জামেয়া ইসলামিয়া, হবিগঞ্জ।
৭৭। বাহুবল দারুল উলূম, হবিগঞ্জ।

কিশোরগঞ্জ ৩টি

৭৮। দারুল উলূম কমলপুর ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।
৭৯। নূরুল উলূম কুলিয়ার চর, কিশোরগঞ্জ।
৮০। জামেয়া ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ (১৯৫৫)।

মোমেনশাহী ৮টি

৮১। জামেয়া আরাবিয়া আহাদিয়া বারুইগ্রাম, মোমেনশাহী।
৮২। জামেয়া গাফুরিয়া দারুস সুন্নাহ, ঈশ্বরগঞ্জ, মোমেনশাহী।
৮৩। জামেয়া ইসলামিয়া সেহড়া, মোমেনশাহী।
৮৪। জামিয়া আশরাফিয়া খাগডহর, মোমেনশাহী।
৮৫। মাদরাসা মাখযানুল উলূম, মোমেনশাহী।
৮৬। জামিয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলূম বালিয়া, মোমেনশাহী (১৯৫৪)।
৮৭। জামিয়া হোছাইনিয়া, মাকিয়াইল, মোমেনশাহী।
৮৮। দারুল উলূম সোহাগী, মোমেনশাহী।

নেত্রকোণা ৪টি

৮৯। জামেয়া মিফতাহুল উলূম, নেত্রকোণা।
৯০। জামেয়া হোছাইনিয়া মউ, নেত্রকোণা।
৯১। জামেয়া শাহিদিয়া ইমদাদিয়া জারিয়া বাজাইল, নেত্রকোণা।
৯২। দারুল উলূম সেহলা, নেত্রকোণা।

টাংগাইল ৪টি

৯৩। জামেয়া নেজামিয়া দারুস সুন্নাহ বানুরগাছি, টাংগাইল।
৯৪। ধুলিরচর ইসলামিয়া মাদ্রাসা, টাংগাইল।
৯৫। বরুরিয়া দারুস সুন্নাহ মাদরাসা, টাংগাইল।
৯৬। ডাবাইল গোহাইল বাড়ী মাদরাসা, টাংগাইল।

চট্টগ্রাম ১ টি

৯৭। জামেয়া হোসাইনিয়া আরারিয়া মেলান্দহ বাজার, জামালপুর।

চট্টগ্রাম ১৫টি

৯৮। দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজার, চট্টগ্রাম।
৯৯। জামেয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম চারিয়া, চট্টগ্রাম (১৯৪৪)।
১০০। বোয়ালিয়া জামিয়া ইসলামিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
১০১। মাদরাসা উবায়াদিয়া নানুপুর, চট্টগ্রাম।
১০২। মাদরাসা আজিজিয়া বাবুনগর ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম (১৯৫০)।
১০৩। মাদরাসা ইসলামিয়া জিরি, চট্টগ্রাম।
১০৪। জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১০৫। জামিয়া কাসেমুল উলূম, পটিয়া চট্টগ্রাম (১৯৪৬)।
১০৬। মাদরাসা মুজাহিরুল উলূম, চর চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
১০৭। মাদরাসা জামেউল উলূম লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।
১০৮। দারুল মাআরিফ, হাজিরপুল, চট্টগ্রাম।
১০৯। মাদরাসা আজিজিয়া হাইলধর, চট্টগ্রাম।
১১০। নাজিরহাট নাছিরুল উলূম মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
১১১। মাদরাসা হিমায়াতুল ইসলাম, কৈগ্রাম, চট্টগ্রাম।
১১২। হোসাইনিয়া আজিজুল উলূম, রাজঘাটা, পদুয়া, চট্টগ্রাম।

কক্সবাজার ৩টি

১১৩। দারুল উলূম, চাকমারকোল, কক্সবাজার।
১১৪। মাদরাসা দারুস সুন্নাহ হীলা, কক্সবাজার।
১১৫। মাদরাসা ইসলামিয়া মহেশখালী, কক্সবাজার।

কুমিল্লা ৫টি

১১৬। মাদরাসা ইমদাদুল উলূম, রায়পুর, মোহমনা, কুমিল্লা।
১১৭। মাদরাসা কাসেমুল উলূম, কুমিল্লা।
১১৮। মাদরাসা দারুল উলূম, বড়ুরা, কুমিল্লা (১৯৪৯)।
১১৯। মাদরাসা হামিদিয়া বটগ্রাম, কুমিল্লা।
১২০। জামেয়া ইসলামিয়া মুজাফফরুল উলূম মুরাদনগর, কুমিল্লা।

চান্দপুর ৩টি

১২১। মাদরাসা কাসেমুল উলূম, জাফরাবাদ, চান্দপুর।
১২২। মাদরাসা দারুল উলূম উজানী, কচুয়া, চান্দপুর।
১২৩। জামেয়া আরাবিয়া আহমাদিয়া, কচুয়া, চান্দপুর।

বি. বাড়িয়া ১টি

১২৪। জামেয়া ইউনুসিয়া বি, বাড়িয়া।

ফেনী ১টি

১২৫। মাদরাসা হোসাইনিয়া উলামা বাজার, ফেনী।

নোয়াখালী ৬টি

১২৬। আমানতপুর মাদরাসা, নোয়াখালী।
১২৭। চর কলাকোপা মাদরাসা ইসলামিয়া কওমিয়া, নোয়াখালী।
১২৮। ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসা চৌমুহনী, নোয়াখালী।
১২৯। জামেয়া ইসলামিয়া আল আমিন মাইজদী, নোয়াখালী।
১৩০। ওয়াসেকপুর ইসলামিয়া মাদরাসা, নোয়াখালী।
১৩১। কালিকাপুর ইমদাদুল উলূম মাদরাসা, নোয়াখালী।

খুলনা ৫টি

১৩২। জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, খুলনা।
১৩৩। জামেয়া ইসলামিয়া খালিশপুর, খুলনা।
১৩৪। দারুল উলূম যাকারিয়া সেনহাটী, খুলনা।
১৩৫। মাদরাসা শামছুল উলূম শাজিয়াড়া, খুলনা।
১৩৬। মাদরাসা শামসুল উলূম শাজিয়াড়া (মহিলা মাদরাসা), খুলনা।

বাগেরহাট ৩টি

১৩৭। উদয়পুর জামেয়া হালিমিয়া, বাগেরহাট।
১৩৮। হাকিমপুর জামিয়া ইসলামিয়া, বাগেরহাট।
১৩৯। বড়গুনি ইসলামিয়া মাদরাসা, বাগেরহাট।

ফরিদপুর ২টি

১৪০। জামেয়া আরাবিয়া শামছুল উলূম পশ্চিম খাবাশপুর, ফরিদপুর।
১৪১। বাহিরদিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, ফরিদপুর।

মাদারীপুর ১টি

১৪২। টেকেরহাট দারুল ইলূম মাদরাসা, মাদারীপুর।

গোপালগঞ্জ ৩টি

১৪৩। মাদরাসা খাদেমুল ইসলাম, গাওহারডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ (১৯৪৯)।
১৪৪। চন্দ্রদিঘলিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, গোপালগঞ্জ।
১৪৫। তাড়াইল কুরুয়া মাদরাসা কুরুয়া, গোপালগঞ্জ।

বরিশাল ৩টি

১৪৬। মাহমুদিয়া মাদরাসা আমানতগঞ্জ, বরিশাল।
১৪৭। খাজা মঈনুদ্দীন মাদরাসা, বরিশাল।
১৪৮। মাদরাসা ইসলামিয়া হোসাইনিয়া কলেজ রোড, বরিশাল।

ভোলা

১৪৯। মাদরাসা ইজ্জাতুল ইসলাম দৌলতখান, ভোলা।

যশোর ৪টি

১৫০। জামেয়া এজাজিয়া রেলস্টেশন, যশোর।

১৫১। জামেয়া ইসলামিয়া দড়াটানা, যশোর।

১৫২। জামেয়া ইমদাদিয়া মাদানীনগর, যশোর।

১৫৩। জামেয়া মুহিউল ইসলাম নওয়াপাড়া, যশোর।

নড়াইল ১টি

১৫৪। লোহাগড়া ইসলামিয়া মাদরাসা, নড়াইল।

পাবনা ১টি

১৫৫। জামেয়া আশরাফিয়া, পাবনা।

সিরাজগঞ্জ ২টি

১৫৬। জামেয়া কওমিয়া দারুল উলূম খুকনী, সিরাজগঞ্জ।

১৫৬। জামেয়া ইসলামিয়া বেতুয়া, সিরাজগঞ্জ।

বগুড়া

১৫৭। কাসেমুল উলূম জামিল মাদরাসা, বগুড়া।

দিনাজপুর ১টি

১৫৮। বাংলা হিলি জামেয়া ইসলামিয়া আনওয়ারুল উলূম, দিনাজপুর।

রংপুর ২টি

১৫৯। ধনতলা জামিয়া কাসেমিয়া দারুল উলূম, রংপুর।

১৬০। সাইলবাড়ী বাইতুল উলূম মাদরাসা, রংপুর।

নীলফামারী ১টি

১৬২। দারুল উলূম সৈয়দপুর, নীলফামারী।

নওগাঁ ১টি

১৬৩। পোরশাহ্ মাদরাসা দারুল হিদায়াত, নওগাঁ।

শেরপুর ১টি

১৬৪। জামেয়া ছিদ্দিকিয়া ঝেরাবাজার, শেরপুর।

পরিশিষ্ট-খ

Names of Principals of Calcutta/Dhaka Alia Madrasa

Names of Principals of Calcutta/Dhaka Alia Madrasa

		Period
1.	Dr. A. Sprenger, M.A.	1850-57
2.	Sir Willian Naser Jease	1857-70
3.	1. Stacklip. M.A.	1870-73
4.	Henry Fardinand Blockman	1873-78
5.	A.E. Golf, M.A.	1878-81
6.	Dr. A.F.R. Hornell	1881-90
7.	H. Browthers, M.A.	1890-91
8.	Dr. A.F.R. Hornell (2nd time)	1891-92
9.	F.J. Rowe, M.A.	1892
10.	Dr. A.F.R.Hornell (3rd time)	1892-95
11.	F.J. Rowe (2nd time)	1895
12.	Dr. A.F. R. Hornell (4th time)	1895-98
13.	F.J. Rowe (3rd time)	1898-99
14.	F.C.Hall, B.A., B.Sc.	1899
15.	Sir Earl Stain, Ph. D.	1899
16.	H.A. Stork, B.A.	1900
17.	Lieutenant Colonel G.M.A. Rangking, M.D., I.M.S.	1900-1901
18.	H.A. Stork, B.A. (2nd time)	1901-1903
19.	Sir Edward Denison Ross, Ph. D.	1903
20.	H.E.Stapleton, B.A., B.Sc.	1903-1904
21.	Sir Edward Denison Ross, Ph.D. (2nd time)	1904-1907
22.	Mr. Chapman	1907-1908
23.	Sir Edward Denison Ross Ph. D. (3rd time)	1908-1911
24.	Alexander Homilton Harly	1911-1923
25.	M.J. Bottomly, B.A.	1923-1925

26.	Alexander Hemilton Harly (2nd time)	1925-1927
27.	Shamsul Ulama Kamaluddin Ahmed M.A., I.E.S.	1927-1928
28.	Shamsul Ulama Khan Bahadur Hedayet Hussain. Ph. D.	1928-1934
29.	Shamsul Ulama Khan Bahadur Md. Musa, M.A.	1934-1937
30.	Khan Bahadur Md. Yusuf, M.A.	1937-1938
31.	Shamsul Ulama Khan Bahadur Md. Musa (2nd time)	1938-1941
32.	Khan Bahadur Md. Yusuf, M.A. (2nd time)	1941-1943
33.	Khan Bahadur Md. Ziaul Huq, M.A.	1943-1954
34.	Maulvi Shaikh Sharafuddin, M.A., L.L.B.	1954-1955
35.	Mvi. Makbul Ahmad, M.A.	1955-1957
36.	Maulana Hafez Abdul Hafeez, M.A.M.M.	1957-1964
37.	Maulana Md. Abdul Lateef Farooqui, M.A.	1964-1969
38.	Maulana Sayed Abul Layes Md. Lutful Huq. M.A., Ph.D.	1969-1971
39.	Maulana Md. Jalaluddin, M.A., M.M.	1971-1973
40.	Maulana Md. Yaqub Sharif, M.A.,M.M.	1973
41.	Maulana A.K.M. Ayub Ali, M.M., M.A., Ph.D.	1973-1979
42.	Maulana Md. Yaqub Sharif, M.M., M.A. 2nd time	1979-1983
43.	Abdul Mannan M.M., M.A.	1983-1984
44.	Muhammad Yunus Sikdar, M.M., M.A.	1984-1997
45.	Maulana Md. Salahuddin M.M., M.A. (in charge)	1997-98
46.	Prof. Md. Abdul Munnan, M.M., M.A.	1998
47.	Maulana Md. Salahuddin, M.M. M.A.	1998-99
48.	Prof. Md. Yunus Sikder M.M., M.A.	1999
49.	Maulana Md. Salahuddin, M.M., M.A.	1999-2000
50.	Prof. Md. Saadullah, M.M.	2000

তথ্যপঞ্জী

1. M. M. Sharif : *Islamic and Educational Studies*; Institute of Islamic Culture, Lahore, 1964.
2. M. Z. Hasan : *Educating Pakistan*; Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1968.
3. Nur Ahmad : *Education and Educational Problems*; Abdul Jalil Chowdhury, Chittagong, n, d.
4. F. K. Khan Durrani : *A Plan of Muslim Educational Reforms*; S.G. Ali, & Sons., Lahore, n.d.
5. M. Hamiduddin Khan : *History of Muslim Education*; All Pakistan Conference, Karachi, 1967,
6. S. H. Leeper & Others : *Good Schools For Young Children*; Macmilla & Compan, London. 1968.
7. Mohd. Rafiddin : *First Principles of Education*; Iqbal Academy, Pakistan, Karachi, 1961.
8. Abdullah al-Muti Sharafuddin. ed. *Education For All* ; Papers and Proceedings of the Symposia, East Pakistan Education Week, 1966-67; Quazi Jahan Ara Khan, Dhaka, 1968.
9. *The Encyclopeadia of Education*; The Macmillan & Company and the Free Press, 1971.
10. A.S. Tritton : *Materials on Muslim Education in the Middle Ages*; Luzac; London, 1957.
11. G.H. Bantock : *Education in an Industrial Society*, Feber, London, 1963.
12. Md. Atiya El Ibrashi : *`Education in Islam'* tr. by Islmail Kashmiry; The Supreme Council For Islamic Affairs, Cairo, 1967.
13. S.M.Jaffar : *Education in Muslim India* being an Inquiry into the State of Education During the Muslim Period of Indian History (1000-1800); Idirah-i-Adabiyat-I, Delhi,

India, 1972.

14. M. Hamiduddin Khan : *History of Muslim Education* (712 to 1750 A.D.); Academy of Educational Research, Karachi, 1967.
15. Fazlur Rahman : *New Education in the Making in Pakistan* - its Ideology and Basic Problems; Cassel and Co. Ltd.; London. 1953.
16. Abdur Rauf : *Dynamic Educational Psychology*; Ferozsons, Lahore, 1962.
17. Saiyiddain, K.G. : *Iqbal's Educational Philosophy*; Sh. Muhammed Ashraf, Lahore, 1954.
18. Herbert, Sorenson : *Psychology in Education*, 2nd ed. McGraw-Hill, New York, 1948.
19. E.F.Cock and L.A. Cook : *Sociological Approach to Education* 2nd ed, McGraw-Hill, New York. 1950.
20. শামসুল আলম ঃ *জ্ঞান বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলাম* এবং সাতটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে ইসলামী প্রবন্ধমালা শীর্ষক পুস্তকে ; পৃঃ ১৩২-২০২; ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮।
21. *ইসলামী কিণ্ডারগার্টেন*, দৈনিক আজাদ, ০৫-০২-১৯৮২ এবং ১২-০২-১৯৮২।
22. *সমাজ সংস্কারে মসজিদের ভূমিকা*, মাসিক মদীনা, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮০।
33. *আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ফোরকানিয়া মক্তবের ভূমিকা*, মাসিক ইমামত, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮০।
24. *ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসার প্রয়োজন কেন ?* দৈনিক ইনকিলাব, ০২-০১-১৯৯৯ এবং দৈনিক ইনকিলাব, ০৯-০২-১৯৯৯।
25. *দেশে অধিক সংখ্যক হাফিজিয়া মাদ্রাসা আবশ্যক*, দৈনিক ইনকিলাব, ০৬-০১-২০০০।
26. *হাফিজিয়া মাদ্রাসার সমস্যা*, দৈনিক ইনকিলাব ২৮-০১-২০০০।
27. *Mosque and Maktabs in Removing Illiteracy*. The Bangldesh Observer,Dhaka, dt. 09-01-1982.
28. *Islamic Kindergarten*, Daily Millat, Dhaka, dt. 10-12-1982.
29. *Islamic Kindergarten Education*, Daily Millat, Dhaka, dt. 13-01-1982.
30. *Religious Teaching for the Children*, The Bangladesh Times, Dhaka, dt. 16-09-1980.

লেখক পরিচিতি

'মাদ্রাসা শিক্ষা' পুস্তকটির প্রণেতা এ. জেড. এম. শামসুল আলম বাংলাদেশ সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব হলেও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে বহুল পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম কলেজ থেকে তিনি অর্থনীতি এবং উন্নয়ন অর্থনীতিতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেন।

১৯৬৩ সনে সরকারী চাকুরীতে (সিএসপি) যোগ দিয়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ও যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সচিব পর্যায়ের সংস্থা প্রধান হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোং এর তিনি নেপথ্য সংগঠক ও উপদেষ্টা।

এ. জেড. এম. শামসুল আলমের পেশা সরকারী চাকুরী হলেও ইসলাম সম্পর্কে পড়া এবং লেখা তাঁর নেশা। একজন লেখকের অন্যতম বড় পরিচয় হলো তাঁর রচনা। তিনি ছোট বড় ৭৯টি প্রকাশিত পুস্তকের রচয়িতা। ইংরেজী ভাষায় তাঁর রচিত পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'তাবলীগ এন্ড দাওয়াহ' (১৩৫৮ পৃঃ), 'ইসলামিক থট্স' (১০৪৫ পৃঃ), 'মাল্টিপ্লেক্স থট্স' (৯৫১ পৃঃ), 'ফেমিলি ভেল্যুজ' (৩০১ পৃঃ), 'ডেমোক্রেসি এন্ড ইলেকশন' (১৮০ পৃঃ) 'ব্যুরোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' (২৩৯ পৃঃ), 'এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড এথিক্স' (১৯৫ পৃঃ), 'ইসলাম এন্ড ফেমিলি প্লানিং' (১০০ পৃঃ), 'ইসলামী পাবলিক স্কুল' (৯০ পৃঃ), 'এনট্রেপ্রেনিউরিয়াল সেভিংস' (৬০ পৃঃ), 'মস্ক এন্ড ইয়থ' (৭০ পৃঃ) ইত্যাদি।

জনাব শামসুল আলম রচিত বাংলা পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ইসলামী চিন্তাধারা' (৮৯২ পৃঃ), 'ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা' (৩২৩ পৃঃ), 'ইসলামী রাষ্ট্র' (২৬০ পৃঃ), 'ব্যবহারিক ইসলাম' (৩৬৬ পৃঃ), 'হযরত শাহজালাল (রহঃ)' (২৪৯ পৃঃ), 'ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা' (অনুবাদ-৩৫১ পৃঃ), 'আফগানিস্তান ও তালিবান' (১৪৪ পৃঃ), 'ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং' (১৬০ পৃঃ), 'তাবলীগ ও ফজিলত' (১৬০ পৃঃ), 'হজ্জের তাৎপর্য' (৯৬ পৃঃ), 'সালাত ও সিয়ামের তাৎপর্য' (১২৮ পৃঃ), প্রখ্যাত সাহিত্যিক শহীদ আকন্দ অনুদিত 'আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং তাঁর সত্তা' (৯৬ পৃঃ), 'ঈমান ও তার মৌলিক উপাদান' (১৪৪ পৃঃ), 'পরিকল্পিত পরিবার গঠন', 'মেজর আবদুল গনি', 'নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা', 'ইসলাম ও সঙ্গীত চর্চা', 'আফগান তালিবান', 'মসজিদ পাঠাগার', 'মহিলা মাদ্রাসা', 'ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন' ইত্যাদি।

জনাব শামসুল আলম রচিত শিশু-কিশোর উপযোগী রচনার মধ্যে আছে 'ছোটদের ইসলাম', 'ছোটদের মহানবী', 'শিশু ও মহানবী', 'ইংলিশ হরফ', 'বর্ণ পরিচয়' (১ম ভাগ), 'বর্ণ পরিচয়' (২য় ভাগ) ইত্যাদি।

জনাব শামসুল আলমের লেখা সহজ, সরল ও সুখপাঠ্য। তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তত্ত্বকথা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল করে বলার দক্ষতা। জনাব শামসুল আলম ৪২টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। দেশ বিদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং বাস্তবতা নিকট থেকে দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ, উপমা-উদাহরণ সমকালীন পরিবেশ হতে গৃহীত এবং আধুনিক মনের নিকট গ্রহণযোগ্য।

BCBS
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা